সাঙ্গীতিকী

সাঙ্গীতিকী

দিলীপকুমার রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৩৮

DER SÄNGER

Ich singe, wie der Vogel singt,
    Der in den Zweigen wohnet:
Das Lield, das aus der Kehle dringt,
    Ist Lohn, der reichlich lohnet.   (Göthe)

গুণী

পাখির ম'ত গাহি যে আমি নিতি—
    শ্যামল-শাখা-পিয়াসী যার প্রাণ :
কণ্ঠে মোর উচ্ছলে যে-গীতি
    আপন দানে পূর্ণ তার মান। (গেটে)

Published by the University of Calcutta, Senate House, Calcutta
and printed by P. C. Ray at Sri Gouranga Press,
5, Chintamoni Das Lane, Calcutta.

রাগের উদ্বোধন

(আবাহন)

আমার হিয়াকূলে এসো ফুলে ফুলে
তোমার প্রেমের ঝলক-ঝঙ্কারে :
যে-সুর বেজেছিল যে-দিন জেগেছিল
ধরা তোমার অলোক-ওঙ্কারে।
সেদিন নিশার বুকে জোনাকিরাও সুখে
উষার প্রদীপ জ্বালল সোনার পাথায়,
দীপ্তিকমল-হাসে অসাঙ্গ বিকাশে
গহন গন্ধ ছাইল স্বপনশাখায়।

দিনের অবসানে ঘুমপাড়ানি গানে
নিমীল-নয়ন যবে কিরণপরী—
তখনো গভীরে সুপ্তিঘন নীড়ে
তুষার কলি তোমার দিশা স্মরি'
বলে মৃদুল ভাষে : "গোলাপ-উচ্ছ্বাসে
ঝরবে তোমার চরণ-প্রতিধ্বনি,
লাজুক আরাধনে উছল আবাহনে
ফুটবে চিরশান্তি-রবিমণি।"

মন্ত্রকুসুম-তীরে তোমারি মন্দিরে
নীল চারণী কত যে গান গায়!
সান্ধ্যশিশির-কোলে সিন্ধুমিহির দোলে,
মরু রঙের জলতরঙে ধায়।
কভু সে-ঢেউবোলে মাণিক-তুফান তোলে
অরূপ আলো—রূপের কুতূহলে,
কভু সেথায় ঢলে অলখ-পরিমলে
তারার ছায়া অশ্রুছলছলে।

RISE OF MELODY

(INVOCATION)

Petal in my soul thy first-born
music's virgin flower
That blossomed to chime thy advent
in the gleam-enchanted hour,
When earth's broken fire-fly glimmers
mirrored the ecstasies
Of a far amaranthine bloom-flush,
thy tremulous secrecies.

Will not daywane's sleepy wing-beats
now wake to diapason
Of new dawn when hope's bud-whispers
thy footfall's rose-thrill blazon?—
And tingling nascent rhythms
of love-shy aspiration
Prelude thy archetypal
sun-will of calm creation?

Each core of Faith's corolla
is a fane for thy angel choir,
In dew of eve is locked thy
blue-irised reservoir,
Whose laughing ripples' pearl-crests
are heaves of the visioned Far
And the wistful troughs are deep with
shadows of thy viewless Star.

ভূমিকা

এক যে ছিলেন বিলিতি ঔপন্যাসিক। তাঁর ছিল এক বন্ধু—প্রকাশক। বন্ধু দরদী, কিন্তু বন্ধুর নব নব উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রোজই প'ড়েন আর মাথা নাড়েন: উঁ হুঁঃ।

—"কেন বন্ধুবর?"

—"আজকালকার পাঠক-পাঠিকারা—বিশেষ পাঠিকারা—চান যে বই গোড়াতেই হবে ইন্টারেস্টিং—থ্রিলিং—নইলে—মানে এ কলিকাল কি না—কাটে না।"

বন্ধু বেচারি তো অকূল পাথারে: হা হতোঽস্মি!—অকস্মাৎ মস্তিষ্কে দুষ্ট সরস্বতীর উদ্দীপনা: লিখলেন প্রথম অধ্যায়ের প্রথম লাইনেই: "Hell!"—Said the Duchess.

ইতিহাসে লেখে—ঐ এক বইয়ে তাঁর চিরদিনের চমৎকারা অন্নচিন্তার সুরাহা হ'য়ে গিয়েছিল।

দুঃখ এই যে সঙ্গীতবেত্তার তূণে এমন কোনো অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র নেই। সুতরাং "সাঙ্গীতিকী"-র শুধু আদিপর্বেই নয়, মধ্যকাণ্ডে তথা অন্ত-লীলায়ও নানা স্থল পাঠক-পাঠিকাদের—বিশেষ পাঠিকাদের—নীরস মনে হবে এ আশঙ্কা রইল।

এ-আশঙ্কায় উদ্বেগের কারণ থাকত না যদি এ-বইটি লেখা হ'ত বিশেষজ্ঞদের জন্যে। কিন্তু তাঁদের গবেষণা-কণ্ডূতি চরিতার্থ করা এর উচ্চাশা নয়।

এ-বইটি লেখা সাধারণ শিক্ষিত সঙ্গীতকৌতূহলীর জন্যে—বিশেষ ক'রে গানরসিকের রসবোধের একটু সহায়তা করতে—যথাসাধ্য। তাই যে-ধরণের মোটামুটি গড়পড়তা সাঙ্গীতিক জ্ঞান তাঁদের আছে সেইটুকুর 'পরেই এর নির্ভর। আর নির্ভর অবশ্য তাঁদের দরদের 'পরে—কারণ এ-শ্রেণীর বইয়ের মূলকথাটি বলা অসম্ভব গ্রহীতা যদি দরদী না হন।

তাই আমি চাই গড়পড়তা রসিককে, দরদীকে—অনন্যসাধারণ সমজদারকে, বিশেষজ্ঞকে নয়।

এই দরদীদের কাছেই আমার আবেদন নিবেদন আজি ব'লে আমি বইটিকে ঘরোয়া ভাষায় লিখেছি যথাসম্ভব মৌখিক ভঙ্গিমায়—যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নীরস বক্তব্যকে প্রাণের ছোঁয়াচে সরস ক'রে তুলতে।

বলেছি, এ-বইটির উদ্দেশ্য নয় কোনোরকম গুরুগম্ভীর প্রত্নতত্ত্ব। এর উদ্দেশ্য হ'ল আমাদের সঙ্গীতের মূল বিকাশধারার ইঙ্গিতটুকু দেওয়া। ঠিক্ কী ভাবে এ-ইঙ্গিত আমি দিতে চেয়েছি তার আভাষ এককথায় দেওয়া কঠিন, তবে মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি কি-ধরণের হওয়া উচিত তার নির্দেশ প্রথম পাই শ্রীঅরবিন্দের একটি পত্র থেকে। আমি তাঁকে যে-প্রশ্ন করেছিলাম তার মর্ম এই :

"আপনি নানা সময়ে নানান্ যোগিতপস্বীর গুণকীর্তন করেন যাঁদের আদর্শ তথা সাধনা আপনার 'আত্মসমর্পণ যোগে'র উল্টোমুখী—অর্থাৎ যাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের সিদ্ধি ও লক্ষ্য আপনার যোগজীবনের সিদ্ধি ও লক্ষ্যের বিপরীত। এতে আমাদের ধাঁধা লাগে। আধ্যাত্মিক জীবনের কি তাহ'লে কোনো ধ্রুব লক্ষ্য বা পরিণতি নেই?"

এ-প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন (ডিসেম্বর ১৯৩৫): "The spiritual life is not a thing that can be formulated in a rigid definition or bound by a fixed mental rule: it is a vast field of evolution, an immense kingdom potentially larger than the other kingdoms below it with a hundred provinces, a thousand types, stages, paths, variations of the spiritual ideal, degrees of spiritual advancement. It is from the basis of this truth, which I shall explain in subsequent letters, that things regarding spirituality and its seekers must be judged *if they are to be judged with knowledge.* It is only by so understand-

ing it that one can understand it truly, either in its past or in its future, or put in there the spiritual men of the past and the present or relate the different ideals, stages etc. thrown up in the spiritual evolution of the human being."

এর ভাবার্থ : "কোনো একটি অনড় অচল সংজ্ঞা বা মানসিক বিধি-বিধান দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের ইতি করা যায় না। এ-জীবন হ'ল এক অনন্ত সম্ভাবনার রাজ্য—কত যে তার শাখা, নমুনা, ক্রম, স্তর, অলি-গলি, ধ্যান, আদর্শ! সত্যের এই যে বহুবিচিত্র বহুপল্লবিত ক্রমবিকাশের ধারা, একে বুঝে তবে আধ্যাত্মিক নমস্যদের বিচার করতে হবে—মানে, যদি আমরা জ্ঞানের বিচার চাই। কেবল এই ভাবে দেখলে তবেই বিশ্বভৌম আধ্যাত্মিকতাকে বুঝতে পারা পারা যায়—কি অতীতের বিকাশধারাকে, কি ভাবীকালের প্রবণতাকে—সম্ভাবনাকে। নৈলে অতীতের ও এ-যুগের যোগিতপস্বীদেরকে তাদের যথার্থ পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখা যায় না—বিভিন্ন আদর্শ ও অভিব্যক্তির স্তরগুলির অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি ধরা যায় না—এদের উদয়-অস্তের তাৎপর্য বুঝতেও ধাঁধা লাগে।"

আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা: অর্থাৎ মানুষের সাঙ্গীতিক চেতনাকে ও সঙ্গীতের হাজারো বিকাশ, প্রচেষ্টা, উদয়, অস্ত, ক্রম, স্তর প্রভৃতিকে এম্‌নি অখণ্ড ভাবে তাদের যথাযথ পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হবে। তা না ক'রে এ-কে শুধু ওস্তাদিপন্থী বিশেষজ্ঞদের একপেশো বৈয়াকরণিক দৃষ্টিতে দেখলে হবে গোড়ায় গলদ। পারা না পারা অন্য কথা, কিন্তু আমি আমাদের সঙ্গীতের ক্রমবিকাশকে যতটা পারি সমগ্র-ভাবেই দেখতে চেষ্টা করেছি—ওস্তাদিপন্থীদের ভঙ্গিতে কোনো সঙ্গীত-পরীক্ষার আশু ফলাফল দিয়েই তাকে বিচার করতে যাই নি—সবকিছুকে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখতে। এ-দেখার প্রয়াসে আমার যে-সব অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তাদের মূল্য যা-ই হোক না কেন আমি অকুণ্ঠেই লিখে গেছি—কোনো উচ্ছ্বাস-প্রীতির মোহে প'ড়ে নয়—এই উদার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। আমার নানান্ স্মৃতিচারণ

ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির বর্ণনাকে পাছে পাঠকপাঠিকারা আত্মকাহিনী হিসেবে দেখেন সেই ভয়েই এ-কথাটি ব'লে রাখলাম। শেষ অধ্যায়ে "গান"-নায়কের আত্মোপলব্ধিগুলি সম্বন্ধে একথা আরো বেশি খাটে। ওসব ব্যক্তিগত উপলব্ধির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক সার্বভৌমিকতা ও সার্ব-কালীনতার ইঙ্গিত আছে ব'লেই ওদের মূল্য—নৈলে এসব ব্যাখ্যান লিপিবদ্ধ করা চলত না। এ-সম্পর্কে আরো একটা কথা বলার আছে এই যে, আমার আন্তরিক বিশ্বাস—এ-ধরণের সবজেকৃটিভ ভঙ্গির আলোচনায় নীরস বইয়েও জীবনের ছোঁয়াচ লাগে।

গ্রামোফোনের গানের দৃষ্টান্তগুলিও দিয়েছি প্রথমত এই সরসতা আনতে, দ্বিতীয়ত গানের বর্ণনায় দৃষ্টান্ত না দিলে অনেক সময়ে বক্তব্যটি বিশদ করা দুরূহ হ'য়ে ওঠে ব'লে। গ্রামোফোনের ত্রুটি অনেক—তবু তার একটা মস্ত সুবিধা এই যে গানগুলির ফটোগ্রাফ জিজ্ঞাসুর সামনে ধরা যায়—যার ফলে থিওরিটা বোঝানো একটু সহজ হয়, বক্তব্যও একটু সরস হয়।

এই সরসতা বজায় রাখতেই সাঙ্গীতিক পারিভাষিক যথাসম্ভব বর্জন করেছি। যে-সব সংজ্ঞা ও বচন সর্ববিদিত তাদেরকেই যতটা পারি কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু তবু কয়েকটি শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করতেই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আমার অনুরোধে এর মধ্যে কয়েকটির বাংলা তর্জমা লিখে পাঠান সেজন্যে তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যথা : স্বরসঙ্গতি (harmony), সংধ্বনিসঙ্গীত (symphony), বিস্বর (discord), স্বরৈক্য (concord)। এছাড়া যে-শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করতে হয়েছে তাদের তালিকা :—

সুরকার (composer), সুরশিল্পী (performer বা executant), সুরবিহার (improvisation), পর্দা (note), রূপবন্ধ (technique), ঠাট (mode), রূপকল্প (pattern), ক্রম (stage, step in evolution), স্তর (stratum) ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি (evolution), দৃষ্টিভঙ্গি (outlook), সুরলহরী (melody), সুরসরল (melodic)— আর টেকনিকালজাতীয় শব্দ বোধ হয় নেই।

এ ছাড়া ঢের সাঙ্গীতিক শব্দ ছিল যথা আশ, ঘষিট, ভূষিকা, শুদ্ধ, সালঙ্ক, সংকীর্ণ প্রভৃতি—এদের বিবরণী নামধাম জ্ঞাতিগোষ্ঠী যাঁরা জানতে চান যেন ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গীতসূত্রসার" পড়েন। এ-বইটি একাধারে আমাদের সঙ্গীতের উপক্রমণিকা তথা পাণিনি।

কেবল শ্রুতি সম্বন্ধে দুএকটা কথা না বললেই নয়—কারণ অনেকেই মনে করেন আমাদের মার্গসঙ্গীতে শ্রুতি-কচায়ন একান্ত আবশ্যক। সংক্ষেপেই সারি—কেন এ-কচায়নের দিকে এগুতে ভরসা পাই নি।

অনেকেই শুনে থাকবেন যে, য়ুরোপীয় সঙ্গীতে ডায়াটোনিক স্কেলে অষ্টককে যেমন বারটি প্রায় সমান্তরে ভাগ করা হয়েছে আমাদের স্বরগ্রামকে তেম্‌নি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা বাইশটি প্রায় সমান্তরে ভাগ করেছেন—সঙ্গীতদর্পণে প্রথম অধ্যায়েই এদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা :

(১) তীব্রা (২) কুমুদ্বতী (৩) মন্দা (৪) ছন্দোবত্যস্তু ষড়্‌জগাঃ।
(৫) দয়াবতী (৬) রঞ্জনী চ (৭) রক্তিকাচর্ষভে স্থিতাঃ॥
(৮) রৌদ্রী (৯) ক্রোধী চ গান্ধারে; (১০) বজ্রিকাথ (১১) প্রসারিণী।
(১২) প্রীতিশ্চ (১৩) মার্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ॥
(১৪) ক্ষিতী (১৫) রক্তা চ (১৬,১৭) সন্দীপিন্যালাপিন্যপি পঞ্চমে।
(১৮) মদন্তী (১৯) রোহিণী (২০) রম্যেত্যেতা ধৈবতসংশ্রয়াঃ॥
(২১) উগ্রা চ (২২) ক্ষোভিণীতি দ্বে নিষাদে বসতঃ শ্রুতী

কিন্তু নামকরণপর্ব নিয়ে তো সমস্যা নয়: প্রশ্ন হ'ল—এদের কম্পন-সংখ্যা কী ক'রে নির্ণীত হবে? এ নিয়ে সঙ্গীতকার, ওস্তাদ তথা সাহেবদেরও বইয়ে অনন্ত বাগ্বিতণ্ডা দেখেশুনে মনে হয় যে, এক পরব্রহ্মের মতিগতি ছাড়া সংসারে আর কোনো প্রহেলিকা নিয়েই বুঝি এমন দারুণ ঘনঘটা মানুষের চিত্তাকাশকে আচ্ছন্ন করে নি। অথচ অন্তিমে দেখা যায়—আমরা যে-তিমিরে সেই তিমিরে! কারণ স্পষ্ট: কী ক'রে আমরা নিশ্চিত হব যে অমুক ওস্তাদ এই বাইশটি সূক্ষ্মান্তর (minute interval) যেভাবে দেখাচ্ছেন সেইটেই ঠিক? আর একজন ওস্তাদ যদি এদের রকমফের দেখান ধ'রে দেবেন কে? এ-হেন

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে এক আধ কম্পনের ইতরবিশেষ হ'লে কান কি টের পেতে পারে কখনো ? অসম্ভব। তাই এ-শ্রুতিবিচারের একমাত্র সমাধান হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পথে স্বরশলাকার (tuning-fork) শরণাপন্ন হওয়া। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পদ্ধতিতে বারটি পর্দাকে প্রামাণিক ধরাই নিরাপদ। এ শুধু আমাদের প্রস্তাব নয়, ১৯১৬ সালে বরোদায় প্রথম নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলনের অধিবেশনে আলওয়ারের বিখ্যাত বীণকার মুশরফ্ খাঁও এই প্রস্তাব করেন।* এ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কাণ্ডারী ব'লে বরণ না ক'রে যাঁরা শ্রুতি নিয়ে অজস্র শাস্ত্রবাক্য আওড়ান তাঁদের ন্যায়ের ফাঁকি সম্বন্ধে কেবলই মনে হয় কিপ্‌লিঙের কথা :

"You can work it out by fractions or by simple
Rule of Three
But the way of Tweedledum is not the way of
Tweedledee."

"ভাই, ভগ্নাংশেই কষো, বা চাও ত্রৈরাশিকেই—দেখিয়ে দিতে পারি
যে, "তৈলাধারের" রীতির সাথে "পাত্রাধারের" রবেই রবে আড়ি।

তবু যাঁরা নাছোড়বন্দ হ'য়ে বাগাড়ম্বরে নয়কে হয় করার অসাধ্য-সাধনপ্রয়াসী তাঁদের জন্যে তো কল্লোলিত সঙ্গীতশাস্ত্রলবণাম্বুধি রয়েইছে —একবার ডুব মারলেই তাঁরা দেখতে পাবেন যে মার্গতাল বড় সোজা কথা নয়—সাক্ষাৎ শিবের পঞ্চমুখ থেকে বেরিয়েছিল এই পাঁচটি দুর্ধর্ষ তাল : চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পর্কেষ্টাক ও উদ্‌ঘট্ট—

চচ্চৎপুটশ্চাচপুটঃ ষট্‌পিতাপুত্রকোপি চ
সম্পর্কেষ্টাক উদ্‌ঘট্টস্তালাঃ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ।
পূর্বং শিবস্য পঞ্চেভ্যো মুখেভ্যো নির্গতাঃ ক্রমাৎ॥

* Report of the First All India Music Conference—২৯ পৃষ্ঠা

এ ছাড়া আরো কত কী নাম-প্রকরণ—শ্রুতিদেরও পাঁচটি জাতি : দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু, মধ্যা ; একুশটি মূর্ছনা : উত্তরমন্দা, অভিরুদ্‌গতা, অশ্বক্রান্তা—উঃ থামি।

তবে যাঁরা বাগাড়ম্বরের চেয়ে সত্যিকার সঙ্গীত-তথ্য বেশি ভালো-বাসেন তাঁদের পক্ষে কৃষ্ণধন বাবুর গীতসূত্রসার প্রথম ভাগ পড়াই যথেষ্ট : এ-বইটি শুধু তথ্যসিন্ধু ব'লেই নয়—অপূর্ব ব'লে। বিশেষ ক'রে গ্রন্থকারের ধ্যানদৃষ্টি, বিশ্লেষণের দীপ্তি ও স্বাধীন চিন্তার প্রসাদে এ-বইটি আমাদের কুসংস্কারপীড়িত ওস্তাদশাসিত দেশে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নবযুগের অগ্রদূত। উদাহরণত নেওয়া যেতে পারে যে পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গিয়েছিলেন যে এ-যুগ হ'ল কাব্যসঙ্গীতের যুগ, নাট্যসঙ্গীতের যুগ। এক একটি মানুষ জন্মান যেন জ্ঞানের শিখর-দৃষ্টি নিয়ে!

আরো দুএকটি উদাহরণ দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি : কৃষ্ণধন বাবু সেই কবে লিখে গেছেন—"খেয়াল ও ধ্রুপদীয় সুরে ঈশ্বরবিষয়ক ব্যতীত অন্যান্য উত্তমবিষয়ক বাংলা গান নাই বলিলেই হয় ; এই আমাদের একটা বৃহৎ অভাব রহিয়াছে। এইজন্য এতদিনেও খেয়াল ধ্রুপদ বাঙালির জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারে নাই। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত নিরক্ষর লোকের হাতে পড়াতে হিন্দি গীতের ভাবার্থ প্রায়ই লোপ পাইয়াছে ; আরও হিন্দি গীতের রচনা প্রায় নিকৃষ্ট ; তাহাতে কবিত্ব অতি অল্প, এবং গীতের বর্ণিত বিষয় সকলও শিক্ষিত লোকের রুচির উপযোগী নহে। হিন্দি গান শিক্ষা করিতে ও শুনিতে যে লোকের নীরস বোধ হয়, তাহারও কারণ এই যে কেবল সুরই শুনিতে ও শিক্ষা করিতে হয় ; গানের কথার মজা কিছুই পাওয়া যায় না। সুরের জন্য কতকগুলা নিরর্থক শব্দ মুখস্থ করা সামান্য অধ্যবসায়ের কার্য নহে। বিখ্যাত হিন্দি কবি তুলসীদাস-কৃত যে সকল অতীব চমৎকার চমৎকার গীত আছে, কালাবঁতেরা তাহা 'ভজন' বলিয়া ব্যবহার করেন না, ভজন ভিখারী, বৈষ্ণবের গেয় বস্তু হওয়াতে, কালাবঁতের নিকট তাহা হেয় পদার্থ।" এই জন্যে তিনি বিচক্ষণের মতনই রায় দিয়েছেন : "অতএব আমাদের

বাঙালি কবি ও বাঙালি কালাবঁৎ উভয়ে একত্র হইয়া ঐ সকল সুরে সর্বদা-ব্যবহার্য নানা বিষয়ে উত্তমোত্তম বাংলা গীতিরচনা করা উচিত; তাহা হইলে ঐ সকল সুরের প্রতি সর্বসাধারণের আস্থা ও প্রবৃত্তি হইয়া দেশময় বিশুদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞানের বিস্তার-নিবন্ধন জাতীয় সভ্যতার উন্নতি হইবে।" (১০ম পরিচ্ছেদ)

আজ তিনি জীবিত থাকলে বাংলায় বহু উৎকৃষ্ট গানের রচনাশিল্প দেখে তাঁর কী আনন্দ যে হ'ত সহজেই অনুমেয়। যে সময়ে তিনি লিখেছিলেন যে "হিন্দুস্থানি সংগীত সর্বাপেক্ষা মনোহর ও উৎকৃষ্ট"— সে সময়ে সত্যিই বাংলাভাষায় গানের দৈন্য ছিল খুবই বেশি। আজ এ-দৈন্য দূর হয়েছে। তবু বাঙালি ওস্তাদিপন্থীরা ঐ "নিকৃষ্ট" হিন্দি গানই গেয়ে থাকেন—সুন্দর হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীতে। এ-ও হ'ল আমাদের মামুলি গতানুগতিকতার আর একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত যেজন্যে রবীন্দ্রনাথ "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন:

"দেশের সকল শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়েছে। তারা আছে মাত্র, তারা চলে না—দস্তুরের বেড়িতে তারা বাঁধা। সেই জরার দুর্গ ভেঙে আমাদের সমস্ত বন্দী শক্তিকে বিশ্বে ছাড়া দিতে হবে। তা সে কী গানে, কী সাহিত্যে, কী চিন্তায়, কী কর্মে, কী রাষ্ট্রে, কী সমাজে।"

কিন্তু জরাসন্ধের কারাগারে বাস করতে যারা ব্যগ্র তারা নড়ে না যে—ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের ব্যঙ্গ মনে পড়ে:

> "In truth the prison, unto which we doom
> Ourselves, no prison is."

আমাদের দেশে ওস্তাদিয়ানার দৃশ্যে একথার সমর্থন মেলে খুবই বেশি। বিশেষ ক'রে যাঁরা বাঙালি হ'য়ে এমন মনোহর বাংলা গান গাইতে চান না তাঁদের শোচনীয় ওস্তাদি গোঁড়ামি ও উন্নাসিকতা সম্বন্ধে কী বলা যাবে? কৃষ্ণধন বাবুর দীর্ঘশ্বাস মনে পড়ে বিশেষ ক'রেই বাঙালিদের সম্বন্ধে: "হিন্দি গানের অর্থ-সংঘটন প্রায়ই হয় না। আর

তাহা হইলেই বা কি? হিন্দি ভিন্ন ভাষা। বাঙালির তাহা কখনই স্বাভাবিক হইবে না। আমাদের দেশীয় ভাষায় কতকগুলি সদর্থযুক্ত ও উত্তম কবিত্বপূর্ণ গান আছে; তাহা যথারসসঙ্গত করিয়া গাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওস্তাদি গোঁড়ামি এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে, বাংলা গান রাগরাগিণীবিশিষ্ট হইলেও হিন্দুস্থানি লোকের তো কথাই নাই, বাঙালি সঙ্গীতবেত্তাদিগের নিকটও হেয় পদার্থ।" (১১শ পরিচ্ছেদ) এ-যুগে একদল সদ্যশিক্ষিত মার্গসঙ্গীতবেত্তাদের সম্বন্ধে একথা যে অক্ষরে অক্ষরে খাটে তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

এসব এত ক'রে বলার একটা মানে আছে। এ-বইটিতে আমি নানাস্থানে একটু আধটু হাসিতামাশা করেছি কিন্তু সত্যিকার ওস্তাদ ওরফে গুণীদের নিয়ে নয়, সত্যিকার রসিক ওরফে সমজদারদের নিয়ে নয়, সত্যিকার বিধানদাতা ওরফে শাস্ত্রীদের নিয়ে নয়—মিথ্যে ওস্তাদিয়ানা, সমজদারিয়ানা, শাস্ত্রিয়ানাকে নিয়ে: এক কথায় প্রকৃত পণ্ডিতকে নিয়ে নয়—পণ্ডিতিয়ানাকে নিয়ে। কারণ সত্যিকার পণ্ডিত, গুণী, শাস্ত্রী, সমজদার এঁরা সবাই সমাজের অলঙ্কার—শিরোমণি: তাই দেখা যায় এঁরা প্রায়ই হন উদার। মুস্কিল হয় এঁদের মুখোষ প'রে যাঁরা দণ্ড দিতে আসেন তাঁদেরকে নিয়ে। এ-বইটির প্রথমেই ভাতখণ্ডের শ্লোক দ্রষ্টব্য: বড় শাস্ত্রীরা দরকার হ'লে জীবনকে মান দিতেই শাস্ত্রের বিধান বদলান—জীবনকে বলেন না মৃত শাস্ত্রের বিধান মেনে নিজের নবতন উপলব্ধিকে জাতে-ঠেলা করতে।

তবে দুঃখ এই যে গড়পড়তা হিন্দুস্থানি ওস্তাদরা প্রায়ই একান্ত সঙ্কীর্ণ গতানুগতিকপন্থী হ'য়ে সঙ্গীতকে বিচার করেন ব'লে প্রায় ওস্তাদিয়ানার দিকেই ঝোঁকেন। কি ভাবে, একটা দৃষ্টান্ত নিই—ভূয়োদর্শী কৃষ্ণধন বাবুর বই থেকে (কেন না আজকাল ওস্তাদের গুণপনার মান রাখতে গিয়ে যে আমরা প্রায়ই ওস্তাদিয়ানাকেই বেশি বাহবা দিয়ে বসি এ-সম্বন্ধে সময় থাকতে একটু সচেতন হওয়া ভালো):—

"হিন্দুস্থানি ওস্তাদেরা যথারসানুসারে গান গাওয়া দূরে থাক, কথা সকলও পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ করেন না। কোনো শব্দের উচ্চারণ-

দোষ ধরিয়া দিলেও এরূপ তর্ক করেন যে ঐ ভুল উচ্চারণ ব্যতীত স্বরের লজ্জৎ হয় না।। এই প্রকার কত অসঙ্গত তর্ক যে তাঁহারা করেন শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়! গানের কথা সুস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে যদি শ্রোতাকে সুবিধা ও অবকাশ দেওয়া না হয় তবে গান গাওয়ারই বা ফল কি? কেবল সুস্বর শুনাইতে হইলে যন্ত্র বাজাইলেই তো হইতে পারে। কিন্তু যন্ত্রসঙ্গীতে যে ফলোৎপন্ন হয় কণ্ঠসঙ্গীতে তাহার বহুগুণ হওয়া উচিত।...উত্তম কবিত্বপূর্ণ কথা সমূহ যদি যথারসানুযায়িক স্বরবিন্যাসযুক্ত হইয়া সুললিত মধুর-কণ্ঠে গীত হয়, তাহাতে ঐন্দ্রজালিক শক্তি অবশ্যই বর্তে ইহা কে সন্দেহ করিবে?"

দুঃখ এই যে একথায়ও সন্দেহ করার মতন সনাতনপন্থী ও ওস্তাদি-পন্থী আমাদের দেশে অপর্যাপ্ত মেলে। তাই প্রায়ই এঁদের মুখে এমন হসনীয় কথাও শোনা যায় যে, হিন্দুস্থানি ভাষায় উচ্চারণ বিকৃত ক'রে যে গান সেই হ'ল গান এবং বাংলা গানেও কথা বিকৃত করতে না পারলে সে-গানে হিন্দুস্থানি রাগ-রস বর্তাবে না। এ-ও শুনতে হয় বাংলাগানের এ মহিমময় পর্বে যে, কাব্যোজ্জ্বল গান না কি গানপদবাচ্যই নয়—যেহেতু গানে সুন্দর কথা কবিত্বপূর্ণ কথা এলে না কি আমাদের লক্ষ্মীমন্ত সঙ্গীতের হবেই হবে গঙ্গাযাত্রা।

গানে কথার স্থান নিয়ে এ-বইটির শেষার্ধে যথেষ্ট লিখেছি তাই সে সবের পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। কেবল দু-একটা টেকনিকাল আপত্তির কথা তুলি যে-কুতর্ক হাল আমলে উঠেছে।

শুনতে পাই না কি বাংলা ভাষায় গান হয় না যেহেতু বাংলার স্বরবর্ণে তান দেওয়া চলে না। কেন চলে না জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলা ভার। হিন্দুস্থানি ও বাংলা একই আদি সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ: কাজেই হিন্দুস্থানিতে যে-স্বরবর্ণ আছে বাংলাতেও সেই স্বরবর্ণ আছে—এক হ্রস্ব অ্য (cup, ব্যস্—এদের অ্য) ছাড়া। কিন্তু সত্যি খুবই অবাক লাগে ভাবতে যে যদি সুকুমারী বঙ্গবাণীর এটা একটা অপরাধই হয় তাহ'লেও মাত্র একটা অকারের অজন্মা হওয়ার দরুণ এ-ভাষায় গানের চাষই হবে না এ-দণ্ড ওস্তাদি গানের তালুকদাররা কেমন ক'রে দিলেন?

আমাদের এমন অবর্ণনীয় সুন্দরী গীতিভাষার আশ্চর্য উর্বর জমিতে গানের আবাদ নৈব নৈব চ—এ বিধান দিতে তাঁদের প্রাণে কি একটুও বাজল না? আমরা বাঙালি ব'লেই যে বাংলাভাষা নিয়ে গৌরব করি তা তো নয়, এই তো সেদিনও অক্সফোর্ডের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ষ্ট্র্যাঙ্গোয়েজ সাহেব সারা ভারত ঘুরে তাঁর Music of Hindustanএ লিখে গেছেন যে, যেমন তেলুগু হ'ল দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ সাঙ্গীতিক ভাষা তেম্‌নি বাংলা হ'ল আর্যাবর্তের সেরা সাঙ্গীতিক ভাষা। ("Telegu, the most musical language of the South as Bengali is of the North.") আর এ তো শুধু ষ্ট্র্যাঙ্গোয়েজ সাহেবেরই রায় নয় ধ্বনিলালিত্যে ছন্দবৈচিত্র্যে ভাবগরিমায় বাংলা কাব্য বাংলা গান আজ ক্রমে বহু অবাঙালিরও সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক করছে। কেবল আত্মঘাতী হ্রস্বদৃষ্টি বাঙালি ওস্তাদি-পন্থীরাই এখনো এই সব তুচ্ছ ন্যায়ের ফাঁকিতে মেতে আছেন যে বাংলা-ভাষা স্বরবর্ণে দীন, যুক্তাক্ষরবহুল। জিজ্ঞাসা করি—আমাদের রামপ্রসাদী "প্রসাদ বলে ভবার্ণবে ব'সে আছি ভাসিয়ে ভেলা: জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা" শ্রেণীর গানের চেয়ে কি ধরা যাক তুলসীদাসের "নব কঞ্জলোচন কঞ্জ মুখকর কঞ্জ পদ কঞ্জারুণম্" শ্রেণীর গানে যুক্তাক্ষর কম? নিধুবাবুর "ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে" ধরণের টপ্পায়; রবীন্দ্রনাথের "জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা" শ্রেণীর ধ্রুপদে; দ্বিজেন্দ্রলালের লঘুগুরুছন্দী "এসো প্রাণসখা এসো প্রাণে—মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে" শ্রেণীর খেয়ালে; অতুলপ্রসাদের "আমার বাগানে এত ফুল" শ্রেণীর ঠুংরিতে; কাজি নজরুল ইসলামের "বসিয়া বিজনে কেন একা বনে? পানিয়া ভরণে চলো লো গোরী" শ্রেণীর গজলে; অজয়-কুমারের "ফোটে ফুল মনের বনে সে কেন যায় রে ঝ'রে" শ্রেণীর টপ্-ঠুংরিতে কি স্বরবর্ণের এতটুকুও দুর্ভিক্ষ আছে? না, সুরকে যাঁরা লীলায়িত করতে জানেন তাঁরা এসব গানের তানবিস্তারে স্বরবর্ণের একটুও কম সহায়তা পান? বাংলাগানে স্বরবর্ণকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায় তার দৃষ্টান্ত হিসেবে অজয়কুমারের গানটি গ্রামোফোনে বাংলা সঙ্গীতানুরাগীদের শুনতে অনুরোধ করি—যদিও গ্রামোফোনে সময়-

সংক্ষেপের দরুণ এ-গানটির নানা স্বরবর্ণে তানবিস্তারের স্থযোগ যথেষ্ট মেলে নি একথা বলাই বেশি। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করেন যে ওস্তাদিপন্থীদের কাছে যুক্তি দেওয়া নিষ্ফল? ওঁদের মূল যুক্তি হ'ল:

আমি দেখিতে যারে পারি না
জেনো চলন তার বাঁকা।
যার রুচির ধার ধারি না
কেন বাঁচিয়া তার থাকা?

তবে ভরসার কথা এই—যে-কথা রবীন্দ্রনাথ মাসখানেক আগে আমাকে বলছিলেন যে, "এসব স্বরবর্ণ নিয়ে আকার উকার নিয়ে কচকচি এ হ'ল পেডাণ্টদের বুলি, স্রষ্টার মাথাব্যথা একটুও নেই এ সব তর্কে।"

এ-প্রসঙ্গ তুললাম শুধু ওস্তাদিপন্থীদের ন্যায়ের ফাঁকি দেখাতে—হিন্দুস্থানি ভাষার কোনো অসম্মান করতে নয়। কেন না হিন্দুস্থানি ভাষা যে অতি মনোহর ভাষা এ-বিষয়ে দু'মত নেই। সেই জন্যেই তো কৃষ্ণধনবাবুর আক্ষেপে আরো সায় দিতে হয় যে, শুধু এই সব ওস্তাদি-পন্থীদের ভ্রূকুটিতেই রাগসঙ্গীতে হিন্দুস্থানি কবিতা বেচারিরও প্রাণ গেছে শুকিয়ে। কিন্তু আক্ষেপের চেয়েও জাগে বিস্ময় যখন শুনি যে, হিন্দুস্থানি গানে অসুন্দর অকিঞ্চিৎকর কথাই না কি ওর পরম ঐশ্বর্য! রিক্ততা কখনো সম্পদ হয় না—ফাঁকা দিয়ে ফাঁক ভরে না। হিন্দুস্থানি গান বড় হয়েছে এজন্যে নয় যে বাক্‌সম্পদে ও নিঃস্ব, হিন্দুস্থানি গান মনোহর কেন না সুরসম্পদে ও গরীয়ান্। কিন্তু এ ভারি অদ্ভুত যুক্তি যে ওর এক জায়গায় অস্তি-র গৌরব আছে ব'লেই ওর অন্যত্র নাস্তি-র দারিদ্র্যও ওর অঙ্গে কেয়ূর কঙ্কণ হ'য়ে ঝলমল করছে!

হিন্দুস্থানি গানের এই বাণী-দারিদ্র্যের কথা আরো বেশি ক'রে মনে হয় বিদেশী গানের বা বাংলা গানের কবিত্ব-সম্পদের সঙ্গে ওর তুলনা করলে। হিন্দুস্থানি গানে—মার্গসঙ্গীতে—ঠিক্ কাব্যসঙ্গীত বলতে যা বোঝায় তা যে তেমন ফুটে ওঠে নি সেটা আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের বিস্ময়কর অজস্রতার পাশে ওকে দাঁড় করালে। তখন মুহূর্তে বুঝতে পারা যায় যে হিন্দুস্থানি মার্গসঙ্গীতপন্থীদের মধ্যে

এখনো এই চেতনাই তেমন জাগে নি—সুর ও কথার মিলনস্নিগ্ধ মধুকোষের সন্ধান এখনো তাঁরা পান নি তেমন ক'রে—এক মরমিয়াদের গানে ছাড়া—তবে তাঁদের ভজন হিন্দুস্থানি মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ওস্তাদিপন্থীরা আজও টের পান নি এ-মিলনের মহিমা, সৌকুমার্য, অনির্বচনীয়তা। কাব্যের ব্যঞ্জনা যে সঙ্গীতের আলোয় কী কোমল, কী স্নিগ্ধ, কী মধুর হ'য়ে ফুটে উঠতে পারে তার কি সীমা আছে? এ-মিলনলোকে কথা যেন শাঁস, সুর তার চারদিকে বাঁধল দানা। কথা যেন ছবি, সুর তাতে ফলালো আভা। কথা যেন তরী, সুর দিল পাল। কথা যেন আকাশ, সুর হ'ল পাখা। এই যুগলাঙ্গুরীয়ের অঙ্গীকারেই ওদের ঘরকন্না: সেখানে কত সোহাগ কত আদর, কত মনজানাজানি, কত দেয়ানেয়া, কানাকানি, লুকোচুরির আলোছায়া যে!…

তাছাড়া এ-সূত্রে যে কথাটি আরো গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় সেটি হচ্ছে এই যে, কথা ও সুরের এই যে মিলন এর আকুতি বিশ্বভৌম—সার্বজনীন। ওদের দেশেও গানের কতরকম চালই যে আছে: ballad, oratorio, cantata, vaudeville, Gregorian hymn, serenade, madrigal, aria, opera, operette, folk-song—সর্বোপরি art-song—রোলাঁর ভাষায়—"কিশোর স্বপ্ন কবি হ্বেবার, শুবার্ট, শোপ্যাঁ, মেণ্ডেলসন, শূমান, বেলিওৎস প্রভৃতির মহৎ গীতিকাব্যে রোমান্টিক কাব্যের কলকিংকিণি:

"Enfin ruissellent ces flots de poésie romantique, les chants de Weber, de Schubert, de Chopin, de Mendelssohn, de Schumann, de Berlioz, ces grands lyriques de la musique, poètes des rêveries adolescentes d'un âge nouveau qui semble s'éveiller à la lumière."

যারাই ওদের দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্যসঙ্গীত শুনেছেন—যাকে রোলাঁ বলছেন "ces grands lyriques de la musique"—তাঁরাই রোলাঁর এ-উচ্ছ্বাসে সায় দেবেন যে এ-গান (মানে কাব্যসঙ্গীত) হ'ল বিশেষ

ক'রেই "এ নবযুগের আলোচেতনার জাগরণ।" এ-জাগরণের স্বপ্ন হ'ল মানবচেতনার প্রতি সুন্দর আবেগকেই সুর ও কাব্যের মিলনে নবদীপ্তি-দান করা। এরই বিকাশ কাব্যসঙ্গীতে সুরু—নাট্যসঙ্গীতে শেষ।

সহজ চোখে দেখলে সহজ কানে শুনলে কাব্যসঙ্গীতের নাট্যসঙ্গীতের এই দীপ্ত দুরাশায় আনন্দ ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না। সঙ্গীতের আবেদন ব্যাপক—সে কোনো বিশেষ শাসকের নজরবন্দী হ'য়ে থাকতে পারে না। তাই যন্ত্রসঙ্গীতে তার যে-ধরণের বিকাশ হবে কণ্ঠসঙ্গীতে ঠিক সে-ধরণের বিকাশ যদি সে না-ই চায় তাহ'লে তাতে আপত্তি করার কী আছে?

আমাদের দেশে ওস্তাদিপন্থীরা এ-কথায় যে-উত্তর দেন সেটা উত্তরই নয়—সেটা হ'ল আমাদের কণ্ঠসঙ্গীতের বিরুদ্ধে অভিযোগ। খতিয়ে সেটা দাঁড়ায় এই যে, সাঙ্গীতিককে হ'তে হবে শুদ্ধাচারী; কাজেই সঙ্গীত যখন কিছু বলে না, শুধু কাঁপে, তখন তার কম্পনের সঙ্গে বাক্‌কে জুড়ে দিলে জুড়ি ভালো চলতেই পারে না।

এ-ধরণের আপত্তির মধ্যে আর যা-ই থাকুক নূতনত্বের বিন্দুবিসর্গও নেই। যুগে যুগে একটি বিশেষ সৌন্দযধারায়, বিকাশরীতিতে আনন্দ-ভঙ্গিতে যাঁরা অভ্যস্ত—তাঁরা সে-ধারায় অন্য কোনো স্রোত আসতে দেখলেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন: "যায় যায় যায়—প'ড়ে ঐ কলির ফেরে সবই যে রে ভেঙে চুরে ভেসে যায়।" এঁদের ইংরাজিতে বলে পিউরিস্ট্: এঁদের মূল যুক্তি হচ্ছে এই যে, প্রতি ললিতকলা পর্দানশীনা হ'য়ে একাকিনী জীবনযাপন না করলেই তাঁর রক্তশুদ্ধি তথা সতীত্ব হবে নষ্ট—আসবে বর্ণসঙ্কর—ডুববে আর্টের আভিজাত্য। এ-যুক্তির প্রধান গলদ এইখানে যে এঁরা আর্টকে দেখেন তাঁদের সঙ্কীর্ণ বিশেষজ্ঞতার একান্ত খণ্ড দৃষ্টি দিয়ে। তাই তাঁরা বোঝেন না যে-শাদা সত্যটি রোমা রোলাঁ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদার গভীর ভঙ্গিতে বলেছেন তাঁর বিখ্যাত "সেকালের সঙ্গীতকার" বইটির প্রস্তাবনায়। একটু দীর্ঘ হ'লেও তাঁর এ-কথাগুলি উদ্ধৃত না ক'রে থাকতে পারলাম না—কারণ তাঁর এ-কথাগুলির মধ্যে আমাদের মামুলিপন্থীদের ওস্তাদি

তর্কের বড় গভীর যৌক্তিক খণ্ডন রয়েছে তিনি লিখছেন তাঁর অবতরণিকায় :

"Mais d'abord il n'est pas exact que la musique ait caractère aussi abstrait ; elle a des rapports constants avec la littérature, avec la théâtre, avec la vie d'un temps . . . Toute forme de musique est liée à une forme de la société, et la fait mieux comprendre. D'autre part, en beaucoup de cas, l'histoire de la musique est en relations étroites avec celle des autres arts. Il arrive sans cesse que les arts influent les uns sur les autres, qu'il se pénètrent mutuellement, ou que, par un effet de leur évolution naturelle, ils en arrivent, pour ainsi dire, à se prolonger hors de leurs limites, dans celles de l'art voisin. Tantôt c'est la musique qui se fait peinture. Tantôt c'est la peinture qui se fait musique. 'La bonne peinture est une musique, une melodie' dit Michel Ange . . . . Les barrières entre les arts ne sont pas à beaucoup près aussi hermetiquement closes que le pretendent les theoriciens ; constamment ils débordent l'un sur l'autre. Un art se continue et s'achève dans un autre art."

—*Musiciens d' Autrefois*

এর ভাবার্থ : "সঙ্গীতের প্রকৃতি এমনধারা অবচ্ছিন্ন অবাস্তব নয় ; তার নিত্যই লেনদেন চলেছে সাহিত্যের সঙ্গে, নাট্যলোকের সঙ্গে, সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে। ··· সঙ্গীতের প্রতি শাখা-রূপই সমাজের কোনো না কোনো রূপমূল্যের সঙ্গে যোগসূত্রে বাঁধা—যার দরুণ সঙ্গীতের আলোয় সমাজকে বুঝতে পারা আমাদের কাছে সহজ হ'য়ে আসে।

পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সঙ্গীতের ইতিহাসের সঙ্গে অন্য সব শিল্পের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রায়ই এ ওকে প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত করে এবং নিজের নিজের ক্রমবিকাশের ফলে স্বকীয় এলাকা ছেড়ে প্রতিবেশীর এলাকায় দেয় হানা। কখনো সঙ্গীতই জোগায় চিত্রকলার উদ্দীপনা, কখনো বা চিত্রকলা জোগায় সঙ্গীতের উদ্দীপনা। মাইকেল এঞ্জেলো বলতেন: 'ভালো চিত্রকলা হচ্ছে স্বরলহরী।' তার্কিকেরা ভুল করেন যখন তাঁরা প্রতি শিল্পকে তার স্বকীয় চৌহদ্দির মধ্যেই বেঁধে রাখতে চান—গড়খাই কি ওরা মানে? এ ডিঙিয়ে এসে ওর স্কন্ধে ভর করে—একটা শিল্প নিজের জের টেনে অন্য একটা শিল্পের উপর চড়াও হ'য়ে তবে পূর্ণবিকাশ লাভ করে।"

যাঁদের বললাম প্যুরিষ্ট্ তাঁরা মাথা নাড়েন এই ব'লে যে এতে শিল্পের আনন্দ-কৌলীন্য ভ্রষ্ট হয়—চেতনার মধ্যে ভাগ হ'য়ে যায় ব'লে। যায় মানি। সার জেম্স্ জীন্স তাঁর Science and Music ব'লে সদ্যপ্রকাশিত বইটিতে এর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই যে, কোনো অপেরায় গেলে চোখের চাহিদা হয় বেশি, কাজেই কান খানিকটা মুষড়ে পড়ে: "But hearing and seeing do not blend well; they rather compete—in an unequal competition in which seeing usually wins. In the opera house, many of us miss much of the music through watching the acting too intently." এখানে "many of us" ব'লে ভালো করেছেন, কেন না অনেক সঙ্গীতজ্ঞ এ-হেন অভিনিবেশে অভ্যস্ত যে চোখ ও কানের মধ্যে দিয়ে সমানে মরমে আনন্দধারাকে বরণ ক'রে নিতে পারেন। তা সত্ত্বেও সার জেম্সের একথা মূলত স্বীকার্য। কিন্তু তাতে প্রমাণ হ'ল কী? যে, অপেরা লেখা তাঁদের অন্তত উচিত নয় যাঁরা সঙ্গীত ভালোবাসেন? তা তো হ'তে পারে না। অথচ প্যুরিষ্টের দৃষ্টিভঙ্গি সত্য হ'লে এ-সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ হ'ত একথা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি সত্য নয় এই জন্যে যে, জৈবলীলায় মানুষ যেমন বিচিত্র জীব, তার চেতনা ততোধিক। কাজেই সে বহুর

মধ্যে দিয়ে সুষমার আনন্দকেই দেখে বড় ক'রে। তাই সনাটার চেয়ে অপেরা মহত্তর সৃষ্টি ব'লে, সনাটায় বিশুদ্ধ শ্রুতিগত সাঙ্গীতিক আনন্দের পথে দৃষ্টিগত আনন্দ বাদ সাধে না একথা মেনে নেওয়া সত্ত্বেও কেউই বলেন না যে স্বরকার পিয়ানোয় ততখানি সার্থকতা পান যতখানি পান অপেরায়।

কথাটা অবান্তর নয়। কারণ যাঁরা হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে কথার দৈন্যকে সমর্থন করেন তাঁরাও এটা করেন অনেক সময়ে এই ধরণের একদেশ-দর্শিতার কবলে প'ড়ে যান ব'লে, অর্থাৎ একপেশো বিশুদ্ধিপন্থী হ'য়ে সুষমার সমগ্রদৃষ্টি হারান ব'লে। তাই তাঁরা ভুলে যান যে মন গভীর আনন্দ আহরণ করে প্রায়ই বিচিত্র উপায়ে এবং সমৃদ্ধির তৃষ্ণা সুষমার আকুতি হ'ল তার চোখের আলো, বুকের নিশ্বাস। তাই শুধু সুরের তৃষ্ণাকেই সে সর্বেসর্বা ক'রে দেখতে পারে না—সুরে কিছু খোয়াতেও সে রাজি—যদি কথা সুরের মিলনে সমৃদ্ধতর আনন্দ পায়।

কিন্তু সুরের আনন্দ এত স্নিগ্ধ এত সুন্দর যে যখন সে অভিভূতি আনে তখন একথা ভুলিয়ে দেয়। তা না দিলে রবীন্দ্রনাথের মতন মনস্বীও জীবনস্মৃতিতে লিখতেন না যে সুর কেন কথার দাস হবে ইত্যাদি। এ ভুল আমি নিজেও করেছি তাঁরই ম'ত—সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও গ্রহণক্ষমতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ভুল বুঝেছেন, আমারও ভুল ভেঙেছে। একথা এত স্বচ্ছন্দে লিখছি—লেখবার অধিকার তিনি দিয়েছেন ব'লেই। আমি তাঁকে সম্প্রতি লিখেছিলাম একটি চিঠিতে যে তাঁর এ-মত যে ভুল ছিল—একথা স্পষ্ট ক'রে লেখার সময় এসেছে, কেননা নানা পত্রিকাদিতে তাঁর এই কাঁচা মতটি ভূয়োদর্শীর পাকা মত ব'লেই জাহির করছেন সব ওস্তাদিপন্থী সুরবেত্তারা। রবীন্দ্রনাথকে আমি লিখেছিলাম—আমারও এই ভুলই হয়েছিল যখন হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের রসে অভিভূত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন মত বদলাতে বাধ্য হয়েছি কেন না এখন দৃষ্টি যায় বেশি দূর—অনাসক্ত ভাবে ভাববার ক্ষমতাও বেড়েছে এ নিশ্চয়। লিখেছিলাম যে আমি নিজে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে কবি তাঁর সে প্রাগৈতিহাসিক মত

বদলিয়েছেন, কিন্তু এটা আজ স্পষ্ট ক'রে বলা অত্যন্ত দরকার। এতে তিনি খুসি হ'য়েই আমাকে লেখেন (তারিখ ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮):

"কল্যাণীয়েষু, দিলীপ,

মত বদলিয়েছি। জীবনস্মৃতি অনেককাল পূর্বের লেখা। তার পরে বয়সও এগিয়ে চলেছে, অভিজ্ঞতাও। বৃহৎ জগতের চিন্তাধারা ও কর্মচক্র যেখানে চলছে সেখানকার পরিচয়ও প্রশস্ততর হয়েছে। দেখেছি চিত্ত যেখানে প্রাণবান্ সেখানে সে জ্ঞানলোকে ভাবলোকে ও কর্মলোকে নিত্যনূতন প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, কীটপতঙ্গের মতো একই শিল্পপ্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি করছে না। আমার মনে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই যে কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সঙ্গীতের, সাহিত্যের কিম্বা কোনো ললিতকলার চরম সদ্গতি নয়। হিন্দুস্থানী কালোয়াতের কণ্ঠব্যায়ামের তারিফ করতে রাজি আছি, এমন কি তার রসভোগ থেকেও বঞ্চিত হ'তে চাইনে। কিন্তু সেই রস চিত্তকে যদি মাদকতায় অভিভূত ক'রে রাখে—অগ্রগামী কালের নব নব সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের পিছনে আমাদের বিহ্বলভাবে কাৎ ক'রে রেখে দেয়, খাঁচার পাখীর মতো যে-বুলি শিখেছি তাই কেবলি আউড়িয়ে যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্যে বাহবা দাবি করি, তাহ'লে এই নকলনবিশী বিধানকে সেলাম ক'রে থাকব তার থেকে দূরে ; নূতন সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চলব সেও ভালো, কিন্তু হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকল-বাঁধা সাক্রেদী করতে পারব না। ভুল ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগবিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকব নবসৃষ্টির কামনা নিয়ে। বাঁধা মতের প্রবীণদের কাছে গাল খাব—জীবনে তা অনেকবার খেয়েছি—কিন্তু আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আমি কিছুতেই মানব না যে আমি ভূতকালের ভূতে-পাওয়া মানুষ। আজ য়ুরোপীয় গুণী-মণ্ডলীর মধ্যে এমন কেউ নেই যে বলে না যে অজন্তার ছবি শ্রেষ্ঠ আদর্শের ছবি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন বেওকূফ কেউ নেই যে ঐ

অজন্তার ছবির উপর কেবল দাগাবুলিয়ে যাওয়াকেই শিল্পসাধনার চরম ব'লে মানে। তানসেনকে সেলাম ক'রে বলব, ওস্তাদজি, তোমার যে পথ আমারও সেই পথ, অর্থাৎ নব সৃষ্টির পথ। বাংলা দেশ একদিন সঙ্গীতে গণ্ডিভাঙা নবজীবনের পথে চলেছিল। তার পদাবলী তার গীতকলাকে জাগিয়ে তুলেছিল দাসী ক'রে নয়, সঙ্গিনী ক'রে, তার গৌরব রক্ষা ক'রে। সেই বাংলা দেশে আজ নতুন যুগের যখন ডাক পড়ল তখন সে হিন্দুস্থানী অন্তঃপুরে প্রাচীরের আড়ালে কুলরক্ষা করতে পারবে না—তখন সে জটিলার শাসন উপেক্ষা ক'রে যুগলমিলনের পথে চরম সার্থকতা লাভ করবে। এ নিয়ে নিন্দে জাগবে কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না।

মত বদ্‌লিয়েছি। কতবার বদ্‌লিয়েছি তার ঠিক নেই। সৃষ্টিকর্তা যদি বারবার মত না বদলাতেন তাহ'লে আজকের দিনের সঙ্গীতসভা ডাইনসরের ধ্রুপদী গর্জনে মুখরিত হোত এবং সেখানে চতুর্দন্ত ম্যামথের চতুষ্পদী নৃত্য এমন ভীষণ হোত যে যারা আজ নৃত্যকলায় পালোয়ানির পক্ষপাতী তারাও দিত দৌড়। শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তাহলে বুঝব এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশি। ইতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

"কল্যাণীয়েষু,

গীতিভারতীর বীণায় বঙ্গবাণীর একটা তার চড়াবার ব্যাপারে তোমাকে সপ্তরথীর তারস্বর বর্ষণ সইতে হবে একথা ভাবতে পারিনি বিশেষত সপ্তরথীরা যখন সবাই বাঙালী, যে বাঙালী হিন্দুস্থানীকে ঠেলে ফেলে বাংলাভাষাকেই রাষ্ট্রসিংহাসনে চড়িয়ে জয়মাল্য না দেবার আক্ষেপে প্রায় হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্ত্রীচরিত্রের মতোই বাঙালীর চরিত্রং দেবা ন জানান্তি কুতো মনুষ্যাঃ। এই বাঙালীই একদিন বাঁকা ঠোঁটে কী রকম বক্রোক্তিবর্ষণ করেছিল যে দিন অবনীন্দ্র চিত্রকলাকে বাংলাদেশের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন করে-

ছিলেন। আজ বাঙালীর সেলামের ধারা ছুটেছে একমাত্র হিন্দুস্থানী তানকর্তবের দিকে, সেদিন বাঙালী ভক্তবৃন্দের স্যালুটেশন উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছিল একমাত্র বিলিতি চিত্রলেখার অভিমুখে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটা কথা বাঙালী প্রায় আউড়িয়ে থাকে, বলে নিশ্চয়ই বাঙালী জাত অবতারবিশেষ, কিন্তু আত্মবিস্মৃত অবতার। বোধকরি গানের অবতারত্বে আজ তার সেই আত্মবিস্মৃতির ধাক্কা পড়ছে তোমারই পিঠে। ভয় নেই, আবার একদিন আসবে যখন এই অবতারের আত্মস্মরণ জেগে উঠবে, তখন হয়ত একেবারে দৌড়বে উল্টোমুখে। গোঁড়ামির মাদকতায় যারা বেহোঁষ থাকে তাদের এই দশাই হয়, একবার এপক্ষে তাদের রামে মারে, আর একবার ওপক্ষে মারে রাবণে। আমার কথা যদি বলো আমার রুচিটা কনের ঘরে মাসি, বরের ঘরে পিসি, দুপক্ষের ভোজেই আমি লুচি সন্দেশ লুটি,—মিঞা সাহেবদের মোগলাই খানায় যে রুচি নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু বাঙালী গিন্নিদের হাতের ঝোলঝাল সুক্তনিতে একটু বিশেষ রস পাই, আর হজমও হয় সহজে। এটা কেবলমাত্র রুচির কথা বলে আমি মনে করি নি, এর মধ্যে বাহাদুরীও আছে। একদিন বাংলার সমজদাররা যখন নববাংলার চিত্রকলাকে হাস্যবাণে জর্জর করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন তার মধ্যে এই একটা অভিমান ছিল যে তাঁরাই বিলিতি আর্ট বোঝেন ভালো, তাই র‍্যাফেলের নাম করতে করতে তাঁদের দশম দশা প্রাপ্তি হোতো, আজ তানসেনের নাম করতে এঁদের চোখের তারা উল্টে পড়ছে। এর মধ্যে নিজেদেরই তারিফ করবার একটা ঝাঁজ আছে। যাদের বোধশক্তি যথার্থ উদার তাদের এই দুর্গতি ঘটে না।

ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

কালিম্পং তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

কিন্তু এ তো গেল যুক্তির কথা—গানের বিকাশের এজাহারের কথা। এ সবেরই প্রয়োজন আছে মানি। কিন্তু এর চেয়েও বড় হ'ল আমাদের দুরাশার এজাহার। সে বলে যে, রাগসঙ্গীত মহিমময়,

সম্পৎশালী, আদরণীয় এসব মেনে নিলেও তার স্তরেই আমরা আটক থাকতে পারি না : তার যুগসঞ্চিত সম্পদ আত্মসাৎ ক'রে আমাদের যে করতে হবে নব সৃজন। অতীত যুগের সঙ্গীত আমাদের বরেণ্য, কিন্তু নবসঙ্গীতের সৃজন হ'ল—মোজার্টের ভাষায়—আমাদের "রক্তের দুরন্ত আকুতি।" তাই অতীতের সঙ্গীতধারার বৈশিষ্ট্যকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রেও তারই বরে আমাদের আজ অঙ্গীকার করতে হবে ভাবীকালের নব-সঙ্গীতকে : এ-যুগের ঋষিবাক্য স্মরণীয়—

"We do not belong to the past dawns
but to the moons of the Future."*

অতীত উদয়-গোধূলির স্মৃতিসন্তান মোরা নহি :
অনাগত যুগমধ্যাহ্নের আবাহনে জেগে রহি।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

নববর্ষ, ১৩৪৫

স্বীকৃতি :

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "মল্লারিকা" রাগিণীর ছবিটি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বাউল পাঠিয়েছিলেন দুটি, এজন্য তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করছি। স্নেহভাজন সুহৃৎ শ্রীনারায়ণ চৌধুরীও আমার সহায়তা করেছেন। এছাড়া আরও অনেক বন্ধু ও লেখকের কাছে ঋণ রয়েছে।

* Essays on the Gita……Sri Aurobindo.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৩	মন্বতে	মন্ত্রেতে
১৬১	১৪	ভেঙ্গে	ভেঙে
১৮৯	শেষ	ষা	ষা
২৪৪	২৩	অসীম-	অসীম
২৫৩	শেষ	pearless	peerless
২৫৫	শেষ	শরণের	চরণের

সূচীপত্র

অ

আ

উ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

চ

ছ

জ

ট

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

মল্লারিকা রাগিণী

(ধ্যান)

গৌরী কৃশা কোকিলকণ্ঠনাদা
গীতচ্ছলেনাত্মপতিং স্মরন্তি ।
আদায় বীণাং মলিনা রুদন্তি
মল্লারিকা যৌবনদূনচিত্তা ॥

গৌরী, তন্বী, কোকিলকণ্ঠী—গানের ছলে
প্রাণদীপে জালে বল্লভ-স্মৃতি-চারণী শিখ
বীণাপাণি সখী বিধুরা তিতিলা নয়নজলে
যৌবনরাগ-উচ্ছলহিয়া—মল্লারিকা ॥

মার্গ-সঙ্গীত

(রাগ সঙ্গীত)

সঙ্গীতদর্পণ :

দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।
মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্‌॥

চিন্তায় আকুল ধাতা :
কোথা গীত মুক্তিদাতা ?
ভেটিয়া ভরতমুনি বলে :
"শিবের সম্মুখে আমি
গেয়েছি এ-গান স্বামী,
এরি নাম 'মার্গ' ধরাতলে।"

WAGNER :

Die Kunst beginnt da wo das Leben aufhört.
Wenn uns die Gegenwart nichts mehr bietet,
schaffen wir es durch die Werke der Kunst.

জীবনের লীলা যেথায় অস্ত যায়—
নব-কল্পনা-অরুণিমা জাগে রঙিন আল্পনায়।
দিনের দুরাশা ফুরালে সান্ধ্য ছায়—
শিল্পের ফুলে সৃজি মোরা তারে ধূলি-বসুন্ধরায়।

ROMAIN ROLLAND :

Le spéctacle de cette éternelle floraison de la
musique est un bienfait moral. C'est un
repos au milieu de l'agitation universelle.

—*Musiciens D'Autrefois*

যুগে যুগে চলে গীতি ফুল্লরা উছলি' চিরন্তনী
ফুটায়ে তমসা-তন্দ্রার তটে চিন্ময়ী জাগরণী।
আনে সে কান্তি-বরাভয়—
ঘোষি' অশান্তি-পরাজয়—
উদ্‌ভ্রান্ত এ-ভুবনে ঝলকি' অভ্রান্তির মণি।

উৎসর্গ

৺আবদুল করিম (তিরোধান—২৭.১০.১৯৩৭)

স্বর-রাজেষু,

হে স্বরসুন্দর বন্ধু! ধ্রুবলোক হ'তে তব প্রাণ
বাহিয়া আনিত মর্ত্যে ছন্দময়ী গগন-জাহ্নবী।
আধ-নিমীলিত তব ধ্যাননেত্রে অধরা-সন্ধান
মন্দ্রিত ধরার তালে অসাঙ্গ-ঝঙ্কারে রূপোৎসবী!
যা কিছু চাহিতে গুণী, উচ্ছলিতে দীপ্ত প্রতিভায়
অমিত সাধনা তব অমিতাভ হ'ত সে-জোয়ারে।
স্বপ্নচারী সঙ্গীতের রত্নাকর! আজি তব পায়
নমি মোরা ভক্ত তব, শিষ্য তব—অশ্রু-উপচারে।
দানব্রতী! নহে তব গীতি-ঋণ শুধু স্মৃতি-শিখা:
প্রতি প্রেমকণ্ঠে সেই ঋণ হবে মূর্ছনা-মালিকা।

২৮.১০.১৯৩৭

উৎসর্গ

শ্রীমান্ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়,

প্রদীপ্ত ঐ সঙ্গীতে কোন্ চিরন্তনীর জালবোনা
সাধলে ঐন্দ্রজালিক, এঁকে প্রেমতুলিতে আল্পনা!
নামল তোমার যুবন্ প্রাণে আরাধনার জাহ্নবী :
তাই প্রতিভায় ফুটল তোমার সুরসাধনার গান-ছবি

শ্রীমতী মোতি বাঈ,

বহিন্, তুমারী গীতিবিহারী-মন্দাকিনীকি শান্তি
মেরো অন্তর জপত নিরন্তর—মূর্ছনমীড়কি কান্তি।
অজহুঁ মধুস্বর অম্বর-নূপুর-সঙ্গত-কোমল-নৃত্য
মনমোঁ উছলত মুকতি-কমল-ব্রত, কঙ্কর হোত অনিত্য॥

১

অ-ঘটনার আঘাটায়

প্রথমেই ব'লে রাখি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারাপর্যায়ে কোনো সুসম্বদ্ধ ইতিহাস লেখা এ-বইটির লক্ষ্য নয়। অবশ্য এযুগের একটা মস্ত চাহিদা যে ইতিহাস-প্রণয়ন, প্রত্নতত্ত্ব-চর্চা এবিষয়ে সন্দেহের স্থান নেই। কাজেই আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস লেখার ইচ্ছাও সম্প্রতি অনেকের মনেই জেগেছে—বিশেষ ক'রে য়ুরোপীয়দের। এঁদের মধ্যে উনবিংশ শতকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দুজনের নাম: সার উইলিয়াম জোন্স (১৭৮৪) ও ক্যাপ্টেন এন্ অগস্টস্ উইলার্ড (১৮৩৪)। বিংশ শতকের দুজন ভারতীয় সঙ্গীতবিৎ হচ্ছেন—রেভরেণ্ড পোপলি ও ফক্স ষ্ট্রাঙ্গোয়েজ। আর হিন্দুসঙ্গীতের শ্রুতি সম্বন্ধে অনেক ব্যর্থপ্রয়াস ক'রে যিনি নাম কিনেছেন তাঁর নাম: ই ক্লেমেণ্ট্স্। প্রাচীনদলের ভারতীয় মনীষিত্রয়ীর নামও সবাই শুনে থাকবেন: ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮৬৮), রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৭৪) ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪)। অতঃপর এ-শতাব্দীতে—সঙ্গীতের দিক্‌পাল তত্ত্ববিৎ নিশ্চয়ই ৺পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। এছাড়া আরও বহু সঙ্গীতকোবিদ আছেন, তবে যাঁদের নাম করলাম এঁরাই অগ্রণী একথা নির্ভয়েই বলা যায়।

ঐতিহাসিক সন্ধিৎসা হ'ল এযুগের একটি প্রধান ধর্ম, বিশেষ ক'রেই আধুনিক প্রবণতা। আগে যে এধরণের কৌতূহল আমাদের ছিল না তা নয়—কিন্তু মনের বৈজ্ঞানিক বৃত্তিদের অনুশীলনের ফলে এ-সন্ধানীবৃত্তি হাল আমলে যতটা ব্যাপক হয়েছে আগের যুগে তেমন হ'তে পারে নি। তাই আমাদের দেশে আধুনিক ঐতিহাসিকতাকে বিশেষ ক'রেই পাশ্চাত্যের দান বললে বোধ করি ভুল হবে না। একথা অবশ্য সবাই জানেন যে পূর্বপুরুষশ্রদ্ধা চৈনিকদের মজ্জাগত—কিন্তু

তাঁদের ঐতিহাসিক বিবরণী প্রভৃতিতে শুনতে পাই য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ খুব বেশি আস্থা রাখতে পারেন না। ভারতবর্ষের আর্যসন্তানগণও যে আজ পর্যন্ত যথাযথ ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দেন নি য়ুরোপীয়দের এ-অভিযোগ শুনতে শুনতে আমরাও হ'য়ে উঠেছি অতিষ্ঠ। অনেকটা সেই কারণেও হাল আমলে আমরা প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির দিকে ঝুঁকেছি—নইলে মান থাকে না যে। কিন্তু এ-যুগে ইংরাজদের মধ্যে একমাত্র ষ্ট্রাঙ্গোয়েজ সাহেব খানিকটা বুঝবার প্রয়াস পেয়েছেন কেন আমরা "না ইতিহাস লিখি, না পড়ি, না খুঁজি ঘটনাবলির তারিখের ক্রমপর্যায়ের সুসংবদ্ধ বিবৃতি। এতে হেসে-ওঠাই হ'য়ে এসেছে য়ুরোপীয়দের রেওয়াজ; কিন্তু কেন যে ভারতীয়রা অতীতস্মৃতির রোমন্থনবিলাস চায় না সেটা বুঝতে হ'লে আগে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা বোঝা দরকার। একটা সমগ্র জাতি তার নিজের অভাব চাহিদা সম্বন্ধে বড় একটা গোড়ায় গলদ করে না।"*

ভেবেচিন্তে সাহেব যে কারণ ঠাহর করেছেন তার বিবৃতি বা আলোচনার স্থান এ নয়—তার প্রয়োজনও দেখি না। তবে সংক্ষেপে —সাহেবের মতে—"ভারতীয়দের জ্ঞান তথ্যমূলক নয়—প্রজ্ঞার দিকেই তার ঝোঁক বেশি।" "His knowledge is of revelation more than of science."

বছর দশেক আগে লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও একবার ভারতীয় রাগরাগিণী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন মনে আছে যে, আমাদের রাগরাগিণীর স্রষ্টা বা সৃষ্টির ইতিহাস আমরা খুব কমই জানি, কেন না এ-ইতিহাস জানার খুব যে বেশি সার্থকতা আছে এটাই আমাদের

* "The Indian does not make or read histories and does not appreciate the value of chronological record. It is the custom to smile at this; but it would be well to understand his point of view first. A whole people is not generally mistaken about its real needs." (The Music of Hindustan, Ch. III)

আদবে খেয়াল হয় নি। আমরা চেয়েছি রাগরাগিণীর জীবনীশক্তির উদ্বর্তন ও শ্রীবৃদ্ধি : তাদের জন্মতারিখ কুলজি ঠিকুজি বংশকাহিনী—এসব জেনে কী লাভ ?

এই জন্যেই আমাদের রাগরাগিণীর কোনোরকম সন্তোষজনক স্বরলিপিই পাওয়া যায় না। কাজেই তানসেন (ধরা যাক্) তাঁর সৃষ্ট মিয়াঁ মল্লার বা দরবারি কানাড়া যে ঠিক কী ভাবে গাইতেন তা জানবার আজ আর কোনো উপায়ই নেই। সত্য বটে তাঁর "ঘরানা" গায়ক-বংশধর ঘরে ঘরেই আজো জীবিত—অন্তত তাঁরা জনে জনে নিজেদেরকে তানসেনকুলতিলক ব'লেই সঘনে ঘোষণা ক'রে থাকেন—কিন্তু তাঁদের এ-বংশকৌলীন্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আজকের দিনে বোধ করি নিতান্ত অসমসাহসিক দুএকজন পণ্ডিত ছাড়া কেউই তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ করতে ভরসা পাবেন না। অবশ্য দুচারজন সরল-বিশ্বাসী আছেন বৈ কি—তাঁদের সাহচর্যে আনন্দের পুঁজিও হয়ত বাড়ে, কিন্তু জ্ঞানের বহর বাড়ে বললে সম্ভবত একটু অতিমাত্রায় প্রিয়ংবদ হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা আছে, যাক্।

রাগরাগিণীর তথ্যসংগ্রহ করতে যাওয়া তাই বৃথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এতে অনেকে দুঃখ পান। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এজন্যে এত দুঃখ করবার কী এমন আছে ? সঙ্গীতের দৈহিক গঠনতথ্যের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক হ'লেও তার রসমূল হ'ল প্রাণতাত্ত্বিক। তাই যুগে যুগে রাগরাগিণীর বদল হবেই, হ'য়ে এসেছেও—অবধারিত। কারণ গুরু শিষ্যকে সঙ্গীতের দীক্ষা দিলেও তিনি যা শেখান শিষ্য তাকে কখনই হুবহু বজায় রাখেন না। কেন—সহজেই বোঝা যায় : আমাদের মার্গসঙ্গীতে গুণীকে প্রতি পদেই প্রতি রাগে রসসৃষ্টি করতে হয়েছে কল্পনাশীল প্রতিভার ইন্দ্রজালে। য়ুরোপের সাঙ্গীতিক ধারা স্বতন্ত্র : সেখানে সুরকারদের রচনার স্বাজাত্য স্বকীয়তা সযত্ন-রক্ষিত—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরলিপি পাহারা হ'য়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের রাগসঙ্গীতে—শুধু রাগসঙ্গীতে কেন, কোনো সঙ্গীতেই—তা নয়। দেশে দেশে যুগে যুগে কণ্ঠে কণ্ঠে বদলে গেছে রাগের রূপ। একথা প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও

জানতেন, তথা মানতেন। বিখ্যাত "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থের প্রণেতা শার্ঙ্গদেব লিখছেন তাঁর রাগাধ্যায়ে :

"যদ্বা লক্ষ্যপ্রধানানি শাস্ত্রাণ্যেতানি মন্যতে।
তস্মাল্লক্ষ্যবিরুদ্ধং যত্তচ্ছাস্ত্রং নেয়মন্যথা।"

ভাবার্থ: "যখন প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে রাগরাগিণীর চল্‌তি রূপের গরমিল দেখা যাবে তখন শাস্ত্রকেই বদলাতে হবে—চল্‌তি প্রথাকে না।" পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও তাঁর "লক্ষ্য সঙ্গীতে" এই কথাকেই একটু ঘুরিয়ে বলেছেন :

"প্রমাদাদপি সংমোহাদ্বে রাগভ্রষ্টতাংগতা
লক্ষ্যে স্যুস্তে সুনিয়তাঃ কর্তব্যাঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।"

কি না, "ভ্রমক্রমে বা অজ্ঞানতার দরুণ যদি রাগভ্রষ্টতা ঘটে তবে শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রকেই বদ্‌লে রাগগুলিতে শৃঙ্খলা আনবেন।"

একথা বিশেষ ক'রেই খাটে সঙ্গীত সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ খুব ঠিক কথাই বলেছেন বৈ কি যে, "প্রত্যেক যুগের মধ্যেই এই কান্নাটা আছে, 'সৃষ্টি চাই'। অন্য যুগের সৃষ্টিহীন প্রসাদভোগী হ'য়ে থাকার লজ্জা থেকে যে তাকে রক্ষা করবে তাকে সে আহ্বান করছে।" (সুর ও সঙ্গতি—৮৩ পৃঃ)

কথাটা যে সত্য তার একটা মস্ত প্রমাণ: হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীত আজো জীবন্ত। যদি সে অতীতের সুর-বিন্যাসের অচলায়তনে কায়েমী হ'য়ে থাকত তাহ'লে আজ তার স্থান হ'ত শুধু ঐতিহাসিক যাদুঘরে। কিন্তু আজো যে সে সভায় আসর জমাতে পারে—সবার কণ্ঠে নয় মানি, তবু মুষ্টিমেয় গুণীর কণ্ঠেও যে পারে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—আজো তার দীপ্তি মহিমা সৃষ্টিপরতা যে বিদেশীদেরও মন টানে তাতে প্রমাণ হয় যে চলন্ত যুগের সঙ্গে সে চলছে, এ-চলার ছন্দ সম্প্রতি খুবই মন্দাক্রান্তা হ'য়ে এসেছে বটে, তবু এখনো থেকে থেকে সে ন'ড়ে চ'ড়ে ওঠে এতে সন্দেহ নেই। এই চলা তো কম কথা নয়—কেন না চলা মানেই তো বদ্‌লানো, গতির ধর্মই তো সৃষ্টি।

অথ, আমাদের প্রতিপাদ্য দুটি : প্রথম, আমাদের সাঙ্গীতিক ইতিহাসের যে আঁতুড়েই পঞ্চত্বলাভ ঘটেছে এজন্যে খুব বেশি পরিতাপের হেতু নেই ; দ্বিতীয়, বর্তমান সময়ে সঙ্গীতের ধারাসংবদ্ধ ইতিহাস নিয়ে বেশি গবেষণা করাটা খতিয়ে পণ্ডশ্রমই দাঁড়াবে। দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যটির কারণ জলের মতন স্বচ্ছ : কেন না মাথা না থাকলে যেমন মাথাব্যথা অসম্ভব তেম্‌নি ঘটনার ঘটা না থাকলে সে-আঘাটায় ঐতিহাসিক বাণিজ্য চলে না।

অতএব এ-বইটিতে ডেটা-র ঘটাবহুল সাঙ্গীতিক ইতিবৃত্ত নিয়ে গুরুগম্ভীর গবেষণার দিকে আমরা আদৌ ঝুঁকব না : আমাদের আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকুক—আমাদের সাঙ্গীতিক ক্রমবিকাশের মূল ধারাটির দিকে। এ ধারাটুকুর মর্মগ্রহণ করতে যতখানি ইতিহাস জানার দরকার হয় কেবল ততখানি ইতিহাস অনুসন্ধান করব—সাধ্যমত। সাধ্যমত শব্দটির টীকা : পাই ভালো, না পাই—কী করা যাবে ?—

"অশোচ্যান্ হি গতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ"

—"যাদের জন্যে শোক করা নিষ্ফল, যারা মৃত, পণ্ডিতরা তাদের শোকে সময় নষ্ট করেন না।"

নাই বা হ'লাম পণ্ডিত : তাঁর দার্শনিক নামাবলীটা গায়ে দিয়ে মাঝে মাঝে পাড়া বেড়িয়ে আসতে দোষ কি ?

২

শাস্ত্রিক ঘনঘটায়

ভূমিকায় বলেছি আমরা ধ'রে নেব যে, আমাদের সঙ্গীতের গোড়াকার কথাটার সঙ্গে এ-বইটির পাঠক পাঠিকার পরিচয় আছে। অর্থাৎ এ-বইটি আমাদের সঙ্গীতের বোধোদয়ও নয়, কথামালাও না।

এর উদ্দেশ্য—আমাদের সঙ্গীতের মূল ধারাটিকে খোলা মন নিয়ে আলোচনা করা, শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করা কোন্ পথে আমাদের সঙ্গীত চলেছে—কী ধরণের ধারাবাহিকতার জের টেনে। ভূমিকায় এ-ও বলেছি যে, আমাদের সঙ্গীতের ঠিক্ ক খ থেকে যাঁরা আরম্ভ করতে চান তাঁদের জন্যে একটি উৎকৃষ্ট বই রয়েছে : "গীতসূত্রসার"। আর যাঁরা আমাদের সাঙ্গীতিক খুঁটিনাটির বিশেষজ্ঞ হ'তে চান তাঁদের জন্যে রয়েছে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বিপুল পরিশ্রমের ফল : অতিকায় "হিন্দুস্থানি সঙ্গীত পদ্ধতি"। এছাড়া সংস্কৃত গ্রন্থাদিরও অপ্রতুল নেই। কয়েকটি মাত্র প্রধান গ্রন্থের নামধাম দেওয়া মন্দ কি? খুব সংক্ষেপেই সারি :

১) ভরতের "নাট্যশাস্ত্র"। ম্যাকডনেল সাহেবের মতে খৃষ্টপূর্ব ২০০ সালে এ-গ্রন্থটি রচিত হয়। এতে আছে প্রধানত নাট্যতত্ত্ব, নৃত্যতত্ত্ব ও রাগতত্ত্ব। ঠিক রাগ নয় তবে রাগের পূর্বপুরুষ : তাদের নাম ছিল "জাতি"। "জাতি" যে-পর্দায় সুরু হ'ত তাকে বলত গ্রহ-স্বর, যে-পর্দায় শেষ হ'ত তাকে বলা হ'ত—ন্যাস-স্বর ; প্রধান পর্দাকে বলা হ'ত অংশ—এক বা একাধিক। এ ছাড়া আটটি রসের কথা আছে : শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, করুণ ও অদ্ভুত। নামনিধান গ্রন্থে আরো তুটি রসের উল্লেখ আছে : শান্ত ও বাৎসল্য—

> শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতহাস্যভয়ানকাঃ
> বীভৎসরৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসাঃ স্মৃতাঃ।

ভরত শান্ত রসের উল্লেখ করেন নি দেখে আশ্চর্য লাগে, কেন না সব সঙ্গীতেই শান্ত রস একটি প্রধান রস—আমাদের মার্গসঙ্গীতে তো বটেই। তবে বোধ হয় ভরত এ-রসটিকে করুণরসের অন্তর্গত ধ'রে নিয়ে থাকবেন—যদিচ করুণরস অ-শান্ত না হ'লেও শান্তরসকে ঠিক্ করুণ বলা চলে না। এ-বইটিতে প্রাচীন সঙ্গীতাদির সম্বন্ধে তুচারটি চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায় বৈ কি। পাতা উল্টে পাল্টে দেখা মন্দ নয়—যদিও এধরণের বই পড়তে গেলেই মনে হয় ইংরাজিতে তিনটি কথা : words! words! words!

২) শার্ঙ্গদেবের "সঙ্গীতরত্নাকর"। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এর জন্ম। এতে রাগাদি সম্বন্ধে নানান্ আলোচনা, তাল নৃত্য বাদ্যযন্ত্রাদি সম্বন্ধে নানা বিবরণী আছে। তা ছাড়া আছে শ্রুতি, স্বর, কলা, লঘু গুরু প্লুত তাল, গ্রাম, অলঙ্কার, রাগ, মূর্ছনা, বাদী-বিবাদী-সম্বাদী-অনুবাদী প্রভৃতির সংজ্ঞা ব্যাখ্যা বর্ণনা টীকা টিপ্পনি—নেই কী? গ্রন্থকার মার্গ ও দেশী এই দুরকম সঙ্গীতের সংজ্ঞা দিচ্ছেন এই ব'লে:

মার্গো দেশীতি তদ্দ্বেধা তত্র মার্গঃ স উচ্যতে
যো মার্গিতো বিরঞ্চাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাভিঃ॥
(২২ শ্লোক—প্রথম স্বরাধ্যায়)

কি না, মার্গ বলে সেই উচ্চ সঙ্গীতকে যা ভরত প্রমুখ মুনিরা গেয়েছিলেন ব্রহ্মার সাম্‌নে। আর পরেই শ্লোকেই আছে: দেশে দেশে চিত্তরঞ্জক যে-সব গান আদর পায় তাদের নাম হ'ল দেশী সঙ্গীত।

এ-সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করলাম এই জন্যে যে আর্যাবর্তে মার্গসঙ্গীত—ওরফে হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীত—পেয়ে এসেছে যে-কৌলীন্য-সম্মান সে-সম্মান যে-সঙ্গীত পেল না সে-ই প'ড়ে গেল অশাস্ত্রীয় লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে। রাগসঙ্গীতের রাজকীয় মানসম্ভ্রমের তাৎপর্যটি বুঝতে হ'লে একথাটি মনে রাখা দরকার।

এছাড়া সঙ্গীত রত্নাকরে যে-সব আলোচনা আছে তাদের সম্বন্ধে যা বক্তব্য ভূমিকায় বলেছি: যে, এসব প'ড়ে গানের ব্যবহারিক জ্ঞান এক তিলও বাড়বে না। কেন না স্বরলিপি না থাকার দরুণ আমাদের গান আগে কী ছিল সেটা শুধু শাস্ত্রবর্ণনায় জানা অসম্ভব। এসব বাগ্বারিধি মন্থন ক'রে তাই কৃষ্ণধন বাবু ঠিকই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ যে প্রকার অপরিষ্কার করিয়া সকল বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে কোনো বিষয়ের মীমাংসার আশা করা যায় না।" তাই সঙ্গীতশাস্ত্রিকতার কল্লোল থামানোই ভালো—কেবল প্রধান বইদের মধ্যে কয়েকটির নামোল্লেখ ক'রে ইতি করি:

৩) যথা সোমনাথের "রাগবিবোধ" (১৬০৯), দামোদর মিশ্রের "সঙ্গীত দর্পণ" (১৫৬০—১৬৪৭), ভাবদত্তের "অনুপ সঙ্গীত বিলাস" (১৬৮০)

ইত্যাদি। এর পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই যে অহোবল পণ্ডিতের "সঙ্গীত পারিজাত" এবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ নেই। এ বইটি সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা হয়। অহোবল পণ্ডিতই সব প্রথম একটা চলনসৈ রকম বর্ণনা দেন কী ক'রে তারের দৈর্ঘ মেপে সা রে গা মা পা ধা নি নির্ণয় করা যেতে পারে। এর বিবরণ পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দিয়েছেন তাঁর হিন্দুস্থানি সঙ্গীত পদ্ধতিতে। পদ্ধতিটি মোটেই বৈজ্ঞানিক নয় ব'লে এর আলোচনা অনাবশ্যক।

রামায়ণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা এখানে দরকার—কেননা অনেকের মতে রামায়ণ আমাদের প্রাচীনতম কাব্য—মহাকাব্য। তাতে দেখা যায় যে স্থানমূর্ছনাকোবিদ লব ও কুশ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তন্ত্রালয় সমন্বিত বীণা বাজিয়ে চব্বিশ হাজার শ্লোকের রামায়ণ গেয়েছিলেন ষড়জাদি সাতটি স্বরে, নয়টি রসে। (জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ তৌ তু গন্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ।) আরো দেখা যায় সে-সময়ে রাজকুলবধূদের জন্যে ছিল নাট্যশালা এবং রাজধানীতে বাস করত রাজগণের স্তুতিগায়ক "সূত" ও "মাগধ" নামে দুই শ্রেণীর গুণী। এঁদের হয়ত পেশাদারি গায়কের শ্রেণীতে ফেললে ভুল বোঝা হবে —তবে পেশাদারি ওস্তাদদের যে এঁরা পূর্বপুরুষ ছিলেন ও রাজাদের কাছে দক্ষিণা পুরস্কারাদি (state-subsidy ?) পেতেন একথা মনে করলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না।

মহাভারতে গানের কথা অল্পই আছে—বিরাটপর্বে রয়েছে অর্জ্জুন বৃহন্নলা নামে আত্মপরিচয় দিয়ে যখন বিরাটরাজকে বললেন: "গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি" তখন বিরাটরাজ বললেন যে তথাস্তু এ-তৌর্যত্রিক তিনি রাজকন্যা উত্তরাকে শেখাতে পারেন। পরে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহসভায় নট বৈতালিক সূত মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকেরা রাজন্যবর্গের গুণকীর্তন সুরু করল দেখতে পাই। অশ্বমেধপর্বে আছে যে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অপ্সরাদের নাচ ও "মহাদ্যুতি গীতিকোবিদ নারদ তুম্বুরু বিশ্বাবসু চিত্রসেন" প্রমুখ গন্ধর্ববৃন্দ সবার চিত্তরঞ্জন করেছিলেন:

"নারদশ্চ বভূবাত্র তুম্বুরুশ্চ মহাদ্যুতিঃ।
বিশ্বাবসুশ্চিত্রসেনস্তথান্যে গীতকোবিদাঃ॥
গন্ধর্বা গীতকুশলা নৃত্যেষু চ বিশারদাঃ।
রময়ন্তি স্ম তান্ বিপ্রান্ যজ্ঞকর্মান্তরেষু বৈ॥"

কিন্তু রাগরাগিণীর নামগন্ধও নেই।

৩

মার্গসঙ্গীতের ধ্যানলোক

বলেছি, যে-সংস্কৃতগ্রন্থগুলির নাম এইমাত্র উল্লেখ করলাম তারা আমাদের বিশেষ কোনোই কাজে আসে না আজকাল। এসব প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির হাজারো সাঙ্গীতিক পারিভাষিক আজকাল অনেকে শুধু সঙ্গীতশিক্ষার্থীদেরকে বিহ্বল করবার জন্যেই জেনে রাখেন—রাগসঙ্গীতের বিকাশধারা বুঝবার জন্যে ওদের বিশেষ ক'রে না জানলেও চলে। তবু এদের চর্চা করতে গিয়ে এ-পণ্ডশ্রমেরও খানিকটা সার্থকতা পাওয়া যায় দুটি ব্যাপার দেখে: প্রথম, আমাদের উচ্চসঙ্গীতের ধারা বহুদিন থেকে আমাদের মনের মাটিতে শিকড় গেঁথেছে; দ্বিতীয়, এ-সঙ্গীতের মূল ধারাটি—যাকে প্রাচীনরা বলতেন মার্গসঙ্গীত, আমরা বলি রাগসঙ্গীত—তার সনাতন লক্ষ্য আজো পূরো হারায় নি। এ-লক্ষ্যটি কী বুঝতে হ'লে রাগ কাকে বলে সেটা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এটা বড় সহজ কাজ নয় কিন্তু জরুরি। কেননা আমাদের উচ্চসঙ্গীতের বনিয়াদ বা (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) "বাসাটা" আজো এই রাগসঙ্গীতের "মহাদেশে"।* সুতরাং আমাদের

* "ভারতবর্ষের বহুযুগের সৃষ্টি-করা যে সঙ্গীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াবি কোথায়।......সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি।" (সুর ও সঙ্গতি—৮ পৃষ্ঠা) "তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের পরমতম বাণীটি খুঁজতে হ'লে যেতে হবে এই রাগ-সঙ্গীতেরই অন্তঃপুরে। একে বরাবর মার্গসঙ্গীতই বলব।

মার্গসঙ্গীতের উদ্ভব নিয়ে বহু গবেষণাই হয়েছে, কিন্তু কি ক'রে যে রাগগুলি গ'ড়ে উঠল, রূপ নিল, "দানা বাঁধল"—সে-সম্বন্ধে রকমারি থিওরি থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও কেউই নিশ্চয় ক'রে কিছু বলতে পারেন না। কেউবা বলেন: এক এক দেব দেবীর প্রেরণায় রাগের সৃষ্টি। কেউবা বলেন: বহু গান গাইতে গাইতে এক একটা সুর গ'ড়ে উঠেছে প্রবালদের জটলায় প্রবালদ্বীপের মতন। আবার কেউ কেউ বলেন: স্বরগ্রামগুলির পর্দা নিয়ে গুণিশিরোমণিরা সৃষ্টি করতে নেমে রাজারাজড়াদের ফরমাসে দিনের পর দিন রাগ সৃষ্টি ক'রে গেছেন। কেউ বলেন: উঁহুঃ, শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাঁশি শুনে মুগ্ধ হ'য়ে ধরলেন গান, তাতে ষোল হাজার গোপী যোগ দেওয়ার দরুণই ষোল হাজার রাগের উৎক্ষেপ।* এম্নি কত কী জল্পনা কল্পনা রূপকথা উপকথা!

এর মধ্যে দেবদেবীর প্রেরণার থিওরিটি খুব চিত্তাকর্ষক। তাই এ নিয়ে একটু আলোচনা করলে মন্দ কী?

সবাই জানেন ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর তো বটেই তার পরে ওদের সন্তানসন্ততিগুলিরো অধিষ্ঠাতৃ-দেবদেবীদের এক একটি মূর্তি আছে। সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে এদের নাম—"ধ্যানম্"। একটি মাত্র রাগ নিলেই চলবে নমুনা হিসেবে। "সঙ্গীতদর্পণে" দামোদর মিশ্র রামকিরী (রামকেলি) রাগের ধ্যান-মূর্তি পরিকল্পনা করছেন এই বলে:

পার হোতে পারিনি। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তাদেরি বজায় থাকে।" —রবীন্দ্রনাথ ("সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধ—"ছন্দ" ১৮১ পৃঃ)

* সঙ্গীতমারভ্য কৃষ্ণো মুরলীনাদমোহিতঃ
গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি চ ষোড়শঃ।
(নারদ-সংবাদ)

হেমপ্রভাভাস্বরভূষণা চ
নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী
কান্তে সমীপে কমনীয়কণ্ঠা
মানোন্নতা রামকিরী মতেয়ম্।

(৪১শ্লোক—রাগাধ্যায়)

অর্থাৎ

স্বরালঙ্কৃতা স্বর্ণপ্রভায় দীপ্তিময়ী!
অঙ্গে সুনীল নিচোল নিয়ত দোলাও।
কান্ত-সমীপে চিরকমনীয়কণ্ঠা অয়ি
মান-উন্নতা রামকিরী, মন ভোলাও।

এই যে সুন্দর বর্ণনা—স্বতই মনে প্রশ্ন উদয় হয়—এর তাৎপর্য কী? কী কারণে এর পরিকল্পনা হ'ল? দেবদেবীরা গান করছে নৃত্য করছে বীণা বাঁশি বাজিয়ে বিভোর—এ-কল্পনা অনেক সভ্য জাতিরই পুরাণে রূপকথায় মিথলজিতে রঙিয়ে রসিয়ে ঝলমলিয়ে উঠতে দেখা গেছে। কিন্তু কোনো বিশেষ সুরের বা গানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যানমূর্তি পরিকল্পনা এ অন্য কোনো দেশের সঙ্গীতেই নেই। ঋতুবিশেষের দেবতা, মনোভাব বা প্রবৃত্তি বিশেষের দেবতা এ শোনা যায়—যেমন নেপচুন, জুপিটার, ভিনাস, লুসিফার। কিন্তু সুরবিশেষ গাইবার সময়ে বিশেষ দেবদেবীর মূর্তি—এ কল্পনাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব'লে মন কি জানি কেন একটু গৌরববোধ না ক'রে পারে না!

গৌরববোধের কারণ কোনো উগ্র স্বাজাত্যাভিমান নয়: কারণ এই যে, যে-সঙ্গীতের ধারা জগতের অন্য সব সঙ্গীতের ধারা থেকেই স্বতন্ত্র, সে-সঙ্গীতের ঊর্ধ্ব-প্রেরণার কাছে যে-সাধকই নিজে খুলে ধরুন না কেন তিনি শ্রদ্ধেয়। আমাদের মার্গসঙ্গীতের এই ঊর্ধ্বমুখিতা তাই আজো প্রতি সঙ্গীত-কোবিদেরই শ্রদ্ধার্হ। হওয়া উচিতও বৈ কি। "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ": আমরা যাকে শ্রদ্ধা করি তারই সাযুজ্য পাই, গৌরবের সরিক হই। মার্গসঙ্গীতের ধ্যানরূপ পরিকল্পনায় এই

অদ্বিতীয়তাকে তাই কুসংস্কার ব'লে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ নেই যেহেতু এর পিছনে আছে একটা ঊর্ধ্ব-তৃষ্ণা—গগনাকুতি।

কিন্তু সে কথা থাক্—আসল প্রশ্নটাতেই ফিরে আসি। প্রশ্নটা হ'ল, রাগরাগিণীর খাতে আমাদের সঙ্গীতের এই যে একটি অজাতপূর্ব ধারা আজ পর্যন্ত এমন গতিরুচ্ছল রয়েছে—এর উৎস কোন্ আলোর অসাঙ্গ গঙ্গোত্রী? কী ভাবে সে উৎস বইল, কেমন ক'রে প্রাণবেগ সঞ্চয় করল, কোন্ সাধনায় এ-বেগ আজও এমন কল্লোল-ঊর্মিল, নৃত্য-চঞ্চল, সুষমা-সুন্দর?

একটা কথা এখানে মনে হয় খুবই বেশি ক'রে যদিও একে যুক্তির পারিভাষিকে তর্জমা ক'রে বলা সহজ নয়। তবু চেষ্টা করতেই হবে—কেন না মার্গসঙ্গীতের এই অন্তর-প্রেরণার দিকটা তো শাস্ত্রীয় বাগাড়ম্বর নয়, এ হ'ল আরাধনার দিক—কাজেই ধ্যানের অনুধাবনের যোগ্য বিশেষ ক'রেই। কেবল এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এধরণের শ্রদ্ধাকে হাল আমলের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের গাণিত পদ্ধতিতে প্রমাণ করা অসম্ভব। আজকের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাদী ৺লোয়েস ডিকিন্সনের শেষজীবনের একটি গভীর উপলব্ধির কথা সত্যিই আশাপ্রদ যে, "জরুরি কোনো কিছুই ঠিক্ প্রমাণ করা যায় না"। * সেই জন্যে এধরণের সব গভীর কথাই শ্রদ্ধাবিনম্র খোলা মনে বিচার্য—তর্ক-সমুদ্ধত আস্ফালনে এর যাচাই হ'তে পারে না। এবার বলি আশৈশব বহু গুণী জ্ঞানী ও সঙ্গীতকোবিদের চরণতলে সঙ্গীত-দীক্ষার ফলে যে-কথা আমার মনে হয়েছে এ সম্পর্কে।

সব শিল্পেরই দুটো দিক থাকে: একটা তার রূপবন্ধের দিক, অপরটা তার ধ্যানপ্রেরণার দিক। ধ্যানলোক থেকে যে-আলো যে-স্রোতের ঢল নামে সে যতই কেন প্রাণবন্ত হোক না বাইরের বাধাকে একদিনে অতিক্রম করতে পারে না: পারে—বহু পরীক্ষায়, বহু সাধনায়, বহু তপস্যায়। তার কারণ আমাদের কারুর মনই এক মুহূর্তে আলোর

* "Nothing that is important can be *proved*."—ফর্স্টারের সদ্য প্রকাশিত ডিকিন্সন জীবনী।

দিকে নিজেকে পুরোপুরি খুলে ধরতে পারে না—মনের প্রাণের হৃদয়ের দুয়ার কখনো বা অকস্মাৎ খোলে কিন্তু তারপরেই আসে বন্ধ হ'য়ে নইলে একটু একটু ক'রে তবে খোলে—এইটেই বেশি ঘটে থাকে।

য়ুরোপীয় সঙ্গীত-চর্চা করতে গিয়ে একথা আমার মনে হয়েছিল আরো বেশি ক'রেই। ওদের দেশে "স্বরসঙ্গতি"-র বিকাশ একদিনে সম্ভব হয় নি। আগে এ-বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে দেই—কেননা আমি যা বলতে যাচ্ছি তাকে ঠিক মতন বুঝতে হ'লে ওদের স্বরসঙ্গতির অভিব্যক্তি পর্যালোচনা করলে সুবিধা হবে।

সঙ্গীতে একটা আধটা ক'রে পর্দা ধীরে ধীরে স্বরিত হ'য়ে ওঠে সব আগে মানুষের কণ্ঠে। ক্রমে তারা একসঙ্গে দলবেঁধে গায়—কোরাসে, কিন্তু একই পর্দায় প্রত্যেকের কণ্ঠ মিলিয়ে। একেই ওরা বলে singing in unison. ওরাও এইভাবেই গাইত দলবদ্ধ সঙ্গীত গ্রীসে, পরে রোমে—বিশেষ ক'রে. নাটমঞ্চে গির্জায়। গ্রেগোরিয়ান গির্জাস্তব বিলেতে এখনো শোনা যায় যদিও খুব কম। আমি 'আইল অফ ওয়াইটে' একবার বহু কষ্ট ক'রে শুনতে গিয়েছিলাম। সবাই লাটিনে গান করে কিন্তু একেবারে সুরলহরী—স্বরসঙ্গতির নামগন্ধও নেই। এ-সঙ্গীতের বয়স কম ক'রে দেড়হাজার বৎসর। স্বরসঙ্গতির চল হওয়ার পর থেকে এ-সঙ্গীত লুপ্তপ্রায়—তবু এ-সঙ্গীতের স্বরলিপি আছে, তাই বিশেষ বিশেষ উৎসবে ওদের দেশে এখনো কাথলিক গির্জায় সন্ন্যাসীরা এ-সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। রোমের প্রথম গ্রেগরি (পোপ) (৫৪০—৬০৪) এ-সঙ্গীতের অনুশাসকদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন ব'লেই এ-নামকরণ।

এ-সঙ্গীতের সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের সুরসরল সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এর পর ওরা একসঙ্গে গাইতে গিয়ে ভারি অসুবিধা বোধ করল। দেখল কি, সবার গলা তো সমান নয়, কারুর বা খাদে কারুর চড়া। তাই একসঙ্গে গাইতে জুৎ পাওয়া যায় না—বিশেষ মেয়েরা যোগ দিলে। তাই ওরা করল কি, একই গানের এক এক লাইনকে নানা কণ্ঠের জন্যে নানা সুরে বেঁধে স্বরলিপির ছকে

ফেলে তাকে করল অচলপ্রতিষ্ঠ : পরিণাম—কাউণ্টারপয়েণ্টের অভ্যুদয়। একটা খুব সরল দৃষ্টান্ত নেই।

ধরা যাক জন গাইছে →সা মা মা | মা রা মা |

অম্‌নি ওর সঙ্গে লুসি গাইছে →র্সা র্সা র্মা র্সা র্রা র্সা

এরই নাম হ'ল আদিম কাউণ্টারপয়েণ্ট—হার্মনির অগ্রদূত। এর পরে অবশ্য কাউণ্টারপয়েণ্টও ক্রমশ জটিল হ'য়ে উঠল, হাজারো বিধিবিধান গ'ড়ে উঠল হাজারো ভুলভ্রান্তি কল্পনা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। ঐ যে বললাম—প্রেরণা এল বিন্দু হ'য়ে, কিন্তু তাতে সিন্ধু-হিন্দোল জাগাতে যুগের পর যুগ গেল কেটে। লক্ষ্য রইল একই—নানা সুরে গাইলেও কোন্ কৌশলে শ্রুতিকটু বিস্বরকে আনা যায় শ্রুতিমধুর স্বরৈক্য-সঙ্গতির কায়দায়—অহি-নকুল পর্দা কোন্ ইন্দ্রজালে গলাগলি ক'রে হয় মনোহর। পরীক্ষা করতে করতে অনন্যচিত্ত সাধনায় কান বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও পেল সাদৃশ্যের ইশারা : ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠল অতিকায় স্বরসঙ্গতির শিল্প ও সংধ্বনি-সঙ্গীতের বিজ্ঞান। এ আজ এমনই অদ্ভুত পরিণতি লাভ করেছে যে, অনভ্যস্ত শ্রুতি এর সিংহনাদে প্রথমটায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে না প'ড়েই পারে না। যদিও শুনতে শুনতে ক্রমে অনুভব করে এর অপূর্ব সৌন্দর্য, সুষমা।

কিন্তু যেকথা প্রতিপন্ন করতে এ প্রসঙ্গ উঠল : শৈশবাবস্থায় কোনো সঙ্গীতই প্রেরণা পেতে না পেতে গ'ড়ে ওঠে না। প্রতিভা বা সাধনার পরিণত অবস্থার কথা আলাদা : তখন (ব্রাউনিঙের ভাষায়) তিনটে শব্দে জ্বলে ওঠে চতুর্থ শব্দ নয়—একটি তারা, কিন্তু প্রতিভার এ-হেন সার্থকতম পরিণতি হয় বহু তপস্যায়। য়ুরোপীয় বিখ্যাত সঙ্গীতকার ওয়াগনার বলতেন : খেটে খেটে তিনি প্রায়ই মরণাপন্ন হ'তেন। বীটোভ্‌ন্ রচনা করতে করতে দিনের পর দিন স্নানাহার ভুলে যেতেন। বাখ্ বলতেন তিনি যে-দারুণ খেটেছেন সেরকম খাটলে যে-কেউ সিদ্ধকাম হবে—ইত্যাদি। কিন্তু সে যাক্।

আমাদের রাগসঙ্গীতের প্রথম অবস্থাতেও এম্‌নিধারা কিছু একটা ঘটেছিল। রাগরাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী থাকুন না থাকুন যায়

আসে না কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা বিশেষ ক'রেই স্মরণীয় সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের গুণীরা সঙ্গীতে চাইতেন উর্ধ্বলোকের আবাহন। প্রতি শাস্ত্রেই তাই দেখি মুনি ঋষি গন্ধর্ব অপ্সরাদের ছড়াছড়ি। মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে সবাই একমত যে এ-সঙ্গীত হ'ল সেই সঙ্গীত যা ঋষিরা গাইতেন দেবতাদের কাছে, আর দেশীসঙ্গীত হ'ল সেই সঙ্গীত যা মানুষ গায় বিশেষ ক'রে মানুষের জন্যেই। ওদের ভাষায় বলতে হ'লে বলা চলে রাগ বা মার্গসঙ্গীতকে বলা হ'ত রিলিজাস্—দৈবিক: দেশী বা লোকসঙ্গীতকে—সেক্যুলার—ঐহিক।

আমাদের মার্গসঙ্গীতকারগণ যে উর্ধ্বমুখী প্রেরণা খুঁজতেন ব'লেই দেবদেবীর কাছে নিজের সৃষ্টিকে নিবেদন করতে চাইতেন এ কোনো একটা মনগড়া থিওরি নয়: ভারতীয় চিত্তবৃত্তির সমগ্র প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে একথা বোধ হয় আরো সহজে বোঝা যাবে। আমাদের আহারে বিহারে সব তাতেই কী দেখতে পাওয়া যায়? সব কর্মই ভগবানে উৎসর্গ করার অভীপ্সা। গীতায় ভগবান বলছেন দেবতারা আমাদের যজ্ঞের ভোক্তা তাই তাঁদেরকে উৎসর্গ না ক'রে কোনো কাজ করলে সে কর্ম অসার্থক হবেই। "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ"—"কেবল আপনার জন্যেই যে রন্ধন করে সে পাপকেই ভোজন করে।" যা করি যা রচি যা ভাঙি যা বলি যা ভাবি সবই সর্বেশকে নিবেদন করলে তবেই সফল, নৈলে নিষ্ফল। এ-নিবেদন না ক'রে শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রসাদার্থে যে-লোক ভোগ করে "স্তেন এব সঃ"—"সে চোর"—কেন না সর্ব কর্মের ফলভোক্তা হলেন বিশ্ববিধাতা। তাই সব আগে চাই তাঁকেই আমাদের সব কিছু নিবেদন করা। শুধু শিল্প-দর্শন-বর্গীয় অ-সাংসারিক অভিব্যক্তিতেই নয়—সংসারের সব উদ্যম কর্ম আনন্দ, জীবনের সব ক্রিয়াকলাপ চলনবলন সব কিছুকেই হ'তে হবে চেতনযজ্ঞের হবিঃ। তাই নামকরণ, উৎসব, কর্ম, বিবাহ, গর্ভাধান, দাহ, শ্রাদ্ধ—সব তাতেই ভগবানের স্মরণ ও আবাহনের বিধান দেওয়া হয়েছে বিশেষ ক'রেই। "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ"—কর্ম ভোজন হবন দান সবই—"কুরুষ

মদর্পণম্"—আমাকে অর্পণ করো এই-ই ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ।

রাগরাগিণীদের গাওয়ার রীতিনীতি ও বিধিবিধানকে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করলে বোঝা যাবে এই উৎসর্গ করার প্রেরণাই ছিল তাদের ধ্যানমূর্তি পরিকল্পনার মূলে, তাদের সময়-নির্ধারণের মূলে, আলাপ গান করার মূলে—এক কথায় রাগরাগিণীর মর্মের আকুতিটি ছিল একটি অন্তর্মুখী ওরফে ঊর্ধ্বমুখী আবহ গ'ড়ে তোলা। ওরফে বলছি এই জন্যে যে, যা-ই অন্তর-গহনের দিকে টানে তাই টানে উপরের দিকে: উচ্চতা ও গহনতা—height ও depth—অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে সমার্থক। যাক্ যা বলছিলাম: রাগরাগিণীর মধ্যে আলাপ গানের রীতিটিই এবিষয়ে বিশেষ ক'রে অনুধাবনীয়। আজকাল আলাপ গাওয়া একরকম উঠে গেছে বললেই হয়—কিন্তু এই সেদিন পর্যন্ত আমরা আলাপ শুনে এসেছি—এখনো কোনো কোনো বড় গায়ক গানের আগে আলাপ করেন।

এখন এই আলাপের অর্থ কী?—ওস্তাদরা বলেন স্বরের আবাহন। এখনো অনেকে বলেন, আলাপ না ক'রে গান সুরু করা অকর্তব্য, আলাপ নইলে রাগ জমে না। অবশ্য তাঁরা সাধারণত একথা বলেন অতীত রেওয়াজের দোহাই দিয়ে, কিন্তু তাতে যায় আসে না। জরুরি কথাটা হচ্ছে এই যে, আলাপকে রাগের আবাহন ব'লে মনে করাটা এখনো আমাদের কাছে প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কার ঠেকে না।

কিন্তু রাগের আবাহন মানে কি? না, মনের মন্দিরে রাগের প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্যেই রাগের ধ্যানমূর্তি পরিকল্পনার ব্যবস্থা ছিল। এ শুধু কাল্পনিক ছায়াবিলাসই ছিল না। রাজপুতানায়—যেখানে কলাবৎদের রাগসঙ্গীতের সবচেয়ে আদর ছিল সেখানে আজও নানা ছবি পাওয়া যায় রাগরাগিণীদের ধ্যানমূর্তি প্রভৃতির। তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রথাটি যে কোনো গতানুগতিকার দরুণই বিস্তৃতিলাভ করেছিল তা নয়: করেছিল—এককালে এর মূলে কোনো সত্য জীবন্ত বিশ্বাস রস জোগাত ব'লে—এ-ধারণার দেবালয়ে কোনো উচ্ছল প্রেম গন্ধারতি জ্বালত ব'লে।

তাই—সবাই জানেন—আলাপ বিশেষ ক'রেই অন্তর্মুখী। এ-যুগের অনেক দুর্ধর্ষ আলাপিয়াদের আলাপের কথা বলছি না অবশ্য—যাঁরা আলাপ বলতে বোঝেন—হয় শ্রুতি গ্রাম বাদী বিবাদীর প্রাণহীন কঙ্কালের নিখুঁৎ মরন্ত প্রদর্শনী, নয় আগুন-লাগা চকিবাজি : বলছি রসিক গুণীর শান্তরসাস্পদ গভীর সুরব্যঞ্জনার কথা। এ-শ্রেণীর আলাপ যাঁরা শুনেছেন—৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মুখে বা ৺আবদুল করিমের মুখে—তাঁরা জানেন যে আলাপে অন্তর্মুখিতা সত্যিই প্রত্যক্ষভাবে ধ্যানঘন হ'য়ে ওঠে, তার রঙে রেখায় অন্তরে রাগের একটা ধ্যানছবি প্রত্যক্ষভাবেই ফুটে ওঠে। এই জন্যেই আলাপকে আমাদের সঙ্গীতে সুর-আকুতির সব চেয়ে নিখুঁৎ বিকাশ বলা হ'ত—তাতে এমন কি তাল-দেওয়ারও পদ্ধতি ছিল না। অবান্তর কিছুই যেন সেখানে ধ্যানভঙ্গ রসভঙ্গ করতে না আসে—এই-ই ছিল আলাপের অন্তরের আরাধনা, ধ্যানের দীক্ষামন্ত্র।

বিভিন্ন রাগিণী গান করার যে এক একটা প্রহর নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছিল তার পিছনেও ছিল এই আইডিয়ারই উজ্জ্বল বিকাশ : বলা হ'ত প্রতি রাগের অধিষ্ঠাতা দেব বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাঁদের মর্জি-মাফিক আলাদা আলাদা সময়ে আবাহন করাই রাগ-সাধনার অনুকূল। প্রহরগুলিকে এভাবে ভাগ ক'রে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রহরে ভিন্ন ভিন্ন রাগপ্রতিমার এই যে পূজারীতি ধ্যানবিধি একে রাগরাগিণীর সমগ্র আবহ ও ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে গেলে অর্থহীন মনে হয় বৈ কি—কৃষ্ণধন বাবুর মতন আমাদেরও মনে হ'ত—যখন আমরা নিছক যুক্তির অণুবীক্ষণ দিয়ে এ-ধারণাকে দেখতে গিয়ে দেখতাম ছায়া। কিন্তু যদি কল্পনার শ্রদ্ধার দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখতাম তাহ'লে ধরা পড়ত এসব আইডিয়ার অন্তরালের জ্যোতির্লোকের চকিত উদ্ভাস। শুধু ঠাট বাদী সম্বাদী আরোহ অবরোহের বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদে রাগ-রাগিণীর রূপবন্ধটি, দেহতত্ত্বটিই ধরা পড়ে—আত্মার তত্ত্বটি পায় পঞ্চত্ব।

এই জন্যেই স্বভাব-অন্তর্মুখী রাগসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ বুঝতে হ'লে শুধু তার দেহতাত্ত্বিক বিচারের ধূমধাম কাজে আসবে না—বরং

উল্টোই বোঝাবে। আধ্যাত্মিক সন্ধানের ধারা বহির্মুখী নয়—তার ধারা ভিতর থেকে বাইরে আসা। চিরন্তন জ্ঞানবৃক্ষ "উর্ধ্বমূল অধঃশাখা"। তাই মার্গসঙ্গীতকে বুঝতে হ'লে ওর দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্যানতত্ত্বটিকে আগে বোঝার চেষ্টা করতে হবে অন্তরের ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে প্রেমের বোধ দিয়ে, কল্পনাহীন শুষ্ক যুক্তির ক্ষুরধার ডাক্তারি দৃষ্টি দিয়ে না।

তাছাড়া আরো একটা কথা মনে হয় এ সম্পর্কে। প্রাচীন সনাতন কোনো কিছুকে বুঝতে হ'লে আমাদের মনকে খানিকটা শেখাতেই হবে আধুনিক চষমা খুলে রেখে তাকে দেখতে: অর্থাৎ নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য না দিয়ে। তবেই তাকে কথঞ্চিৎ বোঝা যাবে নইলে নয়। একথা বিশেষ ক'রে বলার দরকার বোধ করছি এই জন্যে যে আধুনিক স্থূলদৃষ্টি মনের একটা মস্ত অযোগ্যতাই এই যে, সে কোনো কিছুকে বুঝবার জন্যে কল্পনার আশ্রয় নিতে একেবারেই চায় না, ভাবে কোনো কিছুকে সে যেভাবে দেখছে সেইটেই টেঁকসই যেহেতু তার ভিৎ হ'ল যুক্তি, পক্ষান্তরে অনাধুনিকরা যেভাবে দেখতেন তা ধোপে টিঁকতে পারেই না। এ-ধারণার গোড়ায় গলদ হ'ল এইখানে যে, যুক্তি আসে পরে—যুক্তি কিছু বোঝে না বোঝায় মাত্র। সে হ'ল জাতে উকীল, বড় চতুর উকীল, তবু উকীলই বটে: মানে, যে-কোনোকিছু তার সামনে ধরো সে তার স্বপক্ষে দুটো কথা বলতে পারবে বেশ গুছিয়েই। সক্রেটিসের বিখ্যাত তার্কিকিপনায় (dialecticsএ) নয়কে হয় করার দৃষ্টান্ত তো প্রায় ইতিহাস হ'য়ে গেছে। হাল আমলে সাইকো-আনালিসিসের প্রসাদে য়ুরোপীয় মনীষীরা এটা বুঝবার কিনারায় এসেছেন। ফ্রয়েডের একটি গভীর উক্তি আজ আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই মানেন যে, বাসনা বা প্রবণতা জন্মায় আগে, যুক্তি তাকে সমর্থন করে পরে—যার নাম রাশনালিজেশন। তাই কোনো কিছুকে ঠিকমতন বুঝতে হ'লে আগে চাই বাসনাকে স্তব্ধ করা, নিরস্ত করা। ওদের ভাষায় একে বলা হয় "dispassionate spirit of enquiry", আমাদের ভাষায়—নিস্পৃহ তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা যদি নিস্পৃহ

না হয় তবে যুক্তির আঁটুনি হাজার বজ্রোপম হোক না কেন সত্য তার মুষ্টি থেকে যাবেই ফস্কে। পরিণাম—নিরস্ত বচসা, জলন্ত বিতণ্ডা ও দুরন্ত দলাদলি।

কিন্তু মনের এমন একটা শান্ত ধ্যানমৌন অবস্থা সাধনালভ্য, অনুভবগম্য—যে অবস্থায় তার বিনিষ্কম্প বুকে সত্যের আলো পড়ে। আমাদের মার্গসঙ্গীতের দৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি বা শ্রুতিভঙ্গিকে বুঝতে হ'লে এই অবস্থার আবাহনই বাঞ্ছনীয়।

এই নম্র জিজ্ঞাসার মৌন ছায়ায় স্তব্ধ হ'য়ে কান পেতে শুনলে স্পষ্টই দেখা যায়—যদিও প্রমাণ করা যায় না—যে মার্গসঙ্গীতের "দৈবিকতা" সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গীতজ্ঞরা যে এত নিঃসংশয় তার কোথাও একট সত্য ছিলই ছিল। সে-সত্যকে শুধু যুক্তির ব্যবচ্ছেদে কেটেকুটে পাওয়া যাবে না—কিন্তু নীরব ধ্যানমৌনতার মধ্যে আভাষ পাওয়া যাবে তার গরিমার।

আমাদের রাগসঙ্গীতের প্রেরণা ও পরিকল্পনার বিস্তার হয়েছিল যে এইখানেই—এই ধ্যানলোকে, এই কথাটারই প্রতিভাস সবচেয়ে বেশি ক'রে পড়ে স্তব্ধ শান্ত জিজ্ঞাসু মনের গ্রহীষ্ণু পটে। রাগসঙ্গীতের উদ্ভবের মূলে ছিল এই সচেতন ঊর্ধ্ব-আবাহন। শুধু ঠাট মেল গ্রহ ন্যাস মূর্ছনা গ্রামের ব্যাখ্যায় মিলবে না এর মর্মের আকুতিটিকে। এ যে সচেতন ভাবে সাধনা হিসেবেই চেয়েছিল ঊর্ধ্বতমের স্বপ্নকে সুরের স্পন্দনে "জাগৃহি" বলতে, এই কথাটিই বুঝতে হবে তর্কের ঝড়ে নয়—শ্রদ্ধার শান্ত লগ্নে।

একথা কেন বলছি একটু খুলে বলা দরকার। বলেছি, রাগসঙ্গীত কেমন ক'রে এল তা কেউই বলতে পারেন না। কৃষ্ণধন বাবু বলেন বহু গানের সুরে সুরে শেষে রাগ দানা বেঁধেছে। একথায় মন ভরে না এই জন্যে যে, সব দেশেই তো বহু গান গেয়েছে মানুষ, কিন্তু অন্য কোথাও কই রাগসঙ্গীতের লীলাখেলা পরিলক্ষিত হয় নি তো? প্রতি দেশেই আলাদা আলাদা সুর পরস্পরবিচ্ছিন্নই রয়ে গেল। আমরা দেখেছি, পাশ্চাত্যে আবার এক অদ্ভুত বিচিত্র-মনোহর বিকাশ গ'ড়ে উঠল কণ্ঠসঙ্গীত থেকে: যার নাম শৈশবে ছিল কাউণ্টারপয়েণ্ট—বা part-

singing—যৌবন-পরিণতিতে হ'ল সে হার্মনি। কিন্তু বহু গান ছানিয়ে যদি রাগ রচিত হ'য়ে থাকে তবে এ বিপুলা পৃথ্বীতে অন্য কোথাওই রাগসঙ্গীত গ'ড়ে উঠল না কেন? কেউবা বলেন লোকসঙ্গীত থেকেই রাগসঙ্গীতের উৎক্ষেপ (রাসায়নিক precipitation)। কিন্তু সেখানেও ঐ প্রশ্নই আসে: কোন্ বিধানে এমন উৎক্ষেপ রাগের মূর্তিতে থিতিয়ে গেল, তার উৎসমূলে জমাট বাঁধল? সত্য তো আর খামখেয়ালি নয়—তার পিছনে আছেই কোনো-না-কোনো অলক্ষ্য *ইঙ্গিত, বিধান, নির্দেশ। লোকসঙ্গীত ছানিয়ে কোন্ কৌশলে এই রাগসঙ্গীতের রূপকল্পগুলি গড়ে উঠল?*

কেউ বলেন নানান্ রাগরচয়িতা মেল বা ঠাট থেকে রাগ রচনা করেছিলেন: অর্থাৎ পর্দার পর পর্দা সাজিয়ে তাসের ঘরের মতন রাগসৌধ রচনা করেছিলেন। একথাও সত্য মনে হয় না এই জন্যে যে গ'ড়ে-ওঠা রাগের রূপবন্ধে এ-ধরণের গাণিতিক বিধান দেখা গেলেও সে-বিন্যাসটা আসে পরে—আগে নয়। কাচের ওপর লৌহচূর্ণ রেখে চারধারে বিদ্যুৎপ্রবাহ বওয়ালে গুঁড়োগুলি সুসম্বদ্ধ রেখায় ঢেউ খেলে যায়—এদের বলা হয় "প্রবাহ-রেখা" (lines of force): এই রেখাগুলির মধ্যে শক্তির শৃঙ্খলা (law) আছে কিন্তু সেই শৃঙ্খলার কাঠামোয় সে-শক্তির দেখা মিলবে না। প্রতি শক্তিই সক্রিয় হয় কোনো বিধান বা নির্দেশের অনুবর্তী হয়ে—কিন্তু যেখানে আদৌ শক্তিই নেই সেখানে বাইরের বিধানকে বাহ্য ছাড়া আর কী বলব? রাগসঙ্গীতের মেল বা ঠাটগুলির মধ্যে গাণিতিক সুষমা থাকতে পারে—সাতটি পর্দার নানাবিধ বিন্যাসে নানাবিধ ঠাট গ'ড়ে উঠবে এখানেও অদ্ভুত বিচিত্র কিছুই নেই। কিন্তু সেই বিন্যাসই যে রাগরাগিণীর মর্মকথা একথা বলতে পারে এক অতি-প্রত্যক্ষবাদী বস্তুতান্ত্রিক—যারা বলে দেহ হ'ল শুধু অণুপরমাণুর পিণ্ড, মস্তিষ্ক হ'ল চিন্তার অদ্বিতীয় জনয়িতা। চেতনা দেহকে বিধৃত ক'রে আছে বলেই দেহ গ'ড়ে উঠেছে—বলেছেন আমাদের ঋষিরা দ্রষ্টারা, মন নিজের প্রকাশের জন্যেই মস্তিষ্ককে সৃজন করল। মস্তিষ্কে তার ক্রিয়ার বাহ্যচিহ্ন

—পাঞ্জা—মেলে একথা সত্য কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে সে ধরা দেয় না। এই-ই হ'ল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। একথা মানি যে বস্তুতান্ত্রিকরা "প্রমাণ করো" বললে একথা আমরা প্রমাণ করতে পারি না; কিন্তু তাঁদেরও তেম্‌নি মানতেই হবে যে, "একথা অপ্রমাণ করো" বললে তাঁরাও সমানই অথই জলে। তাই বলছিলাম এ ঠিক্ যুক্তির এলাকার কথাই নয়—গভীর অনুভবের কথা, একে পরিমেয় যুক্তি দিয়ে না যায় প্রমাণ করা, না অপ্রমাণ করা। এ যে অপ্রমেয়, অতীন্দ্রিয়।

রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছিল যে কোনো মস্ত প্রেরণা থেকে—তার নাম "দৈবিক"-ই দেওয়া হোক বা "রসতাত্ত্বিক"-ই (aesthetic) দেওয়া হোক যায় আসে না—কোনো ধরা-ছোঁয়া-যায় এমনধারা বুদ্ধিপ্রতিপাদ্য যুক্তিগ্রাহ্য ঠাটের কঙ্কালের ওপর সুরের মাংস ও মজ্জা আরোপ ক'রে যে তাদের কান্তি দীপ্তিময়ী হ'য়ে ওঠেনি একথা হ'ল আনন্দের ধ্রুবলোকেরই নির্দেশ, বাণী। আর আনন্দ চিররহস্যময়, চির-অনির্ণেয়: তাকে তার প্রকাশের রূপবন্ধের মধ্যে খুঁজলে মিলবে না —যদিচ এ-রূপবন্ধের বিধান সে মেনে নেয় স্বেচ্ছাবরণেই, যেহেতু এ-শৃঙ্খলের মধ্যেই সে নিজের সৃষ্টির ইন্দ্রজালে শৃঙ্খলার রাজ্য স্থাপনা করে। সে হ'ল জাত-স্রষ্টা, জন্ম-মায়াবী—তাই বিন্যাসের কায়া সে চায় কিন্তু তার মধ্যে সে ধরা দেয় না। সব বড় স্রষ্টা চেতনারই মূল বাণী রহস্যময়; ভগবানের মতনই সে বলে যে তার ঐশ্বরিক ইন্দ্রজাল এম্‌নিই যে, "মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু—তে ময়ি।" অর্থাৎ, আমার প্রসাদেই জীবদের জন্ম, তারা আমাতেই বিধৃত অথচ তাদের মধ্যে আমাকে মিলবে না। রাগরাগিণীর আকাশ-প্রেরণাও যেন এই কথাই বলেন: "রাগরাগিণীর ঠাট আমাতেই বিধৃত, অথচ রাগরাগিণীতে আমি পর্যবসিত নই।" বলেন; কেননা সব প্রেরণাদাতা স্রষ্টার পরম বাণীই এই—রূপবন্ধ প্রেরণার দেহ, কিন্তু সে দেহের মধ্যে আত্মাকে কখনই মিলবে না, মিলতে পারে না।

এইরকম আর একটি প্রেরণা পরে আসে আমাদের দেশে; কীর্তন সঙ্গীতে। কীর্তনের কথা যথাপর্যায়ে বলব, এখানে কীর্তনের প্রসঙ্গ

তুললাম এই জন্যে যে মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে কীর্তনের অভিব্যক্তি ধারার প্রভেদ থাকলেও ওদের উভয়েরই উদ্ভব হয়েছে এম্নি একটি বড় ঊর্ধ্বপ্রেরণা থেকে। রাগসঙ্গীতের একটি মস্ত কথা আবেশ ও কল্পনা, কীর্তনের—হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাস। এ-উচ্ছ্বাস, এ-আবেগ যেন বাঁধভাঙা, দুকূলছাপানো। বেশ বোঝা যায় যে কীর্তন রাগসঙ্গীতকে আত্মসাৎ করেছে কিন্তু নিজের বিধানে: মানে, রাগসঙ্গীতের কোনো বিধিবিধানই সে মানে নি। তাই তো রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলছেন তাঁর "সঙ্গীতের মুক্তি"-তে :

"বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই এই বৈচিত্র্য-চেষ্টা প্রথম দেখতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোমাণ্টিক মুভমেণ্ট বলে।

"এই স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সঙ্গীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিঁকল না। তখন সঙ্গীত এমন সকল সুর খুঁজতে লাগল যা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণবধর্ম্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পেয়েছিল ওস্তাদের কাছে কীর্তন গানে তেম্নিই অনাদর ঘটেছে।"

এইখানেই খুঁজতে হবে রাগসঙ্গীতের ব্যাখ্যা ওরফে ব্যাখ্যার নিরস্তীকরণ; একটা মস্ত আলোর বেগে ওর জন্ম, যে-বেগে চিত্ত হয় ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুখরিত ছন্দিত আত্মহারা। রাগসঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায় এই ঊর্ধ্ব-আবাহনের স্তব্ধতা, গাঢ়তা, উচ্ছল সক্রিয় সমাহিতি। ভোরের তোড়িতে, সাঁঝের পূরবীতে, অপরাহ্ণের মুলতানে উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে এই ধ্যানঘন আনন্দবন্দিত ছায়ালোকের আলোক-ঝঙ্কার। কোনো লোকসঙ্গীত, পর্দাবিন্যাস বা সুরপরীক্ষার ফলে হয় নি ওর উদ্ভব, কোনো প্রাদেশিক গান থেকেই মেলে না ওর গঠনস্থাপত্যের আভাষ। বিশ্বসঙ্গীতে ও লোকোত্তর, অদ্বিতীয়, মহিমময়, নিজের সুররাজ্যে ও ছত্রপতি, নিজের দাক্ষিণ্যদীপে ও রাজচক্রবর্তী। কোন্

মাহেন্দ্র মুহূর্তে বীণাপাণির গগনাশ্রিত চরণপদ্মের পরিমলবিন্দু এসে প'ড়েছিল গুণীর প্রার্থনামৌন হৃদয়সিন্ধুর নিস্তরঙ্গ বুকে; অমনি জেগে উঠল ছন্দগন্ধবহের স্পন্দনে রাগের পর রাগের শিহরণ-মালা—ক্রমপ্রবর্ধমান বৃত্তাকারে চলেছে সে চলোর্মিচঞ্চলা আজো তেম্‌নিই অশ্রান্তনটিনী অসাঙ্গরঙ্গিনী, বিচিত্রমঞ্জীরা……কোন্ অলক্ষ্য তটের অভিসারে—কে বলবে?

৪

রাগের 'নেতি'-পর্ব

কিন্তু তা ব'লে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে মার্গসঙ্গীতের রূপবন্ধ বা গঠনকারু সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আমরা বিরোধী। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা খুবই বাঞ্ছনীয়—বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যে যে ঋজু সততা আছে মানবচেতনার প্রগতিতে সে-ও আদরণীয় বৈ কি। তাছাড়া কোনো জ্ঞানই নিষ্ফল নয়, বন্ধ্যা নয়। রাগরাগিণীর বাইরের ঠাট, রূপবন্ধ, রূপকল্প, শ্রেণীবিভাগ, ধারাপার্থক্য এ সবেরই বৈজ্ঞানিক বিচার হোক না—তাতে ক্ষতি তো নেই-ই বরং লাভ। এথেকেও শেখবার অনেক কিছু আছে তো বটেই। আমাদের বক্তব্য ছিল শুধু এই যে, বাহ্য আঙ্গিকের বিচারে মত্ত হ'য়ে আন্তর সত্যকে অবহেলা করলে সে বিচার হ'য়ে দাঁড়ায় শুধুই কচায়ন—বৈয়াকরণিকতা। কারণ, বলেছি, সব বড় শিল্পর পরম বাণী হচ্ছে ভাগবত বাণীর সগোত্র:

পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।…
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

"দেখ আমার যোগবিভূতির ইন্দ্রজাল: জৈবলীলা আমাতেই বিধৃত অথচ সে-লীলায় আমি লিপ্ত নই।" বীণাপাণির বাক্-বীণায় এ-বাণীকে সুরেলা ক'রে এভাবে বলা চলে:

অতি বিচিত্র মোর সঙ্গীত-আলো-সৃজন-ইন্দ্রজাল :
আমি স্বর-ঈশ্বরী—রাগলোকে রচি ছায়ার অন্তরাল :
নিতি সেথায় লুকায়ে থাকি'
প্রতি ঝঙ্কারে আমি জাগি :
তবু দেই না তো ধরা—যেথা বাজে রূপনূপুরছন্দতাল।

বীণা দারুময়ী—কেবল, দারু তত্ত্বে বীণার রহস্য ধরা পড়ে না। বাঁশি স্বরময়ী হ'য়ে ওঠে ফুঁ-এর আনন্দে, কিন্তু বেণুর বংশতত্ত্ব হাজার ব্যবচ্ছেদ করলেও সে টানাটানিতে মিলবে না ফুঁ-এর পরম বাণী।

তাই রাগের দেহতথ্যের প্রতি অণুপরমাণুর খবর নিলেও সেখানে মিলবে না তার আত্মিক তত্ত্ব।

কিন্তু আত্মিক তত্ত্ব না মিললেও দৈহিক তথ্য চয়ন করতে বাধা নেই। তাছাড়া যেহেতু পূর্ণজ্ঞানের কাছে অবজ্ঞেয় কিছুই নেই, সেহেতু রাগরাগিণীর কঙ্কালতথ্য-সংগ্রহও বাঞ্ছনীয় তো বটেই।

এই জন্যে রাগরাগিণীর দৈহিক তথ্য নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার সময় এসেছে। এবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ আলোচনা করতে প্রয়াস পাব না—সেটা এ স্বল্পকায় বইয়ের সাধ্যাতীত ব'লেও বটে—আমাদের উদ্দেশ্যের সীমানার বাইরে ব'লেও বটে। তাছাড়া বলেছি, রাগরাগিণীর দেহতথ্য নিয়ে এ-যুগে চমৎকার আলোচনা করেছেন : প্রথম কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডে। তাঁদের যে কোথাও ভুল হয় নি এ হ'তেই পারে না—তাঁরা নিজেরাও বলেন নি যে তাঁরা অভ্রান্ত—তবে মোটের উপর এই দুই মনস্বীর আলোচনাদি পড়লে মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে মূল জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির তৃষ্ণা একরকম মেটে। এ-যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাগসঙ্গীতের অস্থিমজ্জাতত্ত্ববিচারে এঁরা দুজন যে অগ্রণী এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। তাই আমরা এখানে রাগসঙ্গীতের রূপবন্ধ সম্পর্কে মূলত এঁদের পদ্ধতি মেনেই একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব—খুঁটিনাটি ব্যাখ্যার জন্যে মূল গ্রন্থ দুটির শরণাপন্ন হওয়াই পন্থা।

রাগরাগিণীর প্রেরণার কথা যা বলেছি তার সার মর্ম হ'ল এই যে, রাগরাগিণীর স্বরসিন্ধু বহু শতাব্দীর চর্চায় তবে জীবন্ত রসোচ্ছল হ'য়ে উঠলেও তার প্রেরণা এসেছিল উর্ধ্বলোকের সেই স্বপ্নবিন্দু থেকে যে অতীন্দ্রিয় অনির্বচনীয়, যাকে "বাখানি যায় না বলা", যে শুধু অনুভবগম্য।

একথা বলাই বেশি যে, সব মহৎ কলাকারুর উৎসের মতন রাগরাগিণীর প্রেরণার উৎসও আমাদের যৌক্তিক বুদ্ধির দৃষ্টিচক্রের বাইরে। কিন্তু তার বাহ্য পদ্ধতির নানা আকার ইঙ্গিত খাত প্রণালী আমাদের বুদ্ধিগম্য। একেই বলা হয় রূপবন্ধ ওরফে টেকনিক। কিন্তু এই-রূপবন্ধ বিচারেও আমরা রাগ-প্রগতিকে বুঝতে চেষ্টা করব খানিকটা সমগ্র দৃষ্টির আলোয়—টুকরো টুকরো সংজ্ঞা দিয়ে না। অর্থাৎ কাকে বলে গ্রহ, কাকে ন্যাস, কাকে বাদী, কাকে সংবাদী, কাকে বলে মূর্ছনা, গ্রাম, বাঁট দুন চৌদুন এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বাদ দেব—যেহেতু এসব বর্ণনা ইতিপূর্বে বিশদভাবেই ক'রে গেছেন অনেকেই।

রাগ বলতে কী বোঝায়?—স্বতই এ প্রশ্ন আসে সব আগে।

প্রশ্নটি যেমন সোজা, উত্তর কিন্তু তেম্‌নি শক্ত। প্রাচীন সংগীতকারগণ বলতেন: "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"—অর্থাৎ রাগ হ'ল চিত্তরঞ্জক স্বরবিন্যাস। কিন্তু এ তো ছেলেভুলোনো কথা।

> যস্য শ্রবণমাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ
> সর্বেষাং রঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতিস্মৃতঃ।

অর্থাৎ, আপামর সাধারণ সবাইকেই যে-স্বরবিন্যাস খুসি করবে তারই নাম রাগ। এ-ও ব্যর্থ সংজ্ঞা। কেন না মুলতান, পুরিয়া, বসন্ত প্রমুখ বহু কঠিন রাগই শোন্‌বামাত্র মধুর লাগে না। সব কলাকারুরই গভীর আবেদন কমবেশি সাধনালভ্য। আর্টের মধ্যে চিরন্তন চিত্তরঞ্জক উপাদান আছে বৈ কি—নৈলে সে তো আর্টই হ'ত না—কিন্তু এসব উপাদানের রঞ্জনীশক্তিতে গভীর আনন্দ পাওয়া সম্ভব হয় সশ্রদ্ধ, নিষ্ঠানিবিড় চর্চায়। অর্থাৎ বড় আর্ট এমন বস্তু নয় যে তার যথাযথ চর্চা না করলেও সে সর্বসাধারণের কাছে এখনি-এখনি উপাদেয় ব'লে গণ্য হবে—এবং না হ'লেই সে নামঞ্জুর।

কিন্তু এ-ও এসে যাচ্ছে রসতত্ত্বের কথা যার মূল আধ্যাত্মিক—কিনা আত্মিক। কাজেই এ নিয়েও বেশি আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না যেহেতু এ-ও অনুভবগম্য। তবু এ-প্রসঙ্গ তুললাম শুধু দেখাতে যে শ্রুতিমাধুর্যের কোনো সর্বস্বীকৃত পরিমাপক নেই ব'লেই সব আর্টেরই এস্থেটিক তথা আত্মিক আবেদন তর্কবিচার-লভ্য নয়—সাধনা-লভ্য, সুরুচির অনুশীলন-সাপেক্ষ। এই সুরুচি বলতে কি বোঝায়?—সেই হদিশ দেওয়াই সবচেয়ে কঠিন। রবীন্দ্রনাথ এ-সমস্যার ছবি এত সুন্দর ক'রে ফুটিয়েছেন তাঁর অনুপম উজ্জ্বল ভাষায় যে একটু দীর্ঘ হ'লেও উদ্ধৃত না ক'রে থাকতে পারলাম না :

"ভালো লাগা এবং না-লাগা নিয়ে বিরোধ অন্য সকল রকম বিরোধের চেয়ে দুঃসহ। অর্থনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে তুমি যেরকম ক'রে যা বোঝো আমি যদি সেরকম ক'রে তা না বুঝি তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব নিশ্চয় বাধতে পারে, কিন্তু সেইটে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে। তখন পরস্পর পরস্পরকে মূর্খ ব'লে নির্বোধ ব'লে গাল দিতে পারি। সেটা শ্রুতিমধুর নয় বটে কিন্তু মূর্খতা নির্বুদ্ধিতার একটা বাহ্য পরিমাপক পাওয়া যায়, যুক্তিশাস্ত্রের বাটখারা যোগে তার ওজনের প্রমাণ দেওয়া চলে। কিন্তু যখন পরস্পরকে বলা যায় অরসিক তখন তর্কে কুলোয় না, পৌঁছয় লাঠালাঠিতে। যেহেতু রস জিনিষটা অপ্রমেয়। বুদ্ধিগত বোঝা-বুঝির তফাৎ নিয়ে ঘর করা চলে সংসারে তার প্রমাণ আছে, কিন্তু আমাব ভালো লাগে অথচ তোমার লাগে না এইটে নিয়েই ঘর ভাঙবার কথা।" (সুর ও সঙ্গতি—৬৩ পৃঃ)

সুতরাং কোনো রাগ যদি একজন রসিকের চিত্তরঞ্জন করে আর একজনকে করে তিতিবিরক্ত, তবে উভয়ের রুচির অঙ্গীকার রইল নিঃসহায় : ওদের অস্বীকরণ ও সমীকরণ দুই-ই সমান অসম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাকে বছর দুই আগে একটি পত্রে লিখেছিলেন :

"রসবস্তু নিয়ে যাদের কারবার······অন্য পক্ষকে তারা বেরসিক

ব'লে গাল দিতে পারে, কিন্তু সে-গালেরও জোর নেই কেন না অরসিকতার নিশ্চিত যুক্তি পাওয়া যায় না।"

রাগের সংজ্ঞানির্ণয়ে রুচির এই চিরদুর্ভেদ্য তর্কজাল ওঠালাম শুধু দেখাতে—কেন এদিক দিয়ে রাগবিচার করাটা নিষ্ফল।

অগত্যা এবার অন্যদিক থেকে রাগকে বুঝতে চেষ্টা ক'রে দেখা যাক একটু।

রাগ কী বস্তু? কোনো চিত্তরঞ্জক স্বর বললে ধাঁধা লাগে দুটি কারণে: এক, প্রশ্ন ওঠে কার চিত্তরঞ্জন প্রামাণিক ব'লে গণ্য হবে? দুই, যদি ধরাই যায় যে কোনো স্বর বহুর চিত্তবিনোদন করছে তাহ'লেও তাকে রাগ বলা চলবে না—কেন না তাহ'লে বাউল, ভাটিয়ালি, লা মার্সেইয়েজ্, গড সেভ দি কিং, সবই রাগ হ'য়ে দাঁড়ায়।

তারপরে শাস্ত্রবিৎরা বলছেন বিশেষ বিশেষ ঠাটে আরোহ-অবরোহ-যোগে বিশেষ বিশেষ স্বরকে বাদী সংবাদী ক'রে গাইলে বিশেষ বিশেষ রাগ গ'ড়ে ওঠে।

কিন্তু এ-সংজ্ঞার বিপক্ষেও বলা যায় এই কথা যে প্রথমত নানা রাগের ঠাট আরোহ অবরোহের রীতিও স্বরবিস্তারে তানালাপে লঙ্ঘিত হয়, বাদী সংবাদীরও কোনো সর্বজনস্বীকৃত প্রয়োগ-বিধি নেই।* সুতরাং এরকম কোনো কাটাছাঁটা পদ্ধতিতেও রাগের পরিচয় মিলবে না।

তাহ'লে? রাগ কী জিনিষ? ঐ তো মুস্কিল। রাগের একটা রূপ আছেই—কিন্তু হয়েছে কি, ঠাট বা পর্দাদের বিন্যাস তার মস্ত কথা হ'লেও চরম কথা নয়: কোন্‌খানে কী ভাবে স্বর আন্দোলিত হয়—কী ঢঙে গাওয়া হয়—আরোহ অবরোহের কোনো দুর্লঙ্ঘ্য নীতি না থাকলেও একটা স্থূল ধারার বিচার—বাদী সংবাদীর কোনো নিশ্চিত বনিয়াদ না থাকলেও নানা স্বরের নানা স্থানে স্থিতি—এসবই বুঝতে

*: এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে আমাদের "গীতশ্রী" বইটির ভূমিকায় তথা কৃষ্ণধনবাবুর গীতসূত্রসারে ৯ম পরিচ্ছেদে।

হবে, চিনতে হবে, রাগের ছকটি বহুশ্রবণের পর চিত্তপটে এঁকে নিতে হবে, তার রসরূপটির স্বাদ পেতে জানতে হবে—শিখতে হবে তার হাওয়ায় ঢেউয়ে গা-ভাসিয়ে উধাও হ'তে—এককথায় রাগসঙ্গীতের রাজ্যের বাসিন্দা হ'য়ে ওর প্রাণের কথাটি কানের মধ্যে দিয়ে মরমে অঙ্গীকার করতে হবে। রাগরাগিণীর অন্য কোনো কাটাছাঁটা ব্যাখ্যাই নেই—কেন না সংক্ষেপে যেভাবেই ওদের বর্ণনা করা যাক না কেন, বিধিবিধান দেওয়া যাক না কেন—নিপুণ গুণী (সব ক্ষেত্রে না হ'লেও অনেক ক্ষেত্রেই) গেয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, সেসব বিধিকে লঙ্ঘন ক'রেও তাদের রূপ দেখানো সম্ভব। আবদুল করিম আমাকে একদিন দেখিয়েছিলেন মালকোষের মতন বাদী-মধ্যম রাগে মধ্যম কম ব্যবহার ক'রেও মালকোষের রূপ ফোটানো সম্ভব—প্রয়োগ-নৈপুণ্য থাকলে।

কিন্তু এ-আলোচনা প্রায় বৈয়াকরণিক তুমুল আন্দোলন-জাতীয় হ'য়ে পড়ছে। তাই এখানেও রাশ টানতেই হ'ল। তবে একথাগুলি বললাম দেখাতে কি জন্যে রাগের কোনো ধরাবাঁধা কাটাছাঁটা বাহ্য অভিজ্ঞান দেওয়া কঠিন—প্রতি রাগের একটি মোটামুটি রূপ থাকা সত্ত্বেও। অবশ্য মনে রাখতে হবে এখানে একটু সূক্ষ্মবিচারের তর্কই উঠছে—খুব স্থূল বিচারে—আরোহ অবরোহ বিশিষ্ট স্বরবিন্যাস (পকড়) প্রভৃতির অভিজ্ঞান দিয়ে প্রধান প্রধান রাগগুলির একরকম চলনসৈ সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কিন্তু রাগসঙ্গীতের ক্রমবিকাশে শুধু এই স্থূলজ্ঞানটুকু সম্বল ক'রে চললে তার স্নিগ্ধ রসের, সূক্ষ্ম স্বরভির, পেলব সুষমার নির্যাসটুকুই পড়ে বাদ। তাই রাগনির্ণয়ে এ-সমস্যার কথা তুললাম—কোনো বৈয়াকরণিক কচকচি তুলে দুরূহ রাগসঙ্গীতকে আরো দুর্বোধ্য ক'রে তোলবার মহদুদ্দেশ্যে নয়। রাগ-বিচারে তার দেহতত্ত্বকে স্বীকার ক'রেও কেন ফিরে ফিরে রসতত্ত্বের দুয়ারেই ধর্না দিতে আসতে হয় তার আভাষ দিতেই এত বাগ্বাহুল্য। কিন্তু এবার একটু গোড়ার কথায় ফিরি, সহজ কথায়—রাগ কাকে বলে তা সূক্ষ্মবিচারে জানা দুরূহ হওয়া সত্ত্বেও তার স্থূল রূপটিকে জানার চেষ্টা করি।

রাগের 'ইতি'-পর্ব

কিন্তু এবার শক্ত হ'য়ে বসতে হবে পরীক্ষাভারসহ মাটির 'পরে: রাগরাগিণীর কাঠামোকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক ডাক্তারি ব্যবচ্ছেদী ঢঙে। কেন না মনে রাখতে হবে: এবারকার পালাগান হ'ল রাগরাগিণীর কঙ্কালতত্ত্ব। তার গঠনতথ্য রূপবন্ধ নিয়ে গবেষণাই এখন উৎসুক নয়নমনের অভীপ্সিত—সেখানে আর যা-ই আসুক না কেন কাব্যকুয়াশা যেন না হানা দেয়। যেখানকার যা।

তথাস্তু। দেখা যাক্ তন্ন তন্ন ক'রে রাগরাগিণীর দেহনির্মাণ-চাতুরী। তবে একটা কথা।

প্রথমেই বলেছি কী ক'রে কোন্ পথে রাগসঙ্গীত বিকশিত হ'য়ে উঠল তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসই নেই। তবে মোটামুটি রাগসঙ্গীতের বয়স খুব কম নয়। ভরতনাট্যশাস্ত্রে রাগের পূর্বপুরুষ "জাতি"-র বর্ণনা আছে। পরবর্তী নানান্ সংস্কৃতগ্রন্থেও রাগরাগিণীর সম্বন্ধে ব্যাখ্যাদি অপর্যাপ্ত-পরিমাণেই আছে। কিন্তু কী হবে এসব সার্গম বর্ণনায় ঠাট ধ'রে দিয়ে—যখন স্বরলিপি বলতে যা বোঝায় তা নেই? কী ক'রে জানব যে—ধরা যাক্—রে গা ধা নি কোমল ভৈরবীর চলাফেরা আগে কি রকম ছিল? যাঁরা বলেন শুধু ঠাট ব'লে দিলেই বা আরোহ অবরোহ বাৎলে দিলেই ভৈরবী কণ্ঠস্থ হ'য়ে যায় তাঁদের সে-গোঁড়ামিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো—কেন না তাঁরা গায়ের জোরে বলতে চান যে পুরাশাস্ত্রপাঠে গায়ক বাদক হওয়ার পথ সুগম হয়। হ'তেই পারে না, কেন না পুরাশাস্ত্রবর্ণিত রাগরাগিণীর রসরূপ হালচাল সবই কালাতিপাতে গেছে বদ্‌লে।

একথা বলছি কোনো বন্ধ্যা বচসা করতে না—শুধু পেশ করতে যে রাগ বলতে আমরা এখনকার রাগ—অর্থাৎ যেসব রাগের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে তাদেরই বুঝি। অবশ্য যদি

সাবেককালের রাগরাগিণীর যথাযথ স্বরলিপি মজুদ থাকত তবে তাদের চর্চায় লাভ হ'ত কিছু। কিন্তু এখনকার রাগগুলি সেকালে কী ভাবে গাওয়া হ'ত তা জানা যখন অসম্ভব তখন নিষ্ফল পণ্ডিতি হাহাকার ছেড়ে রাগের আজকালকার রূপপ্রকাশ নিয়ে তদন্ত সুরু করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এখন সব জড়িয়ে বড়জোর দেড়শো রাগ বেঁচে আছে কোনোমৎ-প্রকারে, কিন্তু খুব কম ওস্তাদই একশোটি রাগ জানার মতন ক'রে জানেন। গেয়ে রসসঞ্চার করতে পারা যায় বড় জোর পঞ্চাশ ষাটটি রাগ। এখন কেউ যদি মোটমাট পঞ্চাশটি রাগ ভালো ক'রে গাইতে পারেন তাঁকে খুব বড় ওস্তাদ নাম দেওয়া যেতে পারে—পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলতেন প্রায়ই। এ-রাগগুলির নাম দিয়েছি গীতশ্রীতে।

এখন, এই গুটিপঞ্চাশেক রাগকে তন্নতন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলে দেখা যায় যে, প্রতি রাগের অভিজ্ঞান একটিমাত্র নয়, অনেকগুলি চিহ্ন নিয়ে তবে তাকে চেনা যায় বাইরের দিক থেকে। মোটামুটি এ-চিহ্ন চতুর্বিধ :

(১) ঠাট বা মেল যাকে বলি mode : একে গ্রামও বলেন কেউ কেউ কিন্তু সংস্কৃতগ্রন্থে ষড়জগ্রাম, গান্ধারগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম এ-ধরণের নাম আছে ব'লে গ্রাম শব্দটি ঠাট অর্থে ব্যবহার না করাই ভালো। শেক্ষপীয়রের মতে গোলাপকে যে-নামেই ডাকা হোক তাকে মধুর মনে হবেই একথা মেনে নিয়েও, ব্যাকরণ-বিজ্ঞানে নামের তথা সংজ্ঞার স্থিরীকরণ ও কায়েমীকরণ খুবই দরকার।

অধুনাতন য়ুরোপীয় mode বলতে যা বোঝায় ঠাট বলতে ঠিক তা বোঝায় না কিন্তু। কারণ আজকালকার য়ুরোপীয় mode হচ্ছে মাত্র দ্বিবিধ :— minor mode—কোমলগান্ধারী—ও major mode —শুদ্ধগান্ধারী। তবে প্রাচীন গ্রীক mode-এর সঙ্গে আমাদের ঠাটের কিছু সাদৃশ্য আছে। সেকথা যথাস্থানে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দশটি মূল ঠাটের ছকে শতাধিক রাগিণীর শ্রেণীবিভাগ করেছেন (গীতশ্রী ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আরো নানারকম ঠাট হ'তে পারে সন্দেহ নেই। কোনো রাগের ঠাটের উদারতম সংজ্ঞা হওয়া উচিত—সে রাগে যে যে পর্দা লাগে সবগুলি পর পর সাজানো এক সপ্তকে। মানে, আধুনিক রাগ বুঝতে হ'লে এইভাবে ঠাট সাজানোই সবচেয়ে সহজ ও সরল। তাই দশটি ঠাটে আপ্রাণ চেষ্টায় শতাধিক রাগিণীকে ভাগ করার কোনো প্রয়োজনও নেই বিশেষ সার্থকতাও নেই। শুধু তাই না, এতে ক'রে রাগের রূপ-চেনা দুরূহতর ক'রে দাঁড় করানো হয়—তার ঘাড়ে অকারণ এ শ্রেণী-চেনার দায় চাপানো হয় ব'লে। তবু শ্রেণীবিভাগ যদি করতেই হয় তাহ'লে দক্ষিণী ভেঙ্কটমখী গাণিতিক বিচারে যে ৭২টি ঠাট ধার্য করেছেন—সেই পদ্ধতিকেই মানা বাঞ্ছনীয়—কেন না সেই পদ্ধতিই যে বেশি বৈজ্ঞানিক এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

কিন্তু আমাদের এত শত তর্ক-বিতণ্ডা ফেনিয়ে তোলার দরকার নেই, কেন না আমরা আপাতত প্রচলিত রাগগুলির প্রচলিত ঠাটগুলিকে রাগদের অন্যতম অভিজ্ঞান হিসেবেই ধরছি মাত্র। এভাবে ঠাটকে দেখা যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়ই যেহেতু রাগ থাকলে তার একটা ঠাট থাকবেই যেমন জোর ক'রে কবন্ধ ক'রে না দিলে দেহ থাকলেই তার থাকবে একটা মাথা।

এই ঠাট তিন রকম: সম্পূর্ণ—অর্থাৎ সাতটা পর্দাই লাগে এমন ঠাট; ষাড়ব—অর্থাৎ ছয়টা পর্দা লাগে এমন ঠাট; ঔড়ব—অর্থাৎ পাঁচটা পর্দা লাগে এমন ঠাট।

গীতশ্রীর ভূমিকায় ৪৮টি প্রধান রাগের নাম দিয়েছি যেগুলি শিখলে রাগসঙ্গীতের বনিয়াদ পাকা হয়। নিচে দিচ্ছি পণ্ডিত ভাতখণ্ডের দশটি মূল ঠাট—উদাহরণ স্বরূপ। কিন্তু আবার ব'লে রাখি যে রাগদের এভাবে ভাগ ক'রে তিনি রাগকে দুরূহতর করেছেন ব'লে মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। যাক্, পণ্ডিতজির দশটি ঠাট ও তাদের মধ্যে গ্রীক মোডগুলিরও নাম দেই এবার:

ইমন ওরফে Lydian Mode—স র গ হ্ম প ধ ন।
ভৈরব—স ঋ গ ম প দ ন।
কাফি ওরফে Dorian Mode—স র জ্ঞ ম প ধ ণ।
ভৈরবী ওরফে Phrygian Mode—স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ।
বিলাবল ওরফে Ionian Mode—স র গ ম প ধ ন।
পরজ—স ঋ গ হ্ম প দ ন।
আশাবরী ওরফে Aeolian Mode—স র জ্ঞ ম প দ ণ।
তোড়ি—স ঋ জ্ঞ হ্ম প দ ন।
খাম্বাজ ওরফে Mixolydian Mode—স র গ ম প ধ ণ।
মারবা—স ঋ গ হ্ম প ধ ন।

(২) রাগের দ্বিতীয় চরিত্রচিহ্ন হ'ল—আরোহ অবরোহ। এখানে মুস্কিল হচ্ছে এই (যেকথা আগেও বলেছি) যে আলাপে বা তানে আরোহ অবরোহের নির্দিষ্ট রীতি ক্ষণে ক্ষণেই লঙ্ঘিত হ'তে থাকে। তা হোক্, তবু চীজে বা গানে একটা আরোহ অবরোহ পদ্ধতি প্রায়ই মানা হ'য়ে থাকে। উদাহরণ

দেশ— আরোহ: স র ম প ন র্স, অবরোহ: র্স ণ ধ প ম গ র গ স
(গীতশ্রীতে যোলোটি রাগের আরোহ অবরোহ দ্রষ্টব্য)

(৩) কয়েকটি পর্দাকে সময়ে সময়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এদের বলা হয়—বাদী (রাজা স্বর বা সর্বপ্রধান স্বর) ও সম্বাদী (মন্ত্রী স্বর বা রাজার পরেই যে স্বর প্রধান); এবং কোনো স্বর যা বাদ দেওয়া হয় তার নাম বিবাদী। উদাহরণ: ইমনে—গান্ধার বাদী নিখাদ সম্বাদী, ছায়ানটে—পঞ্চম বাদী রেখাব সম্বাদী ইত্যাদি। ঔড়ব মালকোষে রেখাব পঞ্চম বিবাদী, ষাড়ব সোহিনীতে পঞ্চম বিবাদী ইত্যাদি। পূর্বেই বলেছি বাদী সম্বাদীর চলতি বিধান অনেক রাগেই লঙ্ঘিত হয়—তাছাড়া অনেক রাগে ঠিক করাই ভার কোনো স্বর আদৌ বেশি ব্যবহার হচ্ছে কি না। তাই অনেকে বাদী সম্বাদী তর্ককে বরখাস্ত ক'রে দিয়ে রাগরাগিণীর প্রধান পর্দাগুলিকে অংশ

(হিন্দুস্থানিতে মুকাম) স্বর বলার পক্ষপাতী। অনেকে মনে করেন— এ ভাবে রাগ চেনায় এখনো কিছু সুবিধে হয়, তাই এ-বাদীসম্বাদী-অভিজ্ঞানের উল্লেখ করলাম। সব জড়িয়ে মনে হয় রাগরাগিণী আজকাল যেভাবে গাওয়া হ'য়ে থাকে তাতে এ তৃতীয় অভিজ্ঞানটিকে যথার্থ অভিজ্ঞান ব'লে গণ্য না করাই ভালো। এক এক রাগে নানান্ গান শিখতে শিখতে তার যে সমগ্র ছবিটা ফুটে ওঠে সেইটেই হ'ল সবচেয়ে ভালো ছবি ও সেই ভাবেই সবাই রাগ শিখে এসেছে আবহমানকাল। পর্দা ঠাহর ক'রে রাগ চেনার পদ্ধতি নানা কারণেই সন্তোষজনক নয়—তাতে অসুবিধাও একাধিক। তবে এ-আলোচনাও আর বেশি ফেনিয়ে তুলে লাভ নেই—বিশেষ যখন এ-তর্কে স্বতই মনে প্রশ্ন ওঠে who shall decide when doctors disagree? এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ ক্রমশই বাড়ছে—কেন না রাগের নির্দিষ্ট রূপ বজায় রাখার প্রবণতা ক্রমশই কমছে। কাজেই অংশ বা বাদী সম্বাদী তর্ক ক্রমে শুধু বাক্যবাগীশ পণ্ডিতিয়ানার কোঠায়ই পড়ছে বৈ কি। হেতু স্পষ্ট: জীবন্ত সঙ্গীতের ধারার সঙ্গে এদের মামুলি বিধানের গরমিল ক্রমশই বাড়ছে—লোকে হাঁপিয়েও উঠছে বোধ হয়।

(৪) পকড়—প্রতি রাগের মধ্যে এক-আধটি প্রধান phrase বা পর্দাবিন্যাসকে সে-রাগের অভিজ্ঞান হিসেবে ধরা। রাগ চেনার পক্ষে পকড়ের ব্যবহারিক সুবিধা সত্যিই আছে—যদিও স্বভাবতই কোন্ রাগের পকড় কী হবে সে নিয়েও কিছু কিছু মতভেদ আছে ও থাকবেই। তবু মোটের উপর একথা ঠিক যে এক একটি রাগের মধ্যে এক একটা পর্দাবিন্যাস ঘুরে ফিরে আসে প্রায়ই। যেমন

ছায়ানটের পকড় ধরা যাক—প র গ ম প গ ম র স;
বাগেশ্রীর পকড়—স ণ্ ধ ণ্ স ম ধ ণ ধ ম জ্ঞ র স;
আশাবরীর পকড়—স র ম প ণ দ প ইত্যাদি।

কিন্তু এ-কয়টি রাগচিহ্নের সুবিধা কিছু থাকলেও মনে রাখা দরকার যে শুধু এদের ইশারায় কোনো রাগকে চিনতে পারা সব সময়ে সম্ভব

হয় না। আর যদি বা চেনাও যায় তাহ'লেও সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়। বড় কথা হ'ল—এক একটি রাগের পূর্ণ মূর্তি মনের পটে ছ'কে নেওয়া, এঁকে নেওয়া। রাগ-নির্ণয়ে অন্য কোনো পথ নেই—এই বহু শ্রবণ ও অভিনিবেশ ছাড়া। তাছাড়া প্রতি রাগের রকমারি সূক্ষ্ম হেলাদোলা, আন্দোলন, মিড়ের ভঙ্গি, নানা সময়ে নানা স্বরে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে স্থিতি, নানা ঢঙে নানা স্বর টপকে যাওয়া—এসব নানা কৌশলে তবেই এক একটা রাগ অবয়বী হ'য়ে ওঠে। কাজেই রাগসঙ্গীতের প্রাণের কথাটি জানতে হ'লে এসবই জানা চাই—অর্থাৎ যদি বিশেষজ্ঞ হ'তে হয়। যাঁরা শুধু রাগসঙ্গীতের রসের কারবারী হ'তে চান তাঁদের এতশত সূক্ষ্মজ্ঞান দরকার নেই—তবে রাগসঙ্গীত খুব বেশি শোনা নিশ্চয়ই দরকার, নৈলে রাগের গভীর রসবাণীর মর্মজ্ঞ হওয়া অসম্ভব।

এছাড়া অবশ্য পণ্ডিতিয়ানা ও ওস্তাদিয়ানার পথ তো খোলা রয়েইছে: নানা মতে নানা রাগকে পুরুষ রাগ বলা ও প্রতি রাগের ছয়টি ক'রে স্ত্রীরাগিণীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া, বাইশটি শ্রুতি নিয়ে অশ্রান্ত তর্ক, গ্রহ স্বর ন্যাস স্বর নিয়ে মাথা বকানো, আরো কত যে খুঁটিনাটি তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল সমস্যা নিয়ে থীসিস লেখার পথ আছে তার দিশা পাওয়া ভার। যাঁরা এসব চান তাঁরা স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রীয় বাগাড়ম্বরের অথই জলে ঝাঁপ দিয়ে পরমানন্দে হাবুডুবু খেতে পারেন। তবে আশা ও আনন্দের কথা এই যে, এখন ক্রমশ সব সুস্থমস্তিষ্ক রসজ্ঞই বুঝছেন যে আমাদের সঙ্গীতচর্চায় এতশত কচায়ন রেখে এখন দরকার হ'য়ে পড়েছে রাগরাগিণীর রসরূপজিজ্ঞাসা, এবং এজন্যে যতটা টেকনিক জানা দরকার ততটা জ্ঞান কোনো একটা সুসম্বদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে যতটা পারা যায় সরলভাবে আহরণ ক'রে নেওয়াই ভালো। নানা পদ্ধতিই আছে, তবে সব জড়িয়ে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পদ্ধতিই এ-শিক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ—তাই রাগরাগিণীর জাতি ও শ্রেণী বিভাগে তাঁর অসামান্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত পদ্ধতিকে অবলম্বন করাই সবচেয়ে নিরাপদ ও অল্পসময়ে-বেশি-ফলপ্রসূ—কেবল

তাঁর ঐ দশটি ঠাটের খোপে রাগরাগিণীকে জোর ক'রে পূরে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া। তবে এ-বিভাগ তাঁর পদ্ধতিতেও মূলত অবান্তর।

রাগরাগিণীর বিচারে এর পর কেবল আমি চারটি মূল বিভাগের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী দেব। তাহ'লেই মার্গসঙ্গীতের আলোচনা-পর্ব শেষ হবে। কারণ মার্গসঙ্গীতের তালসম্বন্ধে যা বলবার গীতশ্রীর তালাধ্যায়েই ঢুকে গেছে—সে সবের পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই—সে-আলোচনা একটু বেশি বৈয়াকরণিক ব'লেও বটে।

৬

রাগের পুরা-কথা

পূর্বেই বলেছি রাগরাগিণীর উদ্ভব-ইতিহাস ছায়াচ্ছন্ন। কল্পনার তুলি দিয়ে সে-ছায়ার এখানে ওখানে আলোর রেখা আঁকতে পারি কিন্তু সে-রেখাও হবে মূলত কাল্পনিক। তাই এ-প্রয়াস পাওয়ার খুব বেশি সার্থকতা নেই। তাছাড়া বলেছি কেন আমাদের সঙ্গীতের তথ্যগত ঐতিহাসিক দিকটার 'পরে বেশি জোর দেওয়া নিষ্ফল। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একটি বক্তৃতায় একথা বলেছিলেন দশবৎসর আগে—লক্ষ্ণৌয়ে: যে, রাগরাগিণীদের রচয়িতার নাম আমরা জানি না কেন না রচয়িতাদের এ-হুঁশই ছিল না যে এ নামের প্রচার থাকলে তবেই উত্তরকালে রাগরাগিণীর রচয়িতা হিসেবে তাঁরা অবিস্মরণীয় হবেন। তাঁরা চাইতেন—রাগরাগিণীগুলির প্রবর্তন: চাইতেন—সঙ্গীতসমাজে এরা আদরণীয় হোক, কোনো ঐতিহাসিক নামাড়ম্বর না। তাছাড়া এ-ও হ'তে পারে যে অধিকাংশ রাগেরই কোনো একেশ্বর রচয়িতা আদৌ ছিল না—মুখে-মুখে নানা গুণীর গুণপনায় তারা নিত্য-নবজন্ম লাভ করেছে। এ-সম্ভাবনার কথা মনে হয় আরো এই জন্যে যে একই রাগের রসরূপ খুব বেশি রকম বদলে যায় বিভিন্ন শ্রেণীতে গাইলে।

যেমন ধরা যাক তানসেনের ধ্রুপদ ভৈরবীর রসের সঙ্গে সোরির টপ্পা ভৈরবীর রস। এক্ষেত্রেও ভৈরবীর রচয়িতা হিসেবে তানসেন ও সোরি উভয়েরি নাম করা অযৌক্তিক হবে না—যেহেতু একই রাগের খাতে উভয়ে স্বতন্ত্র স্রোত বইয়েছেন স্বতন্ত্র প্রেরণার উৎস থেকে। বস্তুত আমাদের রাগের পৃথক্ শ্রেণীবিভাগের মাঝেও তার এই-যে অম্লান ঐক্যজাত রসরূপসমৃদ্ধি—একই রাগে বিভিন্ন গুণীর কণ্ঠে আলাদা আলাদা রস সৃষ্টি ক'রেও তাদের জাতিগত চিহ্ন কায়েমি ক'রে রাখার এই-যে শক্তি—প্রত্যেক গুণীকে ছাড়া দিয়েও বাঁধার এই যে অদৃষ্টপূর্ব কৃতিত্ব এসব দেখলে রাগসঙ্গীতের পূর্বোল্লিখিত দিব্য প্রেরণার কথা মনে না হ'য়েই বোধ হয় পারে না। মনে হয়, কোনো সচেতন সঙ্গীতসাধনায় এর ঢল নামে নি—এ নেমেছে আকাশগঙ্গারই মতন প্রতি গুণীর গানবাগানে একই রসধারে রকমারি ফুলের মর্সুম আনতে। একই বাগ্বাদিনী যেমন বিভিন্ন দেশের মাটিতে বিভিন্ন বাকের মন্ত্র দেন—কোনো একটি লোকের চেষ্টায় যেমন তার জাতীয় ভাষা গ'ড়ে ওঠে না—তেম্নি। একথা ঠিক যে, রাজন্যদের দরবারে বড় বড় গুণী বড় বড় রাগ সৃষ্টি ক'রে শিরোপা ও বাহবা পেতেন। একথাও শুনে আসছি যে তানসেন না কি বাহার, মিয়াঁ মল্লার, দরবারি তোড়ি ও দরবারি কানাড়া এই চারটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে এ-ধরণের তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য একটা কানাকড়িও নয়। তাই রাজদরবারে বড় বড় সভাগায়কেরা রাজাদিষ্ট হ'য়ে একই রাগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখাতেন, না ভিন্ন ভিন্ন রাগ সৃষ্টি করতেন বলা কঠিন। এখানে অবশ্য উপরাগদের কথা বলছি না—যারা প্রায় "ধুন্" জাতীয় (popular melodies) সুরের কোঠায় পড়ে: বলছি বড় বড় কুলীন 'খানদানি' রাগের কথা। এসব রাগ বহুকাল থেকে প্রচলিত—সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে এদের কুলজি বা ধাম না থাকলেও উপাধি ও নাম বেশ বড় হরফেই উৎকীর্ণ হ'য়ে আছে। কাজেই রাগগুলি নিশ্চয় এ-শাস্ত্রদের চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ। অন্তত একথা নিশ্চিত যে কোনো গ্রন্থকারই বলেন না অমুক রাগ

অমুক সঙ্গীতকারের রচিত। রাগগুলির বয়স যে শাস্ত্রকারদের রচনার সময়েও যথেষ্ট ছিল তার আর একটা প্রমাণ এই যে অনেক শাস্ত্রী তাদের বয়োনির্ণয়ের উপায় খুঁজে না পেয়ে লিখে গেলেন স্বয়ং মহাদেবই হ'লেন রাগের জনক, ভরতমুনি না। এ-কিম্বদন্তীর প্রচার এতই বেশি ছিল যে এ নিয়ে বহু মজার উপকথাই রচিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি অনেকেই শুনেছেন। নারদ মুনি ছিলেন ভারি গাইয়ে, দারুণ গাইয়ে, সোজা গাইয়ে নয় যাকে বলে। তাঁর পায়া ভারি: আমি বড় কেও-কেটা নই—রাগরাগিণী আমার ঠোঁটস্থ, নখদর্পণে—ভাব। বিষ্ণু ভালো-মানুষের মতন তা বটেই তো, তা বটেই তো বলতে বলতে গুণীকে নিয়ে গেলেন গন্ধর্বলোকে। মুনি তো অবাক্—সুন্দর সুন্দর দেব দেবী কিন্নর কিন্নরী হাত-পা-ভাঙা—কাঁদছে! কী ব্যাপার? "আর মুনি," বলল তারা, "আমরা হলাম রাগরাগিণী। দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের সৃষ্টি করলেন গেয়ে। এখন দেখ দেখি, নারদমুনি গেয়ে আমাদের রূপ দেখিয়ে কী হাল করেছেন আমাদের! আমরা দিনরাত কাঁদছি—হে দেবদেব, মুনিকে রাগ গাওয়া থেকে ঠেকাও গো! করুণাময়ের কানে কবে যে আমাদের আর্জি পৌঁছবে!" মুনির তো চক্ষু-স্থির!

এ-ধরণের উপকথা থেকে টের পাওয়া যায় রাগরাগিণী সম্বন্ধে সাধারণের মনের হাওয়া বইত কোন্ দিকে। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের মার্গসঙ্গীতের দৈবী বংশকৌলীন্য সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনে সংশয়ের বাষ্পও ছিল না। শুধু শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিই তো নয়, আমরা দেখেছি মহাভারতেও লেখা আছে গন্ধর্ব ও মুনিরা এসে যুধিষ্ঠিরের সভায় গান গেয়েছিলেন। সেগুলি রাগ ছিল কি না মহাভারতকার লিখে যান নি—কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে সঙ্গীতের দৈবী বংশমর্যাদা ছিল ব'লেই এমনতর কথা আমাদের পুরাণ শাস্ত্রাদিতে বার বার অকুতোভয়ে লেখা হ'ত, শাস্ত্রাদিতে শুধু যে ভিন্ন ভিন্ন রাগদেবীর আবাহনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সময় পূজালগ্ন হিসেবেই নির্দিষ্ট হ'ত তাই নয়, পেশাদারী গায়কদের মধ্যেও সান্ধ্যরাগ সকালে বা

প্রভাতী রাগ রাত্রে গাইতে অনিচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে খুবই প্রবল ছিল। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই। বছর দশেক আগে কাশীর বিখ্যাত মোতিবাই কলকাতায় এসেছিলেন। সন্ধ্যায় বাগেশ্রী, বেহাগ, ইমন, কেদারা কত রাগই গাইলেন—অপূর্ব! কিন্তু শেষটায় যেই তাকে অনুরোধ করলাম একটি ভৈরবী গাইতে অম্‌নি তিনি হাতজোড় করলেন: সকালবেলার রাগ সন্ধ্যেবেলা! শাস্ত্রীজির, ওস্তাদজির মানা। কালাপাহাড় আমরাও নাছোড়বন্দ্‌—শেষটায় নাককান ম'লে অনুপস্থিত ওস্তাদের কাছে অস্ফুটস্বরে ক্ষমা চেয়ে বাইসাহেবা "আরে আরে সৈঁয়া" ব'লে ভৈরবী গাইলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ না। বোধ হয় মন বসে নি।

এম্‌নি প্রভাব এখনো আছে সেকেলে প্রথার অনুশাসনের!

তবে একটা কথা: আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিধানদাতা হিসেবে যে কল্পতরু ছিলেন একথাও ভুললে চলবে না। যখন তাঁরা দেখলেন যে, অনেকে অসময়ে নানান্‌ রাগ গাইছে, মানছে না কোনোমতেই—তখন মানে মানে বিধান দিলেন: "যস্মিন্‌দেশে যথা শিষ্টৈর্গীতং বিজ্ঞস্তথাচরেৎ" অর্থাৎ "চালাক যে হবে সে হাল ফ্যাশনের অনুবর্তী হবে—যেহেতু শিষ্টরা ফ্যাশন বদলালে বিধান-লঙ্ঘনে দোষ নেই" (সঙ্গীতনির্ণয়)। কিম্বা ধরা যাক নারদসংহিতার বিধান: "রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞেয়াং কালদোষো ন বিদ্যতে।" সম্ভবত নারদ মুনির সময়ে সিংহাসনে ছিলেন জরাসন্ধ বা অনুরূপ মুসোলিনি তাই এবার মুনি লিখলেন—মানের দায়ে না, প্রাণের দায়ে—যে, "থিয়েটারে ও রাজার হুকুমে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো রাগ গাওয়া চলবে—তাতে ভাগবত অশুদ্ধ হবে না।" আমাদের শাস্ত্রবিধিগুলি চোখ খুলে পড়লে সময়ে সময়ে ভারি মজা লাগে। সেকালের শাস্ত্রীরা সচরাচর 'বজ্রাদপি কঠোর' শাস্ত্রী হ'লেও দরকার হ'লে 'কুসুমাদপি মৃদু' ঘটক বনতেও পারতেন বৈ কি।

কিন্তু সব রাগের না হোক অনেক রাগেরই আবাহনের একটা প্রহর নির্দিষ্ট থাকত। এসব ইতিবৃত্তান্ত নিয়ে এ-আলোচনা শুধু ইঙ্গিত করতে যে আমাদের রাগরাগিণীরা রসে আজো নবীন বটে,

কিন্তু বয়সে প্রবীণ। তাই ওঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা—এ-অন্বেষণ শেষটায় গিয়ে ঠেকবেই কিম্বদন্তীতে জনশ্রুতিতে কল্পনায় থিওরিতে।

তবে রাগরাগিণীর উদ্ভবাদির সময় ঠিক জানা না গেলেও মোটামুটি একটা ধারা চোখে পড়ে—যাকে বলা যেতে পারে ক্রমবিকাশের ধারা। যুগে যুগে মানুষের মন বদ্‌লায়ই। তাদের কলাকারুও মনের ঠাঁইবদলের সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লায়। না বদ্‌লালে তারা জীবন্ত থাকবে কী ক'রে? রাগরাগিণীদের স্থাপত্যকারু তথা ঠাট ও ভঙ্গি যে যুগে যুগে এম্‌নি বদ্‌লেছে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি আগেকার অনেক রাগের মূল ঠাটই মেলে না সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বর্ণিত ঠাটের সঙ্গে; সেসব রাগের এখনকার রূপের সঙ্গেও তখনকার রূপের মিল নেই অনেক স্থলেই। বাহুল্যভয়ে দৃষ্টান্ত দিলাম না। তবে একথা উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে অনেক গোঁড়া সেকেলেপন্থীকে এখনো তর্ক করতে শোনা যায় যে প্রাচীন কালের রাগরাগিণীর বিশুদ্ধি রক্ষা করতে হবেই। এ বিশুদ্ধি রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় কি না সেটা আপাতত মুলতুবি রেখে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সেটা অসম্ভব এবং যুগে যুগে রাগরাগিণীর ধারা ভঙ্গি ঢং চাল রূপ ও রস বদ্‌লে এসেছে ক্রমাগতই—তাই শুদ্ধ রাগ বলতে শাশ্বত অপরিবর্তনীয় কোনো কাঠামো বোঝায় না, বোঝাতে পারে না।

তাই তো সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের কথায় বলছিলাম যে, রাগের ইতিহাস রেখে বিকাশ নিয়ে আলোচনা করাই বেশি ফলপ্রসূ। তবে একাজও সংক্ষেপেই সারতে হবে স্থানাভাব ব'লেও বটে, এ নিয়ে বেশি বলতে গেলে ভুল বাড়বে ব'লেও বটে। ভরসা এই যে আমাদের সঙ্গীতের কোনো বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বা পঞ্জিকা নেই। তাই যাকে বলে কমন সেন্স তার 'পরেই বেশি ভর করতে হবে। কেবল মনে রাখা চাই যে, এ-জ্ঞানের বাতি অনেক সময়েই ক্ষীণপ্রভ—সে-আবছা-আভায়-পরিলক্ষিত ম্লায়মান পথকে দরদী কল্পনার দীপশিখায় একটু দৃষ্টিগম্য ক'রে চলা ছাড়া গতি নেই।

বৈদিক পর্ব্ব

সব সঙ্গীতই প্রথম দিকে থাকে খুবই সরল—প্রিমিটিভ। তখন পর্দার ব্যবহারও থাকে কম—সেইটেই তো স্বাভাবিক। সে-সময়ে সঙ্গীত থাকে মূলত আবৃত্তি-বর্গীয়—chant, recitation জাতীয়।

এখানে একটা কথা সেরে নিই আগে। এ-বইটিতে আমি বিশেষ ক'রে বলছি কণ্ঠসঙ্গীতেরই কথা। যন্ত্রসঙ্গীতকে ধরিনি তার কারণ এই যে, যদিও যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের আবেদন এক নয় তবু কণ্ঠ ও যন্ত্রের গঠনগত পার্থক্যের কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে যন্ত্রসঙ্গীত মূলত কণ্ঠসঙ্গীতকেই অনুসরণ ক'রে এসেছে। য়ুরোপে কিন্তু তা হয় নি। ওদের দেশে যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীতের রাজ্য থেকে উধাও হ'য়ে বেরিয়ে গিয়ে স্বরসঙ্গতি ও সংধ্বনি-সঙ্গীতের উপনিবেশে বৃহৎ সাম্রাজ্যের স্বারাজ্য বেশ পাকা ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু আমাদের দেশে স্বরসঙ্গতির বা কোনো রকম দলবদ্ধ সঙ্গীতের চল না হওয়ার দরুণ যন্ত্রসঙ্গীত এমন ধারা কোনো আত্মস্বাতন্ত্র্যের জমি খুঁজে পায় নি। তন্ত্রকারগণের আলাপ গায়কদের আলাপের হুবহু অনুরূপ এমন কথা বলছি না—কিন্তু বাদ্যসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত একই শাস্ত্র একই বিধান মেনে এসেছে বরাবরই। কারণ খুঁটিনাটিতে যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীতের ইতরবিশেষ কিছু থাকলেও মূলত সে যে কণ্ঠসঙ্গীতকেই অগ্রজ ব'লে তার অনুবর্তন করেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জন্যে আমাদের সঙ্গীতকোবিদেরা সবাই এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন যে,

নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবৃত্তি চ।
অতো গীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে॥

(সঙ্গীত রত্নাকর)

অর্থাৎ, নৃত্য বাদ্যকে মেনে চলে, বাদ্য—গীতকে। কাজেই নৃত্য গীত বাদ্য এ তৌর্যত্রিকের মধ্যে গীতকেই জ্যেষ্ঠ তথা শ্রেষ্ঠ ব'লে মানতে হবে।

যাক, এবার স্থুরু করি।

প্রথম অবস্থায় সব সঙ্গীতই আবৃত্তি-পথচারী হয়—অল্প কয়েকটি পর্দা নিয়েই কারবার করে। আমাদের বৈদিক যুগে স্তোত্রপাঠ—সামগান—(hymnology) ছিল এই-জাতীয় সঙ্গীত—বা উপসঙ্গীত। সে সময়ে রাগসঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছিল কি না নিশ্চিত ক'রে কেউ বলতে পারে না, তবে সম্ভবত হয় নি, কেন না বলেছি—ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যার উল্লেখ আছে সে হ'ল "জাতি"—রাগের পূর্বপুরুষ—এবং বৈদিক যুগ ছিল প্রাক্-ভরত। তাছাড়া রামায়ণ মহাভারতেও রাগসঙ্গীতের উল্লেখ নেই, এবং এরা বৈদিক যুগের পরে রচিত ব'লেই প্রসিদ্ধি।

কিন্তু বৈদিক যুগে আবৃত্তিবর্গীয় গাথা (chanting) বা স্তব (recitation) ছাড়া অন্য কোনো উচ্চতর সঙ্গীত ছিল কি না জানা নেই। নানা মুনি নানা থিওরি আস্ফালন ক'রে জাহির করতে পারেন—কিন্তু স্বরলিপির নজির বিনা সে-আস্ফালন হ'য়ে দাঁড়ায় গায়ের জোর—যুক্তির হালচাল অন্য। তাই এইটুকু বলাই নিরাপদ যে অন্তত বৈদিক যুগের গাথা বা সামগান-জাতীয় সঙ্গীতকে উপসঙ্গীত বলাই ভালো। কেন না যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় যে বৈদিক যুগে ধ্বনিসম্পাতের ভিত্তি ছিল ঠিক সাঙ্গীতিক নয়—কণ্ঠস্বরের একটু আধটু "উদাত্ত-অনুদাত্ত" কি না ওঠা-পড়া—যৎসামান্য "স্বরিত" কি না মিড়ের সাহায্যে।

সামগানে ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার এই সাতটি পর্দা ব্যবহার হ'ত এমন কথাও পড়া যায়, কিন্তু এর ফলে যে-জ্ঞানালোক লাভ হয় সে হ'ল জোনাকির আলো: তাতে অন্ধকারকেই আরো নিবিড় ক'রে দেখায়, পথচলার কোনো দীপপাথেয় মেলে না। কেন না এতে ক'রে যে-তথ্যটুকুর গুড় আমরা অতি কষ্টে লাভ করি—তাতে শুধু সংশয়ের পিপীলিকারই উদরপূর্তি হয়—প্রজ্ঞার ক্ষুধা মেটে না। কী হবে ক্রুষ্ট গাথা উদাত্ত অনুদাত্ত এসব নাম্-ঠিকানা জেনে যদি সামগানাদির স্বরলিপিই থাকে অজানা, ওসব পর্দার কম্পনধ্বনি (frequency) থাকে অজ্ঞেয় ?

৮

ধ্রুপদ

আমাদের সঙ্গীতে প্রাক্-রাগাধ্যায়-পর্ব নিয়ে নানা রকম আলোচনা হয়েছে। ষ্ট্র্যাঙ্গোয়েজ সাহেব তাঁর বৈদিক স্তব গাথা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানান্ ভয়াবহ গবেষণাই করেছেন—এখনকার পণ্ডিতদের বেসুরা আবৃত্তি শুনে। এ-ধরণের গবেষণার মূল্য কেন খুবই কম তা বার বার বলেছি: কী ক'রে মান্‌ব যে একালের পণ্ডিতদের আবৃত্তি সেকালের আবৃত্তিরই স্বজাতি? য়ুরোপে স্বরলিপি থাকার দরুণ সেকালের সঙ্গীতের রচনাভঙ্গির পরিচয় পাই, আমাদের দেশে তার স্থান নিয়েছে কথার ব্যাখ্যানা, এবং বলা বাহুল্য যে, বিনা স্বরলিপি শুধু কথায় শুধু যে চিঁড়ে ভেজে না তাই নয়—স্বরজ্ঞানও খুব বেশি এগোয় না।

তাই এবার আসা যাক্ রাগাধ্যায়ে। বলেছি রাগের গঙ্গোত্রীলোক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন: কেউ বলতে পারে না কী ক'রে রাগসঙ্গীতের অভ্যুদয় হ'ল ও ঠিক্ কোন্ যুগে। সম্ভবত কোনো একটি বিশেষ যুগেই এ-সঙ্গীত হঠাৎ-গজিয়ে ওঠে নি, কয়েকটি বড় প্রতিভার প্রেরণায় ও তাঁদের শিষ্যদের কণ্ঠে কণ্ঠে ক্রমবিকাশ লাভ ক'রে ও পৌঁছল প্রথম ধ্রুপদ-পর্বে।

ধরতে গেলে যৌবনপ্রাপ্ত রাগসঙ্গীতের আদিপর্ব গ'ড়ে ওঠে এই ধ্রুপদী যুগে। ধ্রুপদ সম্বন্ধে আমরা প্রথম কিছু জানতে পারি, কারণ—প্রথমত, ধ্রুপদের বাঁধুনি ছিল খুব বাঁধাধরা, ছন্দোবদ্ধ; দ্বিতীয়ত, ধ্রুপদীরা প্রাণপণে চেষ্টা করতেন শিখে-নেওয়া গানগুলির চেহারা হুবহু বজায় রাখতে। এখনো আর্যাবর্তে নানান্ অতি দূর প্রদেশে একই ধ্রুপদ গানের বাঁধুনির সাদৃশ্য দেখে চমৎকৃত না হ'য়েই পারা যায় না। তাই ধ্রুপদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, নীহারিকার ছায়ালোক থেকে প্রথম আসে নক্ষত্রের রূপলোকে।

এ-ধ্রুপদেরও নিশ্চয় কিছু না কিছু বদল হয়েছে, তবে ওস্তাদদের রক্ষণশীলতার জন্যে তথা ধ্রুপদের শক্ত গাঁথুনির জন্যে ওর বর্ত্তমান

ইমারতেও ওর আদিম ইমারতের গঠনকারু বেশ নিটোল হ'য়েই নিজেকে জানান দিয়ে যায়। এতে কী দেখি আমরা?

দেখি যে ধ্রুপদে ছিল একটা পাকা কঠিন ধরণের—সলিড্—স্থাপত্যকারু—আর্কিটেক্‌চার। আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ এই চারটি তুকের স্তম্ভের 'পরে ধ্রুপদের ধ্যানগম্ভীর মহীয়ান সৌধ আজও দাঁড়িয়ে। এ-যুগে ভালো ধ্রুপদ গায়ক বড় শোনা যায় না—তবু দু-একজন ওস্তাদ কিছু আভাষ দিতে পারেন এখনো এর গাম্ভীর্যের, ধ্যানমৌনতার, ভাবসংযমের। সেই আভাষেই মন ভ'রে ওঠে। মনে সম্ভ্রম জাগে—ধ্রুপদী রচয়িতাদের প্রাচীন স্থাপত্য-পরিকল্পনায়। রবীন্দ্রনাথের তাজমহল-উচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়:

> "প্রেমের করুণ কোমলতা
> ফুটিল তা
> সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।"

ধ্রুপদের খুব সুষ্ঠু বর্ণনা নিহিত এই তিনটি লাইনে।

"প্রেমের করুণ কোমলতা"—করুণ কেন? এ-সঙ্গীতের যুগ অস্ত গেছে যে—এ-জিনিষ আর তো হবে না—যেমন তাজমহলও আর হবে না। অথচ কী প্রেম এর প্রতি স্পন্দনে!

"সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জ"—সন্দেহ কি? এ-কে সুন্দর না বলবে কে? যে-সৌন্দর্যের উপাদানে খেয়াল রচিত হ'ল সে সুন্দর নয় তো সুন্দর কে? পুষ্পপুঞ্জ! নয় তো কি? এক একটি গমক এক একটি মিড় ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে আর ফুটে ওঠে না কি এক একটি ফুল?

"প্রশান্ত পাষাণে"—এইখানেই তো ধ্রুপদের পরম মহিমা: এ-বস্তু নবনী দিয়ে গড়া নয়—ফুলের ফসল ফলে এর ধ্বনিনন্দনে—কিন্তু এইখানেই আসে দৃশ্যত স্বতোবিরোধ অথচ বিরোধের মধ্যেই সুষমার স্মিত সঙ্কেত—সে-ফুলের পাপড়ি অপল্‌কা নয়। কঠিনে-কোমল হ'য়েও সে কোমলে-কঠিন—পাষাণের ম'তই প্রশান্ত।

যথার্থ, ধ্রুপদের মর্মবাণী বিধৃত এই শান্তিরসে, গাম্ভীর্যে, ভাবসংযমে, উদার অথচ নিবিড় সন্ন্যাসে, করুণ অথচ প্রসন্ন বৈরাগ্যে। কারুণ্যকে

এ প্রশান্ততম সঙ্গীতও এড়িয়ে যেতে পারে নি, কেন না আমাদের সব সঙ্গীতের মধ্যেই কোথায় যেন একটা অশ্রুচ্ছলতা আছে…: "Our sweetest songs are those which tell of saddest thought" :

মধুরতম গানে
রণিয়া ওঠে প্রাণে
অশ্রুময়ী বাণী…
বরিতে কারে চায়
গাঁথিয়া সুরে হায়
ব্যথার মালাখানি ?

এ ছায়াভ বেদনা এ ব্যথার বরণমালাকে বাদ দিলে যেন আমাদের সঙ্গীত বনেদবিচ্ছিন্ন মতনই হ'য়ে পড়ে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের স্ফুরৎশিখা নৃত্যগতি বা ধ্বনিপ্রপাতের মহীয়সী দীপ্তি—grandeur—যেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের ভাবছন্দের সঙ্গে খাপ খায় না। ওদের হার্মনির সঙ্গীতের মতন অজস্র গতিবেগের স্ফুলিঙ্গ নেই আমাদের সঙ্গীতে—খেয়ালে তবু গতির চমক আছে কিছু, কিন্তু ধ্রুপদ মূলত স্থিতিধর্মী, ধ্যানধর্মী।

অবশ্য সব ধ্রুপদ নয়—যেমন খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদও আছে। এ-ধ্রুপদে আছে খানিকটা মেঘমন্দ্র, খানিকটা বিদ্যুদ্দীপ্তি, খানিকটা ঝঞ্ঝাবেগ—কিন্তু তবু কি জানি কেন মনে হয় খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের সাঙ্গীতিক মূল্য থাকলেও এখানে ধ্রুপদের মূল রসটিরই হয়েছে ভরাডুবি। প্রতি বিকাশেরই একটা মেজাজ আছে—যাকে ইংরাজিতে বলে মুড। ধ্রুপদের নৃত্যগতি, চলোর্মিচঞ্চলতা এ যেন যাকে ওরা বলে contradiction in terms—সংজ্ঞাবিপর্যয়, গুরুচণ্ডালী ঘরকন্না। ধ্রুপদের দীপ্তি নেই একথা বলি না—প্রাণ নেই বললেও সেটা হবে হসনীয় উক্তি—কারণ প্রাণবেগ ও দীপ্তিসম্পদ না থাকলে কোনো শিল্পই আনন্দ-সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ধ্রুপদের স্বধর্ম বলতেই কানে গুনগুনিয়ে ওঠে গীতার—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব চ :

ধ্রুপদের হওয়াই চাই—অন্তঃসুখ অন্তরারাম, অন্তর্জ্যোতি।

ধ্রুপদ হ'ল স্বভাব-অন্তর্মুখী যে। তাই বাইরের ছোঁয়াচ সে বর্জন করে। ওর মধ্যে অসম্পূর্ণতা কি নেই? আছে বৈ কি। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতাই যে ওর পরিচায়ক। বেগোচ্ছলতা ওর নেই খেয়াল বা টপ্পার মতন। সৌকুমার্য ওর নেই ঠুংরির মতন। হৃদয়ালুতা ওর নেই কীর্তনের মতন। নেই, কেন না ওর আছে অন্য এক নিজস্ব পরিচয়, ও যা ও তাই। ও শান্তিময়, স্বপ্ননিবিড়, গহনবাসী। ও প্রেরণা খোঁজে বহির্জীবনের অভিঘাতে সঙ্ঘাতে আনন্দমেলায় না : খোঁজে—অন্তরের ধ্যানস্তব্ধ, ভাবগাঢ়, সংযতপ্রভ সুধালোকে। লতা পল্লবের প্রগল্‌ভতায়, বন্যা জোয়ারের কলহাস্যে, পিক পাপিয়ার কুহুধ্বনিতে ওর মুক্তি নেই। ওর মুক্তি—গম্ভীর কঠিন স্থাপত্যকারুর অচঞ্চল সম্পদে, সমাহিতিতে, শান্তিতে, সংযমে।

খেয়াল

খেয়াল শব্দটি পারসিক। অর্থ—যথেচ্ছাচার। ধ্রুপদে রাগবিস্তারের পদ্ধতি ছিল ধরাবাঁধা। তাল ছন্দও ছিল প্র[illegible]. খেয়ালের ঔদার্যগুণে তালের এই বজ্র আঁটুনি থেকে রাগ পেল অব্যাহতি। তাই বোধ হয় ক্রোধন ধ্রুপদী পিতা কুলাঙ্গার সন্তানের এহেন নামকরণ করেন।

খেয়ালের স্রষ্টা ছিলেন না কি আমীর খস্রু—শোনা যায় প্রায়ই। যতদূর জানা যায়, আমীর খস্রু ছিলেন বিখ্যাত আলাউদ্দিন খিলিজির সভাগায়ক (১২৯৫—১৩১৬)। উইলার্ড সাহেব লিখেছেন জোয়ানপুরের সুলতান হোসেন শিকি খেয়ালের স্রষ্টা। সম্ভবত আরও নানা মুনিকে শুধালে আরও নানাবিধ মত পাওয়া যাবে। কিন্তু এসব মতামতের

চর্চায় বিশেষ ফলোদয় হওয়ার আশা শূন্য, কেন না বলেছি, আমাদের সঙ্গীতের কোনো ধারানিবদ্ধ বিশ্বাসযোগ্য উদ্ভব-ইতিহাস নেই।

তাছাড়া একথাও মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে, খেয়াল কোনো একজন গুণীর হাতেগড়া জিনিষ। কম্পোজিশন বলতে য়ুরোপে যা বোঝায় আমাদের সঙ্গীতে ঠিক তা বোঝায় না। কম্পোজিশনের একটা গোড়াকার কথা হ'ল রূপের বা ছাঁচের দৃঢ়তা—জমাট-বাঁধা। (একথায় পরে আবার ফিরে আসব বাংলা গানের প্রসঙ্গে।) এ-হিসেবে একমাত্র ধ্রূপদ সঙ্গীতকেই যথাযথ কম্পোজিশন বলা চলে, কেন না বাঁটে, তুল্‌কি চালে, বিস্তারে ধ্রুপদ গানগুলির গাঢ়বন্ধ খানিকটা ঢিল দিলেও তবু সে খুব আলগা হ'য়ে পড়ে না। কাজেই ধ্রুপদী বাঁধুনিকে খানিকটা আঁটসাঁট বলা অসঙ্গত নয়। তাই হয়ত রচনার দিক দিয়ে যত রচয়িতার গল্প রূপকথা শোনা যায় তাঁরা প্রায়শই ধ্রুপদী। উইলার্ড সাহেব লিখছেন আলাউদ্দিনের কোর্টে গোপাল নায়ক এসে তাঁর "গীত" ব'লে একধরণের রচনা গেয়েছিলেন দিগ্বিজয়ী হ'তে চেয়ে। এ রচনা ছিল না কি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সৃষ্টি। আধুনিক কাব্যাত্মক গানের পূর্বপুরুষ কি না জানা যায় না, তবে "গীত" শুনে মনে হয় অসম্ভব না। যাই হোক্ এ-ধরণের রচনা যদি তখনকার যুগে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রচনা ব'লে শিরোপা পেয়ে থাকে তাহ'লেও আমাদের এ-ধারণার সমর্থনই মেলে যে সঙ্গীতে কম্পোজিশন বলতে যা বোঝায় সে যুগের গুণীরা ঠিক্ তা বুঝতেন না। উদাহরণত একটা গল্প বলি। উইলার্ড সাহেব লিখছেন: দুষ্টুর শিরোমণি আমীর খস্রু বাদশার সিংহাসনের আড়ালে লুকিয়ে শুনে গোপালের গীত কণ্ঠস্থ ক'রে নিলেন। পরের দিন তাঁকে শুনিয়ে দিলেন হুবহু ঐ ধরণেরই "গীত"। গোপাল তো থ।

এ-গল্পটির উল্লেখ করলাম শুধু দেখাতে যে রচনা বলতে যা বোঝায় তা হয়ত এক ধ্রুপদেই ছিল—খানিকটা। কারণ মনে রাখা চাই যে, নায়ক গোপাল ছিলেন জাত-ধ্রুপদী। তানসেন বৈজুবাওরা ধুঁদিখাঁ সুরদাস প্রভৃতির ধ্রুপদের এখনো চল আছে। তাতেও আদিম ধ্রুপদী

গঠন-স্থাপত্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ওস্তাদদের সংরক্ষণশীলতার প্রসাদে।

কিন্তু খেয়ালে যায় না। কেন না খেয়াল হ'ল অনেকটা যাকে বলা যায় তরল। খুব ধ্রুপদঘেঁষা খেয়ালে কিছু থাকে—কিন্তু সেখানে আবার খেয়াল যথার্থ খেয়াল হ'য়ে ওঠে নি—প্রায় ধ্রুপদের অপভ্রংশ হ'য়েই রয়েছে। যথার্থ খেয়ালে ধ্রুপদের গাঢ়বন্ধ কাঠিন্য যে নেই একথা অকুতোভয়েই বলা চলে। থাকবার কথাও নয়—কারণ এই তারল্যই হ'ল খেয়ালেব চরিত্রলক্ষণ—স্বরূপ। খেয়ালের স্বধর্ম হ'ল: প্রথম, তালবন্ধন থেকে মুক্তি; দ্বিতীয়, সুরের রেখায়িত গতি, বিচিত্র সাবলীল প্রবাহ যার নাম তানকর্তব; তৃতীয়, ধ্রুপদী স্থাপত্যের শাসন অগ্রাহ্য ক'রে সুরের ফুলনিকুঞ্জ, লতাবিতান রচনা করার প্রয়াস: লতা ফুল কথনো হয় প্রগল্‌ভ কখনো বা স্বল্পবাক্। তাই কোনো খেয়ালে তান বেশি, কোনো খেয়ালে কম। ও যে খামখেয়ালী এটা ভুললে তো চলবে না। ও দুরন্ত, রাগমাষ্টার ছন্দমাষ্টাররা ওকে শাসন করতে যে আজো আসেন না তা নয়, কিন্তু ও যে-ডানপিটে—পেরে ওঠেন কই? কখনো ও সুরের ঢেউয়ে চলে ভেসে, কখনো বা বসল সুরের স্থায়ী কোনো আসনে—যাকে বলে সুরস্থিতি—কিন্তু আবার যে-ই মর্জি হ'ল দে ছুট। ঐ ঐ পালায় পালায় ধর্ ধর্—বলতে থাকেন রাগশাসকরা। আর ধর্—তানের পাখায় ও কোন্ মেঘের আড়ালে যে লুকিয়েছে—! এই জন্যেই মনে হয় কম্পোজার বলতে যা বোঝায় তা ধ্রুপদের বেলায় কতকটা ছিল কিন্তু খেয়ালের বেলায় ছিল না, কেন না এভাবে যে ঠিক্ ধ্রুব কোনো রচনার নক্ষত্রমূর্তি গ'ড়ে ওঠে না সেটা সহজেই বোঝা যায়। হয়েছে কি, খেয়াল গ'ড়ে উঠেছে গুণীর স্কুলপালানো প্রবৃত্তির দরুণ, ভবঘুরে প্রবণতার তাগিদে, যাযাবর-বৃত্তির ফেরে।

বলাই বেশি—এ-প্রবৃত্তি মানবমনের একটি চিরন্তন তৃষ্ণা। তাই ধ্রুপদীরা যতই রাগ করুন না কেন এ মঞ্জুর—যেহেতু সমাজে ও জীবনে শুধু যে সুধীর সংযমীরাই সৃষ্টি করেন সৌন্দর্য আনেন তাই নয়—

উচ্ছৃঙ্খল লক্ষ্মীছাড়ারাও আনে এমন অনেক রূপ গতি সুষমা মাধুর্য যার দাম প্রচুর। তাই ধ্রুপদীদের মহিমাকে প্রণাম ক'রেও খেয়ালের প্রতি তাঁদের বিরাগে সায় দিতে না পারলে তাঁদের অসম্মান করা হয় না। পরমহংসদেবের কথা মনে পড়ে: "একঘেয়ে কেন হব? আমি নিরাকারেও আছি, সাকারেও। পোলাও-কোর্মায়ও আছি আবার ঝোলে-ঝালে-অম্বলেও আছি।"

অবশ্য দেখতে হবে এ-বহুবল্লভবৃত্তিতে না প্রেরণার অবনতি ঘটে—সুরুচির উজ্জ্বলতা না কমে—হৃদয় তার সৌকুমার্য বিকাশের পথে বাধা না পায়।

খেয়ালের শ্রেষ্ঠ বিকাশের বেলায় তা ঘটে নি একথা জোর ক'রেই বলা যায়। কারণ খেয়ালের মধ্যে তারল্য থাকলেও ক্ষণভঙ্গুরতা নেই, উর্মিবিলাস থাকলেও লক্ষ্যহীনতা নেই, বাঁধভাঙা স্বাধীনতা থাকলেও প্রমত্ত স্বৈরাচার নেই। ধ্রুপদের মতন সে-ও অঙ্গীকার করে রাগকে, লীলায়িত ক'রে তুলতে চায় তার অন্তর্নিহিত রসটিকে—চায় উধাও হ'তে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যেরি অভিসারে। রাগের স্থাপত্যশিল্পের পানে সে ধ্রুপদের মতন স্থিরপ্রেক্ষণে চেয়ে নেই বটে—কিন্তু তাই ব'লে সে যে উচ্চাশী নয় এমন কথা বলা চলে না। তার অভীপ্সা হ'ল রাগের গতিপ্রবাহকে নৃত্যগতিকে রাশ ছেড়ে দেওয়া: ছন্দোবদ্ধ নিয়মে নয়—রেখায়িত প্রসারণে। ধ্রুপদের স্বপ্ন তার স্বপ্ন নয় সত্য—(হ'লে ধ্রুপদ থেকে তার ভেদ থাকত কোথায়?)—কিন্তু তাই ব'লে যে তার প্রাণের স্বপ্নই নেই একথা সত্য নয়—যদিও ধ্রুপদীরা তাই ব'লে থাকেন। রাগের যে পরম বিশুদ্ধি ধ্রুপদের অন্তরাকুতি সে-আকুতি খেয়ালের প্রাণের অন্যতম লক্ষ্য—একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাই তানকর্তবে খেয়ালে রাগভ্রংশ ঘটে ওর বিরুদ্ধে ধ্রুপদীদের রটানো এ-অপবাদ মেনে নিলেও ওর অঙ্গে এ চাঁদেরই কলঙ্কের মতন—এতে ধ্রুপদের পতন ও মূর্ছা হ'লেও খেয়ালের অভ্যুত্থান ও জয়যাত্রা। কারণ রাগের ঐকান্তিক বিশুদ্ধি ও স্থৈর্য খেয়ালের দেয় নয়—খেয়ালের কাছে চাইতে হবে অন্য জিনিষ, আর

জানতে হবে কী চাইতে হবে। নইলে আর রসিক কী? মা-র কাছে যে-জিনিষ চাই বোনের কাছে সে-জিনিষ চাই না; বন্ধুর কাছে যা চাই বান্ধবীর কাছে তা চাই না; বিচারকের কাছে যা চাই দরদীর কাছে তা চাই না। জ্ঞানের একটা প্রধান ধর্ম টের পেতে শেখা—কার কাছে কী চাইতে হবে, কী আদায় ক'রে নিতে হবে। আনন্দের তৃষ্ণা বিচিত্র। একরকম ফুলে তার ডালি সাজালে ডালিই ভরে, মন ভরে না। বৈচিত্র্য তার প্রাণের তৃষ্ণা: Variety is the spice of life বলেছেন কবি। শিল্প তো জীবনেরই শাখা—অঙ্গজ। তাই রবীন্দ্রনাথ বড় সত্য কথাই বলেছেন তাঁর "সঙ্গীতের প্রাণধর্ম" প্রবন্ধে: "এই যে গতানুগতিকতা, এটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। সকল রকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ আত্মপ্রকাশ হওয়া চাই।"

কিন্তু প্রত্যেক যুগের সনাতনীরা এই কথাটাই যান ভুলে—বার বার, বার বার, বার বার। ভাবেন এক যুগে এক শ্রেণীর সৃষ্টিতে যে-আনন্দ মিলল অফুরন্ত অপর্যাপ্তি শুধু তারই করায়ত্ত। সনাতনীরা তাই বলেন যুগে যুগে "যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে।" ধ্রুপদীরা আরও এক পর্দা চড়েন, বলেন: "যা নেই ধ্রুপদে তা যে শুধু অন্যত্র নেই তাই নয়—তা থাকাই নামঞ্জুর।" কাজেই খেয়াল যা দিল তা যদি ধ্রুপদের অধিগম্য ও অনুমোদিত না হয় তবে সে তার হাতে মাথা কাটবে—যদি পারে। অভিজাতের সেই চিরচেনা আত্মম্ভরিতা। ভাবে: সে অমর, কিন্তু জানে না—'তাহারে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' ধ্রুপদ রাগ করল, অভিমান করল, কান্নাকাটি হাহুতাশ কত কী—কিন্তু খেয়াল শুনল না: করল ওকে সিংহাসনচ্যুত।

একদিক দিয়ে এ-দৃশ্যে দুঃখ হয়ই। কারণ ধ্রুপদের গরিমা ধ্রুব—স্থির—অচঞ্চল। খেয়ালে যা-ই থাকুক নেই ধ্রুপদের স্থাপত্য-শিল্প, নেই গাম্ভীর্য, নেই উদাত্ত কল্লোল। কিন্তু তবু নবযুগের অপরিহার্য আরাধ্য হ'ল নবধর্ম: খেয়ালকে কেউ ঠেকাতে পারল না, ধ্রুপদের অনেক কিছু আত্মসাৎ ক'রেও সে নিজস্ব এমন কিছু দিল যা ধ্রুপদের স্থিতিশীল শান্তি দিতে পারে নি। এ-সম্পদ হ'ল গতিশক্তি—

সাগরের জাগরণীতে আনন্দের পাল তুলে দিয়ে উচ্ছলতার আবেশে উধাও হওয়া তানের শুভ্রফেনকিরীটনৃত্যে :

The ocean surges, foams and flows,
There rise wild songs of ecstasy.
The sky joins with his starry hymn :
Come, there's a happy home for thee. *

ফেনায় ফুলেল চির-উদ্বেল উর্মিলা ধেয়ে চলে···
বাঁধভাঙা সুর-আনন্দে জাগে উচ্ছল কীর্তন···
চারণী-নীলিমা তারকা-মহিমা-স্তব ল'য়ে সেথা চলে···
এসো, সীমান্তহারা অনন্তে তব সুখ-নিকেতন।

১০

টপ্পা

মানুষের বিকাশ সব সময়ে হয় না তো সরল রাগে। কথনো সে এগোয় কথনো বা পিছোয়। গেটের উপমা সবাই জানেন : সভ্যতার বিকাশ স্পাইরালের বক্রগতিতে—ঋজুরেখায় না। মোটের উপর স্পাইরালও এগোয়—কিন্তু একটানা নয়—কথনো ধায় সাম্‌নে, কথনো করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

শিল্পের বেলায়ও এই কথা। ধ্রুপদের পরে খেয়াল এলো একটি সুন্দর বাণী নিয়ে। খেয়ালকে বলা চলে :

"তুমি ভারতীর তন্ত্রী 'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা।"

* দ্বিজেন্দ্রলালের "Lyrics of Ind" কবিতা-পুস্তক হইতে।

কিন্তু এর পরে যে-অতিথি এলেন তাঁর দানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলেও এমন কোনো "অপূর্বতা"-র আমদানি হ'ল না যার দরুণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠা চলে।

টপ্পা।

এ-অতিথিকে এনেছিলেন না কি সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কিম্বা অষ্টাদশের প্রথম দিকে পঞ্জাবের সোরিপ্রণয়ী গোলামনবি। প্রণয়িণীর নামে তাঁর পঞ্জাবি গানগুলি রচিত ব'লেই এর নামকরণ হ'ল—সোরির টপ্পা। কেউ কেউ আবার বলেন যে, না—গোলামনবি ওরফে গোলামরসুল ছিলেন খেয়ালিয়া, তাঁর পুত্র মিঞাজানিই টপ্পার প্রবর্তন করেন। কিন্তু টপ্পার জনয়িতা নিয়ে এ-তর্ক বন্ধ্যা। তাই এসব বচসা রেখে টপ্পার রসাধ্যায়ে আসি।

টপ্পার বৈশিষ্ট্য এই যে ওর তানগুলি খুব হাল্কা ও তাদের এক শ্রেণীর মিষ্টতাও আছে বৈ কি। বর্ণনা ক'রে এ-মিষ্টতার স্বরূপ বোঝানো অসম্ভব, তবে একটু কান পেতে শুনতে না শুনতে বোঝা যায় যে এ-সঙ্গীতের যে মিষ্টতা সে হ'ল চিনির পানা জাতীয়, তার মধ্যে গভীরতা নেই। কাজে কাজেই ওর আবেদন কানের দরবারেই সুরু এবং সেইখানেই সারা। মরম তো দূরের কথা, প্রাণের দ্বারীরও ও মন ভুলোতে পারল না। দোষ দ্বারীর নয়, সে বেদরদীও ছিল না, প্রথমটায় ব'লেও উঠল, সোভানাল্লা! আইয়ে বৈঠিয়ে। মনও যোগ দিল বৈ কি, তবে সুর একটু নামিয়ে বলল, আস্তাস্তে হোক্—বুঝি অতটা খুসির চড়া পর্দায় না। কিন্তু মরম সাহেবা একেবারে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। বললেন: ওকে ঝটিতি বিদায় করো। তবু ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল যার দরুণ প্রাণের দ্বারী মনের পাহারা উভয়েই শুনল খানিকক্ষণ। কিন্তু ক্রমশ মরম সাহেবার মুখ-ফেরানোর মেঘলা ছায়া নেমে এল তাদের সহসাদীপ্ত অঙ্গনে। মনের মুখের দিকে চেয়ে প্রাণ বলল: "মন্দ না খাঁসাহেব, তবে আজ থাক—মরম সাহেবার সঙ্গে এখন দেখা হবে না—আর একদিন আসবেন, আর—মাফ কীজিয়ে—কিন্তু কি জানেন, অর্থাৎ—কিছু যদি মনে না

করেন আপনার কণ্ঠের ডালিতে আরও দুএকরকম নজর যদি আনতে পারেন—" খাঁসাহেব বললেন: "সে কি প্রাণ সাহেব? আমার কণ্ঠের ডালিতে এই যে হীরের-টুকরো-সব গিট্‌কিরির-নজর পেশ করছি—মরম সাহেবা আগে একবার দেখুনই পরীক্ষা ক'রে—একটা ট্রায়াল তো দীজিয়ে—"

প্রাণের প্রশ্রয়কে বাধা দিয়ে মনের পাহারা বলল: "হাঁ সাহেব, ও-টুকরোগুলোতে আমার দোস্ত্ প্রাণ সাহেবের মন একটু ভুলবার মতন হয়েছিল কিন্তু আমারই হুঁশলানিতে তিনিও বেঁকে বসতে বাধ্য হলেন। শুধু চক্‌চকে হ'লেই সাঁচ্চা হীরে হয় না জনাব। প্রাণ সাহেব একটু সহজেই ভোলেন, কিন্তু আমি—হেঁ হেঁ—কি জানেন—আমি ওঁর চেয়ে একটু বেশি খুঁৎখুতে কদরদান। আমার মেজাজ এতে শরীফ হ'ল না যে—করি কি?"

খাঁ সাহেব বললেন: "সে কি হুজুরালি? আপনি কি বলতে চান আমার এই দানাগুলো মেকি, না এদের দীপ্তির জৌলুষ নেই লজ্জৎ নেই? আমরা যে এতে মস্ত্ হ'য়ে যাই—"

মন সাহেব ধম্‌কে বললেন: "প্রাণ, তুমি থামো! তুমি বাকায়দা বলতে পারো না—তার ওপর ছেলেমানুষ, অভ্রকে দেখে ভাবো জহুর পান্না চুনি।" (ফিরে) "না খাঁ সাহেব, একেবারে মেকি বলি না। তবে এ-দীপ্তিতে আরাম থাকলেও দানাগুলো বড়ই অপল্‌কা আর একই রকমের—একঘেয়ে—এতে মন ভরে না আমার। এতে মজা আছে কিন্তু মহোব্বৎ নেই।"

খাঁ সাহেব আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন: "কিন্তু খোদাবন্দ, মরম সাহেবা যদি ধরুন একবার নেকনজর হানেন—"

মনজি বাধা দিয়ে হেসে বললেন: "খাঁ সাহেব, মরম সাহেবার সঙ্গে আমি যে ঘর করি—আমার চেয়েও তিনি আবার এক কাঠি সরেস। অনেক কিছুতে আমি সায় দিলেও দেখেছি তিনি স্রেফ্ 'না' ক'রে দেন। এনায়েৎ তিনি সহজে করেন না। বিশেষত আপনার এ সব চীজে আমারই মন যখন ভুলল না তখন তাঁর মন ভুলবে

ভেবেছেন জি?—উহুঁ:—ও-আশা ছেড়ে দিন। তিনি চান শুধু যে টেঁকসই কিছু তাই নয়—সত্যি বলতে কি, আমিও তাঁর মর্জির বিলকুল পাত্তা পাই নে অনেক সময়। আমি যেমন প্রাণ দোস্ত্‌কে শাসাই, তিনিও তেম্‌নি শাসান আমাকে আর তাঁর সায় না পেলে—বার বার দেখেছি—বে-কায়দা খাঁ সাহেব—" (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) "সবই ফজুল। বার বার দেখেছি তিনি যা শুনে মুখ ফেরান দুদিন বাদে আমারও তা আর ভালো লাগে না। তাই হাল ছেড়ে দিন—এ-মালে শানাবে না। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন অন্দরমহলের দুয়ার খুল্‌না মৎ।"

টপ্পার সত্যি এইখানেই মহা মুস্কিল। ওর হাল্কা তান হাওয়াবিলাসে প্রাণ টানে কিন্তু মন ভরে না—বুদ্ধি কোনো খোরাকই পায় না যে। অবশ্য তা না পেলেও হয়ত রসের নিকষে ওর ছোঁওয়ায় 'কুলীন' দাগ ফুটে উঠতে পারত—যদি গভীরতার কোনো অলক্ষ্য-ইঙ্গিত (suggestive-ness) ওর স্পন্দনে উঠত ফুটে। ও মধুর—কিন্তু বড় সস্তাভাবেই মধুর। ও ললিত—কিন্তু অন্তরে কোনো কাঠিন্য নেই ব'লেই ব্যর্থকাম। ও জানে না যে শুধু ফুল দিয়ে পঞ্চশরের ধনুকও হয় না—তলায় একটুখানি কঞ্চি চাই অন্তত। মাত্র ভৈরবী, সিন্ধু, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, বারোঁয়া প্রমুখ কয়েকটি রাগের বহির্মহলেই ওর মজলিশ, মাইফেল। সেখানে হয়ত ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে—রঙচঙে সতরঞ্চও পাতা, ফুলদানিতে চিত্রবিচিত্র কাগজের ফুলও হেলছে দুলছে—কিন্তু সেখানে অন্তরের বনেদি অন্তঃপুরিকারা ভুলেও পদার্পণ করেন না। কাজেই ওর কাছে বড় জিনিষ চাইবার পর্দানশীনাই নেই, আর যার কাছে বড় দাবি কেউ করেই না সে যে ক্রমে ছোট হ'য়ে যাবেই এ অবধারিত। এই জন্যে ধ্রুপদ-খেয়ালের সঙ্গে টপ্পার নাম এক নিঃশ্বাসে করাই উচিত নয়।

তবে তাই ব'লে একথা বললে অন্যায় হবে যে টপ্পার কোনো সার্থকতাই নেই। সুরের সভায় ওরও একটা স্থান আছে: it takes all sorts to make a world: সুররাজ্ঞীর ডাইনে বাঁয়ে ওর ঠাঁই নেই; বটে কিন্তু পদপ্রান্তে ওর জন্যে বিঘৎখানিক জায়গা থাকবেই। তাছাড়া অন্যের সঙ্গে মিললে ও যেন নিজেকে খুঁজে পায়—তখন

টপ্‌খেয়াল হ'য়ে ও বেশ সুন্দর হ'য়ে ওঠে। ঠুংরির সঙ্গেও ও বেশ সহজেই মিশতে পারে। ওর বিশেষ কোনো কাঠিন্যজাতীয় বৈশিষ্ট্য নেই ব'লেই ওটা ওর কাছে সুসাধ্য। সুররাজ্ঞীর মালাকর ও নয়, তবে তাম্বুলকরঙ্কবাহক হ'তে ওকে ঠেকায় কে?

তবু টপ্পাকে যে মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল তার কারণ আছে। ও যত অপরাধই করুক ওর অন্তরঙ্গে না হোক বহিরঙ্গে আভিজাত্যের ছোপ লেগেছে। বড় জিনিষকে ও ছোট করেছে বটে কিন্তু তবু ও বড়রই কারবারী: ও হাত পেতেছে মার্গসঙ্গীতেরই কাছে—কোনো রাগচিহ্নবর্জিত ধুন্‌-এর কাছে না। বামন হ'লে হবে কি, চাঁদকেই ও চেয়েছে—রাগেরই রূপ দেখাবে এ-ই ওর পণ। বেচারি দুর্বল, পঙ্গু—কিন্তু তবু গিরিলঙ্ঘন করতে কোমর তো বেঁধেছিল: তাই ও রাগদেবীরই কুটুম্ব বৈ কি। মানি, এ-কুটুম্বিতা করতে চেয়ে ও পূর্ণাঙ্গীর ভাঙচুর ঘটিয়ে, তাঁকে তরল ক'রে, লঘু ক'রে একঘেয়ে ক'রে ফেলেছে। তবু একথা স্মরণীয় যে, ও যা করেছে ভালো করছে ভেবেই করেছে, কোনো ছোট মন নিয়ে করে নি। এক কথায় কোনো গ্রাম্যতা—ভাল্‌গারিটি—ওর নেই। তাই আহা, ওকে সুররাজ্ঞীর পদপ্রান্তে একটুখানি স্থান দেওয়া হোক্—রসজ্ঞদের এ-অনুকম্পা একেবারে অসঙ্গত হয় নি। ও গভীর শাশ্বত রস পরিবেষণ করতে না-ই পারল—কিছু ক্ষণিক রসসঞ্চার করতেও তো জানে। তা ছাড়া বলেছি, খেয়াল ঠুংরির সহচারী না হোক্ অনুগামী ও পরিচারক হবার শক্তি ওর আছে। বেচারি ওদের থেকে দূরে দূরে থাকলেও কি একটা দরদে মিশ খেতে পারে উভয়েরই সঙ্গে। এ-ও কম কথা নয়।

তাছাড়া ওর একটা মস্ত কৃতিত্ব এইখানে যে, ও নিজে ব্যর্থ হ'য়েই ইঙ্গিত দিল কোন্ পথে উজ্জ্বলতর সার্থকতার অভ্যাগম হ'তে পারে। এককথায়—ও ঠুংরি নামক অপরূপ সঙ্গীতস্রোতটির উৎসমুখ দিল খুলে। ললিতা হ'তে গিয়ে হ'ল অবলা, পেলব হ'তে গিয়ে হ'ল ঠুন্‌কো, দরদী হ'তে গিয়ে হ'ল হাহুতাশী—সেন্টিমেণ্টাল—কিন্তু যেহেতু failures are the pillars of success সেহেতু ঠুংরির মহৎ সাফল্যের

আভাষ এনে ও ধন্য। ও যে দেখিয়ে দিল সত্যিকার দরদ, পেলবতা, লালিত্য কার নাম। তাই টপ্পার পরখের দরকার ছিল বৈ কি। আমাদের সঙ্গীতের বিকাশ-ধারায় ওর অভ্যাগম ছিল অপরিহার্য। এ-বিকাশকে অখণ্ডভাবে দেখতে না চাইলে ওর যথার্থ মূল্য ধার্য করা যাবে না। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে যাকে তুচ্ছ মনে হয় যথাযথ পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখলে তাকে যে অভিনন্দনীয় মনে হয় একথার একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—টপ্পা।

১১

.রি

এর পরে গানের আকাশে উঁকি দিল একটি একটি ক'রে ঠুংরির তারকামালা। ঠুংরি সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি যা আমাদের পূর্ববর্তীগণ জানতেন না। কেন না এযুগে ঠুংরির শুধু আদরই নয় জীবন্ত বিকাশ হয়েছে। ওর সম্বন্ধে কৃষ্ণধন বাবু যা লিখেছেন ও ঠিক তা নয়। তিনি লিখেছেন : "যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে এবং আদ্ধা কাওয়ালি ও ঠুংরি তালে গীত হয় তাহাকে ঠুংরি বলে।" কিন্তু তিনি যখন গীতসূত্রসার লিখেছিলেন—গত শতাব্দীর শেষের দিকে—তখন ঠুংরির শৈশবাবস্থা না হোক কৈশোরের বেশি নয়। আজ ঠুংরি প্রাপ্তযৌবন। কারণ গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরেই ঠুংরি সাবালক হয়েছে।

ঠুংরির গোমুখী নেমেছিল যে কোন্ প্রতিভার শিখর থেকে সে সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিত ক'রে কিছু জানি না। তবে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শা যখন লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক মেটেবুরুজে নির্বাসিত হ'য়ে আসেন তখন তাঁর একশো দশ জন সভাগায়কগায়িকাদের মধ্যে যে অনেকে ঠুংরি চর্চা করতেন এ আমরা প্রায় প্রত্যক্ষভাবে জানি। মেটেবুরুজে আমারই এক গুরু (এখন

অশীতিপর বৃদ্ধ) বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেতেন বিখ্যাত আলি বক্স খাঁর কাছে খেয়াল শিখতে। (আলিবক্স খাঁ ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী ৺শ্রীঅঘোর চক্রবর্তীর ওস্তাদ।) তাঁর কাছে শুনেছি আলিবক্স খাঁর ঘরে তিনি মাঝে মাঝেই পর্দানশীনা বামাকণ্ঠে অপূর্ব ঠুংরি শুনতেন। সে হবে পঞ্চাশ ষাট বৎসরের কথা। আরো অনেকের এজাহার মেলে এ-বিষয়ে। তাথেকে মনে হয় ওয়াজিদ আলি শার সভাগায়ক ও গায়িকাদের প্রসাদে ঠুংরির বিকাশ হয়েছিল নেহাৎ কম না। এমন কি, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি নামে এক তালও প্রখ্যাত হ'য়ে উঠল ওর কৃপায়। তাছাড়া ৺অতুলপ্রসাদের মুখে শুনতাম লক্ষ্ণৌয়ের মুন্নে খাঁ প্রমুখ খানদানি ওস্তাদরা না কি অপূর্ব ঠুংরি গাইতেন। এইসব কারণে মনে হয় ঠুংরি-চর্চার ভারকেন্দ্র ছিল লক্ষ্ণৌয়ে—সম্ভবত আগ্রা ও দিল্লির গায়করা প্রথম লক্ষ্ণৌ থেকেই ঠুংরির প্রেরণা পান। নিশ্চিত ক'রে কিছু জানা যায় না; তবে এ-বিষয়ে সন্দেহের পথ নেই যে, মার্গসঙ্গীতের মধ্যে ঠুংরি সবচেয়ে আধুনিক এবং এখন প্রায় শতায়ু হ'ল।

যেটা আরো জানি সেটা হচ্ছে এই যে, ওয়াজিদ আলি শা মেটেবুরুজে আসার দরুণ বাংলাদেশে মার্গসঙ্গীতের যে নতুন স্রোত বয় তার একটা মস্ত ঢল নেমেছিল এই ঠুংরির খাতে। বিশেষ ক'রে ভৈয়া সাব গণপৎ রাও এবং অনুপম গুণী মৈজুদ্দিন খাঁর প্রসাদে।

গণপৎ রাওয়ের অপূর্ব ঠুংরি আমি স্বকর্ণে শুনেছি শুধু তাঁর বাজনায় না—তাঁর অনেক শিষ্যের কাছে। এঁদের মধ্যে ৺শ্যামলাল ক্ষেত্রী ছিলেন সেরা সাকরেদ—ঠুংরিতে ওস্তাদ যাকে বলে। বিখ্যাত ৺মৈজুদ্দিন খাঁর গান প্রায় শুনতে শুনতে শোনা হয় নি ভাগ্যদোষে—কিন্তু গ্রামোফোনে তাঁর খাম্বাজ, দেশ, ভৈরবী প্রভৃতি এখনো শুনি। খ্যাতনামা গায়ক শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছেও গণপৎ রাও ও মৈজুদ্দিন খাঁর ঘরানা ঠুংরি এখনো আছে—অনেকেই শুনেছেন তাঁর প্রসাদে। তাছাড়া মৈজুদ্দিন খাঁর কাছে এমন বড় বাই বোধ হয় নেই যিনি ঠুংরি শেখেন নি! বর্তমান ঠুংরির ইনি

যে একজন প্রধান রচয়িতা ও গুণী হিসেবেও ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর গুণী এ-বিষয়ে তিলার্ধও সংশয় নেই। (মোতিবাই ও অচ্ছন বাইয়ের কাছে যখন ঠুংরি শিখতাম তখন এঁর কথা কত যে শুনতাম! কলকাতার জর্দন বাই এবং জয়পুরের বিখ্যাত গহর বাইয়ের কাছেও।)

কাজেই ঠুংরির জীবন্ত আবহাওয়ায় আমরা মানুষ বললে একটুও ভুল হবে না। চোখের সাম্‌নে দিনে দিনে ঠুংরির প্রভাব ব্যাপ্ত হ'তে দেখেছি, খেয়ালে গজলে টপ্পায় ঠুংরির নানান্ ভাবভঙ্গি রংঢং মিশতে দেখেছি, ঠুংরি-বিমুখদের ধীরে ধীরে ঠুংরির মাধুর্যে প্রসন্ন হ'তে···প্রীত হ'তে হ'তে···শেষটায় মুগ্ধ হ'তে দেখেছি···কত কী! হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের ধমনীতে এ-যুগে ঠুংরি যে অনেকখানি নবীন তাজা রক্তস্রোতের ঢেউ তুলেছে একথা আজ অবিসংবাদিত। সেদিনও লক্ষ্ণৌয়ে ভাতখণ্ডের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের সঙ্গে বিখ্যাত ঠুংরি-রচয়িতা নবাব কদর পিয়ার পুত্রের কাছে আধুনিকতম স-মিল ঠুংরির তালিম নিয়েছি।

তাই বলছি, ঠুংরি সম্বন্ধে আমরা সবচেয়ে বেশি জানি। জানার চেয়েও বেশি: ঠুংরির প্রাণশক্তির প্রভাবে আমাদের এ-যুগের সব সঙ্গীতই কমবেশি প্রভাবিত।

এইখানেই ঠুংরি মহীয়সী—এই প্রাণশক্তিতে। শুধু সৌন্দর্যে নয়—মাধুর্যে; লালিত্যে নয়—বৈচিত্র্যে; ভাবাবেশে নয়—সৌকুমার্যে; সর্বোপরি—অভ্রান্ত মিশ্রণ শক্তিতে। নিজেকে নানান্ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বোধ করি ওর জুড়ি নেই। অফুরন্ত ওর উচ্ছলতার, ইঙ্গিতের, সঙ্কেতের ক্ষমতা—কাব্যপরিভাষায় যার নাম ব্যঞ্জনা—সাজেস্টিভনেস্। রূপসৃজনী চাতুরীও এর কারুর চেয়েই কম নয়। ক্ষণে ক্ষণে বদলায়—এই আছে এই নেই—elusive par excellence—বহুরূপী। ধ্রুপদের প্রধান বিশেষণ যদি হয় কঠিন (solid), খেয়ালের যদি হয় তরল (fluid), তবে ঠুংরির চরিত্রলক্ষণ বলা যেতে পারে বায়বীয় (gaseous); তাই জন্যেই তো ওর এত রূপ, বহুধা গতি। খেয়াল যে গতির স্বাধীনতা চেয়েছিল কিন্তু পুরো পায় নি—হয়ত পুরো চায় নি ব'লেই—ঠুংরি তাকে পেল পুরোপুরি।

খেয়াল মুক্তি চেয়েছিল ধ্রুপদের স্থাপত্যবন্ধনী থেকে, তালের ছন্দের অনুশাসন থেকে, কিন্তু রাগসঙ্গীতের "রাগাত্মিকতা" থেকে মুক্তি পায় নি বেশি। ওর এক রাগের তানকর্তবে অন্য রাগের আদল আসে বটে—কিন্তু তবু "রাগাত্মবোধ" খেয়ালের মজ্জাগত না হোক, রক্তে চারিয়ে আছে। রাগভ্রষ্ট ও হয় অনেক সময়েই, কিন্তু সে দায়ে প'ড়ে, চায় ব'লে নয়। কী করবে বেচারি? তান ওর দেওয়াই চাই, নইলে খেয়ালের খেয়ালখুশিই থাকে না, তরলতাই আসে না। কিন্তু তবু ওর বিনিদ্র চেষ্টা—রাগিণী দেবীর তাঁবে না থেকেও তাঁর সেবা করা। এ-স্বপ্নে ও ধ্রুপদের সমধর্মী সন্দেহ নেই। টপ্পাও এবিষয়ে সায় দিল। রাগভ্রষ্ট হ'তে সেও খানিকটা নারাজ বৈ কি।

ঠুংরিই সব প্রথম রাগসঙ্গীতের বিকাশভঙ্গির প্রাণভঙ্গির কাছ থেকে নিল বিদায়। ঠুংরির পূর্ণ সংজ্ঞা এখনো দেওয়া মুস্কিল, কেন না ও এখন পূর্ণযৌবনা হ'লেও প্রবর্ধমানা: কাজেই ওর মধ্যে এখনো কত রকম যে বিকাশ-সম্ভাবনা ঠাহর পাওয়া ভার। তবে মজা এই যে, ইতিমধ্যে ঠুংরিরও একদল গোঁড়া গজিয়ে উঠেছেন যাঁরা বলেন যে, শুধু অমুক অমুক চালেই ঠুংরির ঠুংরিত্ব—নৈলে সে জাতে-ঠেলা, বলেন: ঠুংরির দানা হবে কেবল অমুক অমুক ঢঙের—হয় মৈজুদ্দিনী, নয় করিমী, নয় ফৈয়সী ইত্যাদি। এঁরা এক একটা চালের অনুরাগী হ'য়ে অতি-বিশেষজ্ঞ হ'তে হ'তে উদার দৃষ্টি ফেলেন হারিয়ে। তাই ভুলে যান ঠুংরির অন্তঃপ্রেরণাটি কী। ঠুংরি চেয়েছে: (১) ধ্রুবপদ্ধতির সবরকম নিগড় থেকেই মুক্তি; (২) সব নতুন সঙ্গীতপ্রবণতাকেই আশ্রয় করতে; (৩) সবার সঙ্গে মিলে সঙ্গীতের এক শ্রীক্ষেত্র রচতে যেখানে জাতিভেদের হ'ল প্রাণদণ্ডাজ্ঞা না হোক দ্বীপান্তর তো বটেই। কাজেই ঠুংরির এই-ই হ'ল প্রধান চরিত্রলক্ষণ যে ওর কোনো মার্কা-মারা চরিত্র নেই। এই জন্যেই ঠুংরির ঢং ভজনেও আসতে পারে, কীর্তনেও, গজলেও, খেয়ালেও। আসছেও। আবদুল করিমের খেয়াল যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন তাতে ঠুংরির প্রভাব কতখানি—কর্ণাটী সঙ্গীতের ছিটেফোঁটাও আছে তাঁর খেয়ালে,

কিন্তু ঠুংরির লজ্জৎই বেশি। পক্ষান্তরে খেয়ালের প্রবাহ, ধ্রুপদের গমক, টপ্পার দানা সবই ঠুংরি নিয়েছে, মানে ক্রমশই নিচ্ছে। বাংলাভাষার ষ্টাইলের মতন ঠুংরির ষ্টাইল নিত্যই বদলাচ্ছে। কাজেই ঠুংরির প্রকৃতি সম্বন্ধে যত বড় শাস্ত্রকারই বিধান দিন না কেন যে ঠুংরি এই এই—তাঁর কথা স্বচ্ছন্দে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চ'লে, যেহেতু ঠুংরির গোড়াকার কথাই হ'ল সব রকম শাস্ত্রাচার থেকে ছাড়া-চাওয়া, ছাড়া-পাওয়া, ছাড়া-দেওয়া। একথা বলি না অবশ্য যে ঠুংরির সব রকম পরীক্ষাই সফলতার জয়টীকা পাচ্ছে, তবে একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, ঠুংরির আত্মবিকাশের জন্যে ও যদি সব রকম মিশেল স্বাদ পরখ ক'রে দেখতে চায় তাহ'লে ওর সে আকুতিকে নাকচ করাটাই হবে অযৌক্তিক। কেন না বলেছি ঠুংরির প্রকাশভঙ্গি বস্তুত বায়বীয় —ওকে না যায় ধরা না ছোঁওয়া—এই-ই হ'ল ওর প্রকৃতি। ওকে দেখলে শুনলে মনে হয় ওর মধ্যে সৌন্দর্যও যেমন আছে, দুষ্টুমিও তেম্‌নি—ও যেন একটি লাবণ্যময়ী চিরপলাতকা যে রাগসঙ্গীতের কোনো বিধানদাতাকেই মানে না—তাঁদের শাসনভঙ্গি দেখলে খিলখিলিয়ে হেসে দে ছুট্। পরে যে-ই ওর ধ্রুপদী পিতামহ ভাবছেন বিমনা হ'য়ে: "কী আর করা যাবে? এখন ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে ফেরাই ভালো—" অম্‌নি ও পিছন ফিরে ডাক দেয়—"টু!" দাদামশায় ফিরে দাঁড়ান: "আয় কাছে আয় দুষ্টু মেয়ে!" বড় সুন্দর দেখতে পাগ্‌লি মেয়েটা—পৈতামহিক দাড়িওয়ালারও মন গলে। ওঁর একটু প্রশ্রয় পেয়েছে কি দুষ্টু মেয়েটা হেলে দুলে ছড়া কাটছে:

জারিজুরি তোমার মশাই, খাটবে না কো আর:
মানি তোমার ঋণ, তবুও নই দাসী তোমার।
কান্তি তোমার দিব্যি—মানি, শান্তি সমুচ্ছলে:
সিন্ধু-গমক রাগে তোমার পাষাণ-প্রাণও গলে:
তবু, শোনো—তোমায় প্রভু মানব না আর আমি:
বাঁদী তোমার যে হয় সে হোক্—আমায় ছাড়ো স্বামী!

আমার দেখা পাবে না আর রাগ-মন্দির তলে :
শয্যা আমার—কুঞ্জে, মাঠে, বনে, নদীর জলে।
সমাহিতির নই বিরোধী, তারেও ভালোবাসি,
চঞ্চল আমি, তাই ব'লে কি সব সময়েই হাসি ?
ব্যথার মালায় বরণ-ডালা সাঁঝে সাজাই আমি,
আবার ভোরে সোনার উলু দেই—জানো কি স্বামী ?

সৌম্য তুমি ? মানি ধীরাজ, তাই তো প্রণাম করি,
কেবল সেটা দূর থেকে—না শোনো, আহা মরি,
ফিরিও না মুখ, সত্যি তোমার জম্‌কালো সুর-শোভার
ভক্ত আমি : সত্যি উঠি শিউরে ঠাকুর, তোমার
রাগ-মৃদঙ্গে তাল-তরঙ্গে—তবুও এসব আমি
চাই না আমার আরাধনায়, হে সংযমের স্বামী !

অমনি হ'ল মান ? না শোনো, আজ নয় তর্জনা,
সরল শপথ ক'রে বলি—তপসের অর্চনা
আমিও চাই থেকে থেকে—হ'লামই নয় নারী :
তাই ব'লে কি পৌরুষেরে বিদায় দিতে পারি ?
আমার মাঝেও আছ তুমি, তোমার মাঝেও আমি :
তবু আমার বিকাশধারা নয় তো তোমার স্বামী !

বিশাল ! তোমার উদার-জ্যোতি হিমাদ্রি-রঞ্জনা
গগন-বিথার শুভ্র-পাষাণ স্থাপত্য-মূর্ছনা,
মন্দ্র-মেদুর ধ্যান-উদাত্ত সিন্ধু-শ্যামল আশা
কার বুকে না জাগায় গভীর প্রশান্তি-পিপাসা ?
তোমার ঢেউয়ে প্রাণ না ভরে কার ? তবুও আমি
ও-কলরোল চাই না আমার বীণবাহারে স্বামী !

আমার চিত্ত গতির নৃত্য চায় কাকলি-নদে,
পাখির ভাষে, শিশুর হাসে, সোনার-স্বপ্ন-হ্রদে :
যেথায় যত স্থর উদ্বেল—সবার আমি সখী,
ফুল-নূপুরে রূপ-মুকুরে আপনারে নিরখি—
তানের গেহে মিড়ের স্নেহে জ্বালাই বাতি আমি :
তবু বলি—তোমার ভাতি নয় তো আমার স্বামী !

প্রতি মধুর চরণতালে বাজে আমার তাল,
নেই কুণ্ঠার আব্রু—যদিও ছায়ার অন্তরাল
মানি আমি—সেই ছলে যে ফুটাই আলোর ঢঙ :
স্বভাব কলকণ্ঠী আমি—স্থরে ঝরাই রঙ।
সংহতি মোর নয় কামনা, নই তাপসী আমি :
তাই যোগিবর, তোমায় নমি দূরে থেকেই স্বামী !

দীপ্তি আমার নিত্য যাচে ভাষার উচ্ছলতা
গানের পাথায় চির-উধাও আমার প্রাণের কথা।
বাণীর গলে পরাই মালা গন্ধের মন জিনি
অছন্দেও ছন্দ দোলাই আমি—মায়াবিনী।
ভাবের চেয়ে রূপবিলাসেই গা ঢেলে দেই আমি,
তাই হে ভাবুক, তোমার আদর চাই না ধ্যানী স্বামী !

রাগ কোরো না—তবু তোমায় সত্যি ভালোবাসি,
তোমার কাছে ঢের পেয়েছি, তাই না কাছে আসি :
তাই না হৃদয়-দুয়ার খুলি তোমার তরে নিতি :
তোমার বিরাগভাজন হ'য়েও তোমায় শোনাই গীতি—
যদি তোমার মন গলে, হায় মিথ্যা আশা—আমি
জানি, তবু চাই তোমারেই গান শোনাতে স্বামী !

চাই কেন ? তা জানো না কি ?—তোমারি কল্লোলে
আমার লাজুক তটে আজো পুলক যে উচ্ছলে।
তোমার ঢেউয়ের নীলিম স্বপন কাঁপে আমার বুকেই,
যতই কেন রাগ করো না—ভুলি তোমার সুখেই।
তোমার রাগের রঙেই মজাই সুররসিকে আমি :
তবু তোমার রাগিণী-ঢঙ নয় তো আমার স্বামী !

কেমন ক'রে হ'বে ? —আমি স্বভাব-যাযাবরা :
যেথাই লভি আদর—প্রেমে হই যে কলস্বরা।
সাগর-পারের বঁধুও যদি আসে আমার কাছে
সুরের সোহাগ চায় মিলাতে—অন্তর আমার নাচে।
নিষ্ঠা আমার নয়ক ব্রত, সবার বধূ আমি :
বিদেশীরেও বিলাই আমার মর্ম্মমধু স্বামী !

রাতের ইমন গাই দিবসে, ভোরাই তোড়ি রাতে,
বেহাগ সাথে মেশাই ললিত, ভৈরোঁ পুরিয়াতে,
তিনের তালে চারের কদম আনতে তুষ্ট, মেয়ে
চাই নিয়তই—সাতের খেয়ায় পাঁচের ছন্দ বেয়ে।
খরজ ? তারও রাশ না মেনে সরাই নিতুই আমি :
ভুল বুঝবে সবাই জেনেও ডরাই না, ধীর স্বামী !

তোমায় প্রণাম করি, তোমার ঋণের কথাও জানি,
কেবল তারে শুধতে হবে এই কথা না মানি।
যা কিছু পাই রাঙিয়ে খাটাই আমার অরুণিমায় :
উষরেও করি সরস মলয়-মধুরিমায়।
হে সনাতন, তোমারেও নবীনঃকরি আমি :
নৃত্যগীতির ডোরে বাঁধি ধূলায় তারায়, স্বামী !

দেশী-সঙ্গীত

(কাব্য সঙ্গীত)

সঙ্গীতদর্পণম্ :

তত্তদ্দেশস্থয়া রীত্যা যস্যা লোকানুরঞ্জনম্
দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে

দেশে দেশে যেই গীতি
নব নব রূপ রীতি
　　নব নব সুরে সমুচ্ছলে—
সহজে ভুলায় মন
ভালোবাসে বিশ্বজন
　　তারি নাম "দেশী" ধরাতলে

BEETHOVEN :

Vom Herzen . . . . zu Herzen.

হৃদয় হ'তে উথলি' গান
হৃদয়ে করে মাল্যদান।

ROMAIN ROLLAND :

La première vertu du génie, c'est la sincérité.

—*Musiciens D'Aujourd'hui*

প্রতিভার প্রথম কথা—আন্তরিকতা।

WALT WHITMAN :

I sing the Modern Man . . . .
Each of us is inevitable.

আজি প্রতি কণ্ঠের তূর্যে বাজিবে শুধু আজিকার গান
শুধু আপন সূর্যে প্রতি প্রাণ-উষা ঝলিবে মন্ত্রমান্।

উৎসর্গ

৺শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার গীতিরাজ-উদ্দেশে—

বাংলা ফুলের প্রাণ-মুকুলের আশাটি মধুরিমায়
জাদুকর, তুমি তুলিলে কুসুমি' রূপে রঙে নব নব।
নিশীথ-বেদনা লভিল চেতনা প্রতিভা-অরুণিমায়।
বাণী অনাদৃতা হ'ল বন্দিতা পাপিয়া-কণ্ঠে তব।

রবি-মূর্ছনে কবিতা-কাননে জাগালে গরবী-গীতি।
বিছালে নবীন আলোক অচিন—চিন্ময় ঝুলনায়:
কথার বাসরে সুরের আদরে তব আবাহন-প্রীতি
ছন্দ-কমল গাঁথিল উছল রূপালি-রাগমালায়।

ধ্বনি ও বাণীর শুভদৃষ্টির আভাষে ঝরালে গানে
এ কী নিরুপমা বিরল সুষমা—যুগলের অভিযানে!

নববর্ষ ১৯৩৮

উৎসর্গ

শ্রীমান্ কুমার শচীন্দ্র দেব বর্মণ !

বাংলা গানেরে বেসেছ যে ভালো, তাই তো তোমারে ভালোবাসি,
তোমার গগন হ'তে সে গানের গঙ্গা ঝরাক আলোবাঁশি :
সে-মুরলী হোক প্রেমের পরশমণি, করি' হেম গানে তোমার—
কবিতা-কুসুম মঞ্জরি' কলকণ্ঠ-মলয়-দানে তোমার।

শ্রীমতী হাসি !

ডঙ্কা-রোলে চম্‌কে তোলা—নয়ক তেমন শক্ত সে,
আস্ফালনের টঙ্কারে রয় উন্মাদনায় মত্ত যে—
নয় সে জেনো দর্‌দী গুণী, নয় জহুরী, নয় প্রেমিক :
সুরসুষমার প্রেমকণিকায় মজল যে—সে-ই ঠিক রসিক।

গানদীপালি যেম্‌নি জলে প্রাণসোনালি জাল বুনে—
ফলে ফুলে ছায় জীবনের তৃষ্ণা-মরু ফাল্গুনে।
তোমার সাধের মলয়তানের কুসুমনিঝর-ঝঙ্কারে
কাঁপত যখন মৌন লগন—বেসুর কাঁটাপন্থারে
মায়ার ম'ত মনে হ'ত, স্বপ্নফসল ফলত যে !
মিটত আশা : আলোর ভাষা ও-কণ্ঠে বোন্ ঢলত যে!

নববর্ষ ১৯৩৮

গানের উদ্বোধন

(আবাহন)

তরল হাস্য-তটিনী ! বিবাগী ফেনক্রন্দিত সিন্ধু !
ফুলদল-আঁখি-পল্লবে দোলে যে-অশ্রুমণি-বিন্দু !
চির-যাযাবর পথহারা ওগো উদাসী পবন পান্থ !
আধকল-উচ্ছল-জলধনু-রঙিন কবিতা কান্ত !
পুষ্পপর্ণা গীতালি ! উর্মি—নীলিম-ধ্যানে-অতন্দ্র !
দ্যুতিকিরীটিনী রাগমালা—শতরেশে-ঝঙ্কার-মন্দ্র !
পিঙ্গল-বিদ্যুত-খর্পর ! রক্ত উদয়াদিত্য !
সুধাকৌমুদী—নিঝরে যার বন্ধ্যা মরুও স্নিগ্ধ !—
আমার তৃষ্ণাসৈকতে ঢালো মলয়ের লীলানন্দে
কিরণ-কাকলি—প্রণয়ানম্র গগন-মিলনী মন্ত্রে।
ঐ বাজে বাজে লক্ষ লাস্যে রূপের রাগমৃদঙ্গে :
"বহুবাঞ্ছিত সঙ্গীতলোক এলো অনন্তভঙ্গে—
বহ্নি যেথায় ভস্মচিতায় মাগে না মূর্চ্ছালুপ্তি :
ছায়াবন্ধনগ্লানি হ'তে আলো পেল যেথা মহামুক্তি :
অন্তর যেথা বুল্‌বুলে লভি' রূপান্তর—বসন্তে
ব্যোমচারণের উধাও-কাহিনী গায় সুন্দর ছন্দে
ললিত পুলকে—সে-কলকণ্ঠে জাগায়ে হিমঘুমস্ত
পাষাণে নলিনী-মুরলী : সন্ধ্যা যুগান্তরী-সুগন্ধ
ঝরায়—হৃদয়-নিভৃতে ঘনায়ে তারকা-নিভৃত স্বপ্ন—
বরে যার ধ্বনিধূমের প্রহরে রাঙে বন্দনালগ্ন :
চির ঝন্‌ঝনা শৃঙ্খলে ছায় প্রেমকিঙ্কিণি-শান্তি :
অন্ধকারের কাঁটাকান্তার মনে হয় মায়া-ভ্রান্তি।"

Rise of Song

(Invocation)

O river of liquid laughter,
    ocean of sobbing foam!
O pearl-dew-eyelashed petals,
    errant winds that sighing roam!
O rainbow lisp of lyric,
    flower-pinioned melodies!
O sleepless blue-tranced billows,
    gleam-crested symphonies!
O purple dagger of lightning,
    scarlet tingle of sun!
O alchemy of moonbeam,
    in my wistful sands be one
Spring-carnival of song-shine
    plenished by the bendsome sky,
Hark, million-rhythmed beauty drums:
    "The Promised Haven is nigh—
Where fires swoon not in ashes,
    nor shadows outrage light,
And soul changed to a bulbul, warbles
    of her flawless flight
In dulcet ecstasies, kindling
    the slumberous stone aflower
With apocalypse of fragrance
    in eve's silence-dripping hour :
When the heart-hush, drunk with star-hush,
    makes tumults break to hymns,
And chains become love's anklets :
    the last trail of gloom dislimns."

১২
কষ্টিপাথর

প্রথম ভাগে ঠুংরিকে যে মার্গসঙ্গীতের জাতিচিহ্নিত করা হ'ল তাতে ধ্রুপদখেয়ালীরা আপত্তি করতে পারেন এই ব'লে যে, সংস্কৃত সঙ্গীত-কোবিদদের সংজ্ঞা মানলে ঠুংরি মার্গসঙ্গীত নয় দুটি কারণে: প্রথম, পাঁচমিশেলি হ'য়ে ফুটে-ওঠাই হ'ল ওর স্বভাব এবং অভিব্যক্তির মূল ধারা; দ্বিতীয়, ও সহজে ভুলায় মন তো বটেই। কিন্তু তবু ঠুংরিকে মার্গসঙ্গীতের শ্রেণীতে ভর্তি করাই সঙ্গত অনুরূপ দুটি কারণে—যদিও ওকে দেশীসঙ্গীতের কোঠায় ফেললেও অগৌরবে ওর মাথা হেঁট হবে না। নামে কী আসে যায়? তবু একটা বিধিনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে শ্রেণীসম্বদ্ধ করার সুবিধা যথেষ্ট: তাই ঠুংরিকে "দেশী" জাতীয় না বলাই ভালো। কেন—বলি: বলার একটু প্রয়োজন আছে।

প্রথম কারণ: আমাদের মার্গসঙ্গীতের একটা মস্ত কথা হ'ল এই যে, ওস্তাদ সুরশিল্পী—পার্ফর্মার—প্রতি পদে নব নব সুরজাল সৃষ্টি ক'রে থাকেন—শ্রোতাও তাঁর কাছে এ-প্রত্যাশা রাখে। ধ্রুপদী আমলে এ-স্বাধীনতার সীমা টানা হ'ত ছন্দের হেলাদোলা চলাফেরায়—বাঁট দূন চৌদূন আড়ি কুআড়ি আঘাত অনাঘাত প্রভৃতি গতিভঙ্গির লাস্যলীলায়; তারপর খেয়ালটপ্পার আমলে এল তান ও সুরের ফুলঝুরি, রংমশাল, তুবড়িবাজি। তখন থেকে সুরশিল্পীরা সুরকারকে—কম্পোজারকে—লঙ্ঘন ক'রেই এক ধরণের সুরস্রষ্টার শিরোপা পেয়ে আসছেন বৈ কি। চল্‌তি দেশীসঙ্গীতের ওরফে লোকসঙ্গীতের কাঠামোয় এতরকম সুরতালের চালচিত্র রঙচঙের জারিজুরি বড় বেশি চলে না—রঙ রাঙতা চড়ালেও রূপের খুব বেশি খোল্‌তাই হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এখানে মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে চল্‌তি দেশীসঙ্গীতের ভেদ মূলগত—ফাণ্ডামেণ্টাল—যেহেতু এখানে মূল দৃষ্টিভঙ্গি তথা গঠনকারু নিয়েই

টানাটানি। এ-মাপকাঠিতে মাপলে ঠুংরি নিশ্চয়ই মার্গসঙ্গীতের কোঠায়ই পড়বে—যেহেতু স্বরলীলায় ও হ'ল স্বৈরচারিণী।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাঁচমিশেলি হ'তে চেয়ে এ-স্বেচ্ছাবিহারিণী মার্গসঙ্গীতের রক্তবিশুদ্ধিকে অস্বীকার করলেও মার্গসঙ্গীতেরই ও অঙ্গজা তো। ওর চলনবলনে সাবেকি আভিজাত্য নেই বটে, কিন্তু তবু ওর শিরায় শিরায় এখনো রাগসঙ্গীতের রক্ত প্রবহমান। একথা সত্য যে হাল আমলে সাগরপারের কল্লোলে ওর সনাতনী রক্তে বৈদেশিকী বান ডাকতে স্বরু করেছে—আলাউদ্দিন তিমিরবরণের অর্কেষ্টায়, ৺অতুলপ্রসাদের গানে, হিমাংশু দত্তের নানা স্বরযোগে আরো রকমারি চূর্ণস্বরের ঢেউয়ে: তবু ওর জাত যাব-যাব হ'লেও একেবারে যায় নি এখনো। বিশেষ ক'রে অতুলপ্রসাদের ঠুংরির রস উপভোগ করবার সময়ে একথা বেশি ক'রেই মনে হয়। সবাই জানেন ও মানেন যে, বাংলা গানে পশ্চিমে ঠুংরির চাল আমদানি ক'রে অতুলপ্রসাদ বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে তাঁর বাংলা গানে বাংলা মাটির গন্ধ, বিদেশী স্বরভঙ্গির উজ্জ্বলতা ও হিন্দুস্থানি খাস মুসলমানি ঠুংরির লজ্জৎ একেবারে মিশে রয়েছে—অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে। কিন্তু তবু তাঁর ঠুংরিও ঠুংরি হিসেবে নিকষ-কুলীন না হ'লেও ভঙ্গ-কুলীন সন্দেহ নেই। তিমিরবরণের নানান্ ওজস্বী নৃত্যসঙ্গত কিম্বা হিমাংশু দত্তের নানা নবভঙ্গিম বৈদেশিক-ভঙ্গি ঠুংরির সঙ্গে তুলনা করলে এ-সত্যটি আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। অবশ্য একথা অনেকটা অকুতোভয়েই বলা যায় যে ঠুংরির বদল হচ্ছে খুবই দ্রুত লয়ে—স্থতরাং অদূর ভবিষ্যতে খোল নলচের বদল হ'য়ে ওর হয়ত Bottom-thou-art-translated গোছের জন্মান্তরলাভ তথা কৈবল্যপ্রাপ্তি হবে; কিন্তু সেটা যতদিন না হচ্ছে—যতদিন মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে ওর এখনকার-মতন নাড়ির যোগ ও প্রাণের টান বজায় থাকছে ততদিন—ওকে মার্গসঙ্গীতবর্গীয় বলাই যুক্তিযুক্ত।

এখানে স্বতই প্রশ্ন ওঠে: দেশীসঙ্গীতের যথার্থ প্রকৃতি ও অভিজ্ঞানটি কী? আমাদের দেশে এ-সঙ্গীতের নাম উঠতেই সঙ্গীতকোবিদগণ

ঈষৎ নাসিকাকুঞ্চনের মতনই একটা ভঙ্গি—জেস্‌চার—ক'রে এসেছেন বরাবর। ভাবখানা—"দেশে দেশে জনানাং হৃদয়রঞ্জকম্": কি না, যে-যাযাবর পাঁচজনের চিত্তরঞ্জক সুর দেশে দেশে ফেরি ক'রে বেড়ায় তারই নাম দেশীসঙ্গীত—এহেন পসারী—বাকিটা উহ্য রাখলেও চলে না কি?

বলা বাহুল্য এ-ধরণের অবজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত নয়। মার্গসঙ্গীতের মহত্ত্ব স্বীকার ক'রেও "হৃদয়রঞ্জক" মিষ্টসুরে সাড়া দিলে তাতে ক'রে ভাগবত অশুদ্ধ হয় না মোটেই। তবে হয় কি, মার্গসঙ্গীতের মহান্ বিকাশে ও সুরৈশ্বর্যে যাঁরা মুগ্ধ তাঁদের দেশীসঙ্গীত তেমন ভালো লাগে না। অভ্যাস মানুষকে অনেক সময়েই চায় তারই তাঁবে রাখতে একথা কে না জানে? কিন্তু দরদী যে, তার থাকে এমন এক সহজাত কল্পনা ও স্বাভাবিক প্রেম যে সে অভ্যাস তো কোন্ ছার—মূলাধার প্রকৃতিকে লঙ্ঘন ক'রেও অনভ্যস্ত রসের উৎকর্ষে সাড়া দিতে পারে। সুতরাং দেশীসঙ্গীতে সাড়া দেওয়ায় লজ্জার কথা কিছু নেই বললেও যথেষ্ট বলা হ'ল না: বলা চলে দেশীসঙ্গীতেও সৃষ্টি যখন সুন্দর হয় তখন তাতে সাড়া দিতে না পারাটাই হ'ল লজ্জার কথা।

একথা এত ক'রে বলছি এই জন্যে যে, দেশীসঙ্গীত মার্গসঙ্গীত নয় ব'লেই যে তার হীনতা স্বতঃসিদ্ধ এটা অনেকে নির্বিচারেই মেনে নিয়ে থাকেন। গোঁড়ামির আস্তানা এই গতানুগতিক মনোভাবেই। কল্পনা যেখানে উদার, সেখানে প্রেমের কানে তার ডাক পৌঁছয়—সে আসে ওর রুচিবিকাশের সহায় হ'তে, পথচলায় বাতি ধরতে। বড় ক্রিটিক বড় রসজ্ঞ তিনিই—যিনি ব্যক্তিগত পক্ষপাত লক্ষ্য ক'রেও, এমন কি যা তাঁর ভালো লাগে না তার মধ্যেও রসসম্পদ স্বীকার করতে পারেন, দৃশ্যত যে সামান্য তার মধ্যেও তাঁর প্রেমের দিব্যদৃষ্টিতে অসামান্যতা দেখতে সক্ষম হন। দেশীসঙ্গীতের মহিমা বিচার করতে হ'লে মার্গসঙ্গীতের রুচিগত পক্ষপাত থেকে সব আগে মুক্তি চাইতে হবে। একথা আমাদের রাগজ্ঞরা ভুলে যেতে অত্যন্ত ভালোবাসেন ব'লেই তাঁদের মালবিকাগ্নিমিত্রমের বিষ্কম্ভক বার বার মনে করিয়ে

দেওয়া কর্ত্তব্য। পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে যখন বললেন : "প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং বহুমানঃ?"—"ধিক্, ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদির সনাতন কাব্য ছেড়ে আধুনিক কবি কালিদাসের নাটকের আদর!"—তখন কবি কালিদাস উত্তর দিয়েছিলেন (সূত্রধারের জবানিতে) :

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

ও ভাই প্রবীণ! জানবে কবে—যা-ই কিছু হয় পুরাতন
নয় মহীয়ান্, যা-কিছু হয় নতুন—সবই মন্দ নয়।
বিজ্ঞজনে পরখ ক'রেই মূল্য করেন নির্ধারণ,
পরের মুখে ঝাল খায় যে সে-ই কি বুদ্ধিমন্ত হয়?

অথ; দেশীসঙ্গীতের গৌরচন্দ্রিকার সমাপ্তি টেনে এবার মূল গানাধ্যায়ে আসার সময় হ'ল। হিন্দুস্থানি দেশীসঙ্গীতের সভায় সেরা সভ্যকে নিয়েই মঙ্গলাচরণ সুরু হোক : গজল।

১৩

গজল

গজল গান গাওয়া হ'ত প্রথম পারস্য দেশে। বলা বাহুল্য ইরাণীরা গজল গাইতেন পার্সি ভাষায়। ওর বিষয়—প্রণয়সঙ্গীত। ওকে তাই বিশেষ ক'রেই বলা চলে কাব্যসঙ্গীত। কারণ, কাব্যের কেন্দ্ররসটিই ওর সুরে তানে কুসুমিত, পল্লবিত, মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে। পারস্যবিৎরা বলেন ভাবের দিক দিয়ে গজলকে নাকি হ'তে হয় দ্ব্যর্থক : অর্থাৎ সাধক যদি চান ওর মধ্যে পাবেন পারমার্থিক ব্যঞ্জনা, আবার প্রণয়ী যদি চান ওর মধ্যে পাবেন নরনারীর প্রেমব্যঞ্জনা। এমন ব্যবস্থা কেন হ'ল সেটা বুঝতে হলে যেতে হবে ওর সুফী ভাব-গঙ্গোত্রীতে।

পার্সি ভাষা আমি জানি না—কিন্তু ছন্দ হিসাবে এ-ভাষার কিছু কিছু ধ্বনি-চর্চা করতে হয়েছিল। তাই এ-ভাষার বর্ণপরিচয় না হওয়া সত্ত্বেও এর ধ্বনিলালিত্যে মুগ্ধ হবার স্থযোগ কিছু পেয়েছিলাম। ফলে পার্সিভাষার ছন্দসৌকর্য তথা ঝঙ্কারসম্পদের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তাছাড়া স্থফীভাবধারা অত্যন্ত মুগ্ধকরী। কাজেই পারস্থকাব্য সম্বন্ধে সাধ্যমত একটু আধটু খবর রাখতে হয়েছিল—আরো ঐ গজলের দরুণই। তাই অনুভবে জানি যে, পার্সিভাষা না বুঝলেও গজল আবৃত্তি ক'রে ও গেয়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায় ওর আবহে, ধ্বনিতে, মনোহর ঝঙ্কারে। বিশ্ববরেণ্য সাধক কবি জলালউদ্দিন রুমি ও প্রেমিক কবি হাফেজের কথা সব আগে মনে পড়ে—ওমর খৈয়মের রুবায়েৎ-এর নামডাক যথেষ্ট হ'লেও কবি হিসেবে তিনি এঁদের কাছেও আসতে পারেন না। রুমি স্থফীদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কবি ব'লেই খ্যাত। পারস্থবিৎ ডেভিস সাহেব এঁকে বলেছেন "the wisest of the Persian Sufis." ত্রয়োদশ শতকে এঁর জন্ম—মৌলবী দরবেশ সম্প্রদায়ের ইনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। এঁর কাব্যপ্রতিভার এমন অজস্রতা ছিল যে মুখে মুখেই কবিতা রচনা করতেন। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার শের ওরফে শ্লোক তিনি এইভাবেই ব'লে গেছেন আর তাঁর শিষ্য হুসামউদ্দিন লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। এ-শ্লোকভঙ্গি থেকে গজলের ভঙ্গির কিছু আভাষ মিলবে ব'লে উদ্ধৃত করছি জন্মান্তর-সম্বন্ধে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত লাইন ক'টি। অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে এ অপূর্ব পারস্থ কবিতাটি: (জ়=z, র়=w, ক়=guttural ক, খ়=guttural খ, গ=guttural গ, ফ=f)

অজ় জমাদি মুর্দমী র় নামী শুদম্
রজ়্ নুমা মুর্দম্ ব হায়র়াঁ সর় জ়দম্
মুর্দম্ অজ়্ হয়র়ানি র় আদম্ শুদম্
পস্ চে তর্সম্ কে অজ়্ মুর্দম্ গুম্ শুদম্

হামিলে দীগর জমুর্দম্ অজ্ বশর্
তা বেরারম্ অজ্ মলায়ক্ বালোঁ পর্
বারে দীগর্ অজ্ মলায়ক্ পররাঁ শরম্।
অঞ্চি অন্দর রহম্ ন আয়দ্ আন্ শরম্।

ভাবানুবাদ :

ধাতুর জীবন ত্যজিয়া জাগিনু সবুজ-জীবন-যাত্রায়,
সে-শ্যাম-কান্তি ছাড়ি' বিহঙ্গ-জীবনে জনম মিলেছে,
লভিনু চেতন ধীরে ধীরে নর-জীবনের প্রেম-বার্তায় :
তবে কেন ডরি ?—মৃত্যু বিকাশে কবে মোর বাধা দিয়েছে ?

তবু আরবার এ-মোর ধন্য মানবের দেহ-মরণে
হব দেবদূত-সাথী : পরে যাব তারো সীমান্ত তরিয়া
আমি অনন্ত-উধাও পান্থ—চিরন্তনের চরণে
আপনা হারায়ে হব চিন্ময় অচিন্ত্য লীলা বরিয়া।

এই ধরণের শ্লোকভঙ্গিতে গীতিরচনাই হ'ল গজলের গঠনভঙ্গি : অর্থাৎ দুটি দুটি ক'রে চরণে এক একটি মনোভাবের বা আইডিয়ার ছবি পূরো ফোটাতে হবে। উদাহরণত হাফেজের দুটি বিখ্যাত গজল উদ্ধৃত করি।

প্রথম নেওয়া যাক্ তাঁর সমরকন্দ বুখায়রা দিয়ে দানসাগর হবার কল্পনারঙিন বিখ্যাত গজলটি। কেবল একটা কথা : এগুলির রসোপভোগের সময়ে মনে রাখতে হবে যে, গজলে পারস্য কবিরা একটা ভাবের পূর্বাপরতা চান নি—চেয়েছিলেন টুকরো টুকরো সুন্দর অনুভবের নানারঙা অক্ষ নিয়ে গানের বিচিত্র মালা গাঁথতে। হাফেজের গানটি এ-শ্রেণীর সুন্দর গজলের চমৎকার নমুনা—ছন্দে মিলে ঝঙ্কারে চিত্রশিল্পে কাব্যরসে। ছন্দটির ইরাণি নাম "হজজ"। এ হ'ল সপ্তমাত্রিক ছন্দ। একে কেউ কেউ

। ॥ ॥ ॥ । ॥ ॥ ॥
অগর্ অন্ তুর্ কি শীরাজী

এইভাবে পড়েন। কিন্তু এর তেরছ চাহনি ঠিকমতন পেতে হ'লে একে পড়া চাই অগর্ অন্ তুর্ কি শীরা জী ; অনুবাদটিতেও আমি এইভাবেই পর্বভাগ করেছি, মানে প্রস্বন দিয়েছি, তাই এ-কথার উল্লেখ করলাম। কেন এভাবে প্রস্বন দিলে "হজ্জ" ছন্দের গৌরব বাড়ে সে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পাঠক-পাঠিকাদের ধৈর্যচ্যুতি হবেই—তাই শুধু ব'লে রাখি যে সংস্কৃত তথা পারস্য ছন্দের দীর্ঘস্বরকে সত্যেন্দ্রনাথ যে-ভাবে (দ্বিমাত্রিক) যুগ্মধ্বনিতে তর্জমা করেছিলেন আমিও সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছি—স্বরমাত্রিক ভঙ্গিতে—কেন না তাতে ক'রেই এ-ছন্দের স্বকীয় দোলাটি সবচেয়ে অনবদ্য হ'য়ে ফুটে ওঠে। সংস্কৃত দ্বিমাত্রিক গুরু স্বর আনতে পারলে এ-ছন্দের কল্লোল বাড়ত—কিন্তু তাহ'লে অনুবাদকে অত্যন্ত বেশি স্বাধীন করতে হ'ত। মরুক এ-কচায়ন—হাফেজের সুললিত কাব্যসঙ্গীতের মধুর তাল ও ছন্দ বাঙালি কাব্য ও ছন্দজ্ঞদের সামনে ধরি—মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি। লঘুগুরু উচ্চারণ মেনে সপ্তমাত্রিক তালে একটানা প'ড়ে গেলে এর ঝঙ্কারে ও ধ্বনিতে ছন্দজ্ঞরা আনন্দ পাবেনই পাবেন—ভাষা না জানলেও :

অগর্ অন্ তুর্কি শীরাজী
বদস্ত্ আরদ্ দিলেমারা।
বখালে হিন্দুঅশ্ বখ্শম্
সমর্কন্দ্ ও বুখারারা॥

জ ইস্কে না তমামে মা
জমালে যার মুস্তগ্ নিস্ত্।
ব আবো রঙ্গ খালো খৎ
চ হাজিৎ রুই জেবারা॥

হদিস্ অজ্ মুৎরিবো ময়্ গৃ
ররাজে দহর্ কম্তর্জ্।

কিকস্ নকশদ্ ব নক্কাশয়দ্
বহিক্‌মৎ ইন্মইম্মারা ॥
গজল্‌গুফ্‌তী ব দুর্ শুফ্‌তী
বিয়া ও খুশ্‌বখাঁ হাফিজ্ ।
কিকব্ নজ্‌মে ত' অফ্‌শানদ্
ফলক্ অক্‌দে স্থরৈয়ারা ॥

ভাবানুবাদ :

আমার সেই অন্তরের কান্তা
মিলন তার চায় উছল মোর প্রাণ :
তিলের তার করতে তর্পণ দেই
সমর্কন্দ আর বুখায়রায় দান ।
রূপের তার করবে বন্দন কে ?
আমার প্রেম—তার কোথায় সম্বল ?
আনন যার অপ্সরায় দেয় লাজ—
কে দেয় তায় সাজ-ভূষণ-সম্মান ?
হৃদয়, গাও গান—অঝোর-ঝঙ্কার :
কে পায় সৃষ্টির রহস্যের তল ?
জ্ঞানের দীপ জ্বালতে চাও ? হায় রে,
আলোয় তার মিলবে কোন্ সন্ধান ?
হাফেজ, আজ গাঁথলে মুক্তার হার—
গজল মঞ্জুল ঝরুক কণ্ঠে :
গগন-নক্ষত্র নীলছন্দে
বিছাও সুর-নন্দনের ফুলতান ।

এ-গানটির সম্বন্ধে একটি মজার গল্পের চল আছে পারস্যসম্রাট শাহান্‌শাহ তৈমুর্লঙ্গকে নিয়ে ।

"কে আ—আছিস্ ? আন্ বেঁধে হা—হাফেজ বেয়াদবে !"
গজল শুনেই তৈমুর্লঙ্গ হাঁকেন অট্টরবে ।

হেসে হাফেজ করেন সেলাম—গর্জে ওঠেন বীর :
"চো—চোপ্‌রাও—আস্পর্ধা !—নে—নেব তোর শির ।
আমার সমর্কন্দ বুখারা তুই দিস্‌ দান ক'রে
তোর সা—সাকির গা—গা—গালের একটি তিলের তরে !"
বলেন হাফেজ করজোড়ে : "দোহাই জাঁহাপনা,
সমঝে দেখুন—যার যা স্বভাব—তাই করি কল্পনা
দিল্‌দরিয়া শাহান্‌শাহে । আজ ব'লেও নয় :
ছিলাম ধনী—রাজার মতন দানের দিগ্বিজয়
করতে ঘোষণ হ'লাম ফতুর—তাই তো শূন্য হাতে
দানব্রতী কবি হাজির সভায় সুপ্রভাতে ।"
শাহান্‌শাহ হাসেন : "গজল গা—গাও—আছিস কে রে ?
বেকুফ কবিটাকে লা—লাখ্‌ মোহর এনে দেরে ।"

হাফেজ প্রমুখ সুফী কবিদের মধ্যে রসের রসিকতার উচ্ছলতা ছিল ব'লেই হাফেজ সম্বন্ধে এ-প্রসিদ্ধ গল্পটির উল্লেখ করলাম। আধ্যাত্মিক কাব্যেও তাঁরা যে গুরুগম্ভীরতা চাইতেন না তা এই কারণেই। তাঁর বিশ্ববিশ্রুত তাজ়াবতাজ়া নওবনও—গানটিতেও সুফী হৃদয়ের এই সরসতার পরিচয় মেলে ছত্রে ছত্রে :

মুৎরিবে খুষ্‌নভা বেগু তাজ়াবতাজ়া নওবনও ।
বাদয়ে দিল্‌কুষা বেজু তাজ়াবতাজ়া নওবনও ॥
বাসনমি চো বেঅতি খুষ্‌বেনশীন্‌ বখিল্‌ রতি ।
বোসাসতাঁ বকাম অজ়্‌ তাজ়াবতাজ়া নওবনও ॥
সাকীয়ে সীম্‌ সাকেমন্‌ নীস্ত্‌ ময়ম্‌ বয়ার্‌ পীশ্‌ ।
জ়্‌দকে পুর্‌ কুনম্‌ সুবু তাজ়াবতাজ়া নওবনও ॥
শাহেদে দিল্‌রুবায় মন্‌ মীকুনদ্‌ অজ়্‌ বরায় মন্‌ ।
নক্‌শো নিগারো রঙ্গ বু তাজ়াবতাজ়া নওবনও ॥
বাদেসবা চো বেকৃজ়রি বর্সরে কুই আন্‌পরি ।
কিস্‌সয়ে হাফিজ়শ্‌ বেগু তাজ়াবতাজ়া নওবনও ॥

ভাবানুবাদ :

তোমার কলকণ্ঠে গুণী, যেন শুনি নিতুই নব গান।
ঢালো তোমার নিতুই নব রঙিন সুধা—উছল করো প্রাণ।
প্রিয়ের করে আপ্‌নারে দাও সঁপি'—পরে নিকুঞ্জে নিরালে
লও চেয়ে তার নিতুই নব শিহরভরা চুমন-বরদান।
লো অমিয়া সাকি প্রিয়া! ফুরায় স্বপন—প্রেমের পেয়ালায়
ঢালো নিতুই নব বিভোর আবেশ অঝোর—নেই যার অবসান।
মনমোহিনী বিনোদিনী! আমার তরে আঁকলে কতই ছবি
রূপে রেখায় গন্ধে রঙে—বইয়ে নিতুই নব রসের বান।
অরুণ-সমীর! যাও আজ আমার রাগের রাণী অপ্সরী-নিধান :
বোলো—হাফেজ তার সুবাসেই রচে নিতুই নব ফুলের তান।

পাশ্চাত্য পারস্যবিৎরা অনেকে বলেন, এ-ধরণের গানে হাফেজ কোনো পারমার্থিক ভাবই ফোটাতে চান নি, কিন্তু ইরাণীরা বলেন —হাফেজ এই ধরণের মানবপ্রেমকে ঐশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে না দেখে থাকতেই পারতেন না। এ নিয়ে বাদবিতণ্ডা বন্ধ্যা— কাব্যে যাঁরা রূপক খোঁজেন তাঁরা যে ভ্রান্ত যেমন একথা বলাও সাজে না—তেম্‌নি যাঁরা কাব্যের শুধু সরল তাৎপর্যটিই চান তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও ভ্রান্ত বলা চলে না। তবু একথা তুললাম এই জন্যে যে, হাফেজের গজলে বহু হাফেজ-ভক্ত ছদ্মবেশী সিম্বলিসম্‌ রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করেন এ আমি আমার ইরাণী বন্ধুদের দৃষ্টান্ত থেকে জানি। তাঁরা হাফেজ, জমি এমন কি ওমরের কাব্যেও এই ধরণের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত পেয়ে থাকেন একথা অবিসংবাদিত। তাছাড়া এ-ও ভুললে চলবে না যে হাফেজপ্রমুখ কবিদের উপরে সুফী ভাবধারার প্রভাব খুব বেশি পড়েছিল। তাই পারস্য গজলের এই দ্ব্যর্থকতার ভঙ্গিকে যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য পারস্যবিৎদের মতন অবজ্ঞা করলে ভুল হবে—বিশেষ ক'রে আমাদের মতন প্রাচ্যজাতির। কেন না প্রাচ্য দর্শনে সাধনায় "দেবতাকে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা"র মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ওতপ্রোত। হাফেজের তাজাবতাজা

সওবনও গানটিতে ইরাণী সুফীরা অনেকেই দেখেন বৈষ্ণব মধুরভাবের দ্যোতনা—যে আলোয় প্রিয়া হয় আরাধ্যা—যার পায়ে নত হ'য়ে প্রেমিক পায় পূজারীর স্তবানন্দ। বস্তুত একথা শুধু যে আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধের মতন সত্য তাই নয়—সর্বদেশে সর্বকালে ভালোবাসার একটা গোড়াকার কথাই এইখানে: সে যতই মহান্ যতই গভীর যতই পবিত্র হ'য়ে ওঠে ততই সেখানে দাবির ভাব, বাস্তবতার গ্লানি যায় দূরে হ'য়ে, আসে পূজার ভাব, স্বপ্নের মহিমা। তখন সসীম মানব মানবীকে সত্যই মনে হয় দেবদেবী, বিন্দুকে মনে হয় সিন্ধু, যেজন্যে কবীর গেয়েছিলেন: সিন্ধুতে বিন্দু দেখে সবাই—কিন্তু বিন্দুতে সিন্ধু যে দেখে তারই নাম জ্ঞানী: ব্লেকের ভাষায়—

To see a world in a grain of sand,
An eternity in an hour.

তাছাড়া শ্রেষ্ঠ সুফী কাব্যের গভীরতম তাৎপর্য যখন খুঁজব, তখন ভুললে চলবে না যে, সুফী সাধনার গোড়াকার কথাই হ'ল এক ধরণের অতীন্দ্রিয়বাদ—যেজন্যে সুফীরা আলোর জন্যে বিধানের জন্যে বাইরের কাছে হাত পাততে দারুণ নারাজ: সুফীরা স্পষ্টই বলেন যে তাঁরা লৌকিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডের জগতের বাসিন্দাই নন—হ'তেও চান না, তাঁরা জীবনের পথচলায় প্রতিপদে চান শুধু অন্তর্জ্যোতির ইঙ্গিত নির্দেশ অনুজ্ঞা—এছাড়া আর কাউকেই তাঁরা মানেন না। সুফীদের এই মূলতন্ত্রটি একজন ইংরাজ কবি ছন্দের জাদুতে স্পন্দিত ক'রে বলেছেন—যদিও ইংরাজ মনে এ-ভাবের রঙ একটু বদ্‌লে গেছে: ঠিক এ-ধরণের স্পর্ধার সুর সুফীদের কণ্ঠে ফোটে না—এক ওদের মধ্যে অবতারকল্প মহাপুরুষদের মধ্যে শোনা যায়, কিন্তু তা-ও ভাবসমাধিতে—সাধারণ চেতনায় নয়। যাহোক্ কবিতাটি এই:

Do what thy manhood bids thee do,
from none but self expect applause:
He noblest lives and noblest dies
who makes and keeps his self-made laws.

All other life is living death,
a world where none but phantoms dwell:
A breath, a wind, a sound, a voice,
a tinkling of the camel-bell.

আপন বিবেক-আজ্ঞায় চলো—শুধু অন্তর-আলো-ইঙ্গিত-পথে :
জীবনে মরণে হও গরিষ্ঠ—বরিয়া কেবল প্রাণের বিধান-ব্রতে।
লোকাচার?—সে তো জীবন্মৃতের মায়ালীলা—হায়, ছায়াবাজি, তারে চিনি :
ক্ষণনিশ্বাস, চলতিল্লোল—তুরঙ্গমের কণ্ঠের কিঙ্কিণি।

আচারতন্ত্রের পরধর্ম ছেড়ে আত্মৈশ্বর্যে "অচলপ্রতিষ্ঠ" হওয়ার এই যে আকাঙ্ক্ষা; ক্ষণস্থায়ী বাক্‌সর্বস্বতা ছেড়ে উপলব্ধির ধ্রুবধামে ঠাঁই পাওয়ার এই যে দুরাশা; এক কথায়, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার রীতিকে অপদস্থ ক'রে অপরোক্ষ অনুভবের আলোকলোকে স্বভাবস্থ হওয়ার এই যে অভীপ্সা: এই-ই হ'ল সুফী সাধনার বীজবাণী।

একই কথা, একই বাণী, একই স্বপ্ন দুজনার মুখে ফোটে: একজনার মুখে শোনায় ছায়ার ছায়া, অন্যজনার মুখে জ্ব'লে ওঠে আলোর আলোয়। সুফী সাধকদের শ্রেষ্ঠ ইরাণি গজলে রুবাই-য়ে এই আলো সত্যই দীপ্যমান্ হ'য়ে উঠেছিল এক সময়ে—যেমন যখন রুমির কণ্ঠে স্বরিত হয়েছিল মন্ত্রমান্ আত্মসমর্পণের দীপ্তি:

"মা হমা নায়িমি র উ নায়িমি মা"—
আমরা সবাই ঘুমন্ত বেণু সম বসুধায় থাকি :
শুধু তারি সেই অধরপরশে মুরলীমন্ত্রে জাগি।

গজল সম্বন্ধে এসব বলছি এইজন্যে যে একথাটি ভালো ক'রে না বুঝলে গজলের আদর্শবাদ ও রহস্যবাদের মূল বাণীটিরই নাগাল পাওয়া যাবে না। গজলের মূল বাণীটি হ'ল এই অপরোক্ষ অনুভবের বাণী—এই অতীন্দ্রিয় স্বপ্নমন্ত্র। ওর ভাব নিছক বিশ্বানুগ না—ও হ'ল বিশ্বাতিগ। মাটিতে ওর জন্ম, কিন্তু দৃষ্টি—আকাশে। এই জন্যেই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর পারস্য গজল কাব্য এত গভীর ব্যঞ্জনাময়।

কিন্তু এ পারস্য গজল ভারতে এসে নিল এক নবরূপ। ইরাণি সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের কিছু মিল আছে—কিন্তু খুব বেশি নয়। ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্য তার নেই—বিচিত্র বিকশিত রাগসম্পদ তো নেই-ই। তাই ভারতে পার্সি গজল উর্দু গজলে পেয়েছে নবজন্ম—ভারতীয় সঙ্গীতের ভূমিকায়।

এবার পারস্য গজল ছেড়ে উর্দু গজলের প্রসঙ্গে আসি। শ্রেষ্ঠ উর্দু গজলে বিশ্বাতিগ ভাব কিছু আছে সত্য, কিন্তু ইরাণি সুফী গজলের সৌরভ, সরসতা ও স্বপ্নালুতা নেই। তবু শ্রেষ্ঠ উর্দু গজলের মধ্যে এক ধরণের চিত্রভঙ্গি ও সৌকুমার্য আছে যা সময়ে সময়ে মুগ্ধ করে। কিন্তু দুঃখ এই যে উৎকৃষ্ট উর্দু গজল সংখ্যায় অত্যন্ত কম। শুধু তাই না—শতকরা নিরানব্বইটি উর্দু গজলের ভাব অত্যন্ত সস্তা, প্রেমজ্ঞাপনের ভঙ্গি অত্যন্ত মামুলি, দয়িতের রূপবর্ণনার পদ্ধতি সময়ে সময়ে অত্যন্ত অরুচিকর। উল্টো দিকে, উর্দুতে দার্শনিক গজল হ'য়ে উঠেছে সাংঘাতিক গুরুগম্ভীর—হিন্দুস্থানি গজলে অতীন্দ্রিয়-বোধ প্রায়ই হ'য়ে উঠেছে কথার প্রতিধ্বনি। সুতরাং ইরাণি গজলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলো, অপরোক্ষ উপলব্ধির স্বর্ণরাগ তার উর্দু জাত-ভাইয়ের মুখে ফলেছে ধার-করা আভায়, গিল্টি চাকচিক্যে। উর্দু গজল তাই একদিকে প্রগল্‌ভ, ছেপ্‌লা—অন্যদিকে অত্যন্ত গম্ভীরানন, গজেন্দ্রগামী। মন খুসি হ'তে হ'তে ধাক্কা খায়। তবে সুখের বিষয় যে, শতকরা নিরানব্বইটি উর্দু গজলের বেলায় একথা খাটলেও বাকি একটির বেলায় অন্তত খাটে না। তাই মনে হয় যে উর্দু গজলেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়—যদি কল্পনাশীল সুকুমার কবি জন্মান উর্দু ভাষায়। কিন্তু এখানেও আর এক মহা মুস্কিল—সুরের দিক দিয়ে। কেন না গজল সচরাচর বড়ই একঘেয়ে ভঙ্গিতে গাওয়া হ'য়ে থাকে। কাজেই এখানে কথা সুরকে পাঠালো রসাতলে। বাংলা গজলে সুরের এই সস্তা আবেদন আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে কে না জানে?

তবে ব্যতিক্রম আছে: এমন কয়েকটি গজল অপ্রত্যাশিত ভাবে সুরে ও কাব্যে ফুটে ওঠে যারা সত্যিই হৃদয়স্পর্শী। সে-সব সুর

বাংলা সঙ্গীতে আনলে বাংলা গজল ও সুরমহল সমৃদ্ধ হবে সন্দেহ নেই। এর নজির—"কত গান তো হ'ল গাওয়া" প্রমুখ গজল। এ-শ্রেণীর গজল আরো রচিত হবে এ-ভরসা হয় এই জন্যে যে বাংলা দেশে গজলের আদর সুরু হয়েছে। গজলের ঢঙে উৎকৃষ্ট ভাবাত্মক বাংলা কাব্যে যদি বাঙালির কল্পনা সুরের জোগান দেয় তবে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে গজল এক নব বিকাশে গরীয়ান্ হ'য়ে উঠবে সন্দেহ কি ?—কিন্তু বাংলা গজলের ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনা রেখে উর্দু গজলের কথাটা সেরে নিই।

উর্দু গজলে অনেক সময়ে হিন্দুস্থানি রাগ থাকলেও ওকে মার্গসঙ্গীত বলা হয় না এই জন্যে যে ও হ'ল বিশেষ ক'রেই চিত্রসঙ্গীত—অর্থাৎ কথার রেখায় সুরের রঙ ছড়িয়ে গানের ছবিখানি হ'য়ে ফুটে-ওঠাই হ'ল ওর প্রাণের কথা। কাজেই ও রাগরাগিণীর রকমারি ফুল-কাটলেও ওকে দেশীসঙ্গীতের পাংক্তেয় করাই সঙ্গত।

বলেছি, গজলের একটি প্রধান রূপভঙ্গি হ'ল শ্লোকে শ্লোকে জোড় পায়ে এগিয়ে চলা—দুটি ক'রে চরণে একটি ক'রে মূল ভাবের ছবি ফুটিয়ে-তোলা। কেউ কেউ বলেন ক্রমাগত এই একই ভঙ্গিতে গান রচনা করলে বৈচিত্র্য অভাবে ছন্দ ক্রমশ মনমরা মতন হ'য়ে পড়ে—প্রবহমানতা (enjambement) অভাবে ধ্বনির কল্লোল ক্ষীয়মান হ'য়ে আসে, পরিণামে হাল্কা গানই ওঠে—বুদ্বুদের মতন। কিন্তু ইরাণি গজলদের নজির একথার জ্বলন্ত প্রতিবাদ হ'য়ে দাঁড়িয়ে। বস্তুত এ-ধরণের অভিযোগ খানিকটা সেই নৃত্য-অনভিজ্ঞের উঠোনকে দোষ দেওয়ার মতনই শোনায় যেন। ভালো কবির হাতে পড়লে পুরোনো ছাঁচেও অভিনবতা নিত্যই ওঠে ঝলমলিয়ে। ইতালির বিখ্যাত ভাস্কর বেনভেনুতো চেল্লিনির আত্মজীবনীতে এক জায়গায় তিনি লিখছেন মহোল্লাসে: "খোলা জায়গায় আমার পার্সেউস-মূর্তিটি দেখবামাত্র জনসমুদ্র জয়ধ্বনি ক'রে উঠল...রোজ আমার কীর্তিকলাপ নিয়ে লোকে সনেটের উপর সনেট লিখত...প্রথম দিনই বিশটি সনেট"—ইত্যাদি। সর্পকুন্তলা মেদুসা রাক্ষসীকে বধ ক'রে পার্সেউস তার কাটামুণ্ড হাতে

দাঁড়িয়ে—এই-ই হ'ল চেল্লিনির ব্রোন্‌জ্‌-মূর্তির বিষয়বস্তু : গ্রীক পুরাণের এক বহু সেকেলে রূপকথা। এ-হেন মামুলি কাহিনীকেও যে ধাতুমূর্তিতে আবার নতুন রূপে দীপ্যমান্‌ ক'রে তোলা যায় একথা চেল্লিনির সময়ে কে-ই বা ভেবেছিল?—কিন্তু চেল্লিনি তাঁর সৃজনী ইন্দ্রজালে শুধু এই কথাটাই আবার সপ্রমাণ করলেন যে, প্রতিভার জাদুতে সবই সম্ভব : যুগে যুগে দেশে দেশে জরাজীর্ণ ছন্দেও বিজয়িনী প্রতিভা যে এনেছে নবীনতম প্রাণদোল সে-কথা ফ্লোরেন্সে পার্সেউসের এ-মূর্তিটি দেখলে মনে না হ'য়েই পারে না।

উর্দু গজলের বেলায়ও ঐ কথা। উর্দু গজলে যে কাব্যসম্পদ এত কম তার জন্যে উর্দুর মতন সুন্দর ভাষা বা গজলের মনোজ্ঞ শ্লোকভঙ্গিকে দায়িক করাটা হবে অসঙ্গত : এজন্যে দায়িক শুধু উর্দু কাব্যের বর্তমান আদর্শ ও উর্দু কবিদের অধিকাংশের মধ্যে প্রেরণার একান্ত অভাব।

কয়েকটি উৎকৃষ্ট উর্দু গজল উদ্ধৃত করছি আরো এই জন্যে যে, তাহ'লে কাব্যরসজ্ঞরা সহজেই সায় দেবেন এ-কথায় :

নালয়ে জানে খস্তা জাঁ অর্শেবরিপ আয়ে ক্যোঁ?
মেরে লিয়ে জ়মিন্‌ পর্‌ সাহবে-অর্শ্‌ আয়ে ক্যোঁ?
নূরে জ়মীনো আস্‌মাঁ দীদ-ও দিলমে আয়ে ক্যোঁ?
মেরে সিয়া খ়ানেমে কোই দিয়া জলায়ে ক্যোঁ?
দেখে তুঝে জো এক নজ়র্‌ হোষ্‌মে ফির্‌ রো আয়ে ক্যোঁ?
জিস্‌কো তেরে কদম্‌ মিলেঁ সিজ্‌দেসে সর্‌ উঠায়ে ক্যোঁ?
উস্‌কে ন ইয়াদ করনেকা শিকরা হয় সর্‌ বসর্‌ গ়লৎ।
জো রহে উস্‌কি ইয়াদমে ফির্‌ রো ভুলায়ে ক্যোঁ?

অর্থাৎ

ছোট্ট হিয়ার ডাক কখনো অসীম আকাশ-দিশা পায়?
আমার তরে নীলিমা-নাথ নামবে কেন বসুধায়?
আঁখির কূলে মর্মমূলে লাগবে কি সুদূর আলো?
কে-ই বা আমার আঁধার ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসবে হায়!

বারেক তোমায় দেখল যে—তার চেতনা কি রয় স্ববশ ?
ঐ পায়ে যে লুটায় মাথা—ছাড়তে কি সে চায় ধূলায় ?
তারে ভুলে থাকি—এমন খেদ করে প্রাণ কোন্ ভুলে ?
তার মনে রয় জেগে যে-জন—কে বলো তার মন ভুলায় ?

আর একটি সুন্দর উর্দু গজল উদ্ধৃত করি—বিখ্যাত উর্দু কবি গালিবের ভঙ্গিতে এটি লেখা :

য়ুঁ তো ক্যা ক্যা নজ়র্ নহি আতা ?
কোই তুম্‌সা নজ়র্ নহি আতা !
ঢুঢতি হৈঁ জিসে মেরি আঁখেঁ—
রো তমাশা নজ়র্ নহি আতা !
অপ্‌নি আঁখোসে উস্কো দেখূঙ্গা—
মুঝে ঐসা নজ়র্ নহি আতা !
ঝোলিয়াঁ সব্‌কী ভর্তি জাতি হৈঁ :
দেনেৱালা নজ়র্ নহি আতা।
জো নজ়র্ আতে হৈঁ—নহি অপনে :
জো হৈ অপনা—নজ়র্ নহি আতা।
জ়ের্‌সায়া হুঁ উস্কে মৈ অম্‌জদ্ :
জিস্কা সায়া—নজ়র্ নহি আতা।

ভাবানুবাদ :

ভুবনে কি আছে—আঁখি দেখতে যা না পায় ?
শুধু, তোমার মতন কারেও দেখল না হেথায়।
যারে খুঁজে ফিরল দুনয়ন—
সেই নয়নানন্দে শুধু মিলল না ধরায়।
এই চোখে যে দেখতে তোমায় চাই :
শুধু, এমন দৃষ্টিপ্রদীপ দীপল না তো হায় !
সবার ডালি ভরল বরে যার—
সেই বরদেই আড়াল ক'রে রাখল কে মায়ায় ?

দেখি যাদের—নয় তারা আপন :
আপন যেজন রয় সুগোপন কোন্ যবনিকায় ?
যাপি জীবন চরণছায়ায় যার—
রইল শুধু তারি কায়া লুকিয়ে এ-লীলায় !

আধুনিক উর্দু গজলে ছন্দোবন্ধের রকমফেরও যে নেই তা নয় :

জান্ তুম্ পর্ মৈ ৱারুঁ, সাজনা !
মৌৎকে হাতোঁ তবা হোকর্ ফ়না হো জাউঁ মৈ।
ইস্‌সে বেহ্‌তর্ হৈ—কে, খুদ্ তুম্ পর্ ফ়িদা হো জাউঁ মৈ
জান্ তুম্ পর্ মৈ ৱারুঁ, সাজনা !
পর্দা-হায়ে-অব্‌র্ বিজ্‌লিকো ছুপা সক্‌তে নহি।
উস্ আতে অর্জো-সমামেঁ তুম্ সমা সকতে নহি।
আও দিল্‌মে উতারুঁ, সাজনা !
মুদ্দআ পূরা নহি হোতা দিলেনাষাদকা।
ক্যোঁ অসর্ হোতা নহি তুম্‌পর্ মেরি ফ়রিয়াদকা ?
তুম্‌কো কব্‌তক্ পুকারুঁ, সাজনা ?
রহেম্ করকে কিস্‌সয়ে অম্‌জদ্ চুকাতে ভি নহি।
আপ আতে ভি নহি—উস্কো বুলাতে ভি নহি !
মন্‌কো কবতক মৈ মারুঁ, সাজনা ?

ভাবানুবাদ :

তোমায় প্রণাম করতে হৃদয় চায়।
মরণকে জীবন দেব না—দেব তোমার পায় :
বৈরাগী এ-প্রাণ—শুধু ঐ প্রেমের দুরাশায় :
তোমায় প্রণাম করতে হৃদয় চায়।
বিজ্‌লি ঢাকা যায় কি—জলদজালের আঁধিয়ারে ?
ভূলোক দ্যুলোক তোমায় ধ'রে রাখতে কভু পারে ?
অন্তরে মোর আজ এসো কৃপায়।

চিত্ত-চাতক যাচে—ঝরাও অঝোর বরিষণ
তোমার প্রসাদ পায় না কেন তৃষার আবেদন ?
আর কতদিন ডাকব গো তোমায় ?
অরুণ-করুণায় নিশীথে মিলবে দিশা কবে ?
আসবেও না কাছে—পায়ে ডেকেও না লবে !
মন যে মানা মানে না আর হায় !

গজল সম্বন্ধে এত আলোচনা করছি তার একটা প্রধান কারণ এই যে গজলে উচ্চশ্রেণীর কাব্যসঙ্গীত রচনা হ'তে পারে ব'লে এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এমন কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। গজলের ছন্দোবন্ধেরো যে রকমফের হ'তে পারে তারও দুএকটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম আরো এই জন্যে যে, গজলে সুকুমার কাব্যরসিকরা অনেক সময়েই কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা বোধ করেন। করার কারণ আছে একথা ইতিপূর্বেই মেনে নিয়েছি উর্দু গজলের সম্পর্কে। কিন্তু একটা মস্ত কাব্যসঙ্গীতের ধারাকে তার নিকৃষ্ট নমুনা দেখে বাতিল করলেও তার 'পরে অবিচার হয়। গজল সম্বন্ধে তাই কাব্যানুরাগীদের দৃষ্টি বিশেষ ক'রেই আকর্ষণ করা উচিত মনে করি—আরো এই জন্যে যে, গজলের এই শ্লোকভঙ্গিতে গানের গানত্ব খুবই সুন্দর ফোটে—যেহেতু এ-ভঙ্গিতে মূল ভাবটিকে ছন্দের মন্ত্রে সুরের ইন্দ্রজালে সজীব ক'রে তোলার অবকাশ যথেষ্ট মেলে। গানের ভাবটি যদি সোজা তীরের মতন হৃদয়ে পৌছতে পায় তবে সুরের ব্যঞ্জনার জাদুতে তার ছবিকে উজ্জ্বল ক'রে তোলা সহজ হবারই তো কথা। গজলের রচনাচাতুরীর প্রাণের কথাও ছিল এই-ই। ইরাণি গজল চর্চা করতে গেলে একথা খুব বেশিই মনে হয়—যদিও একথা সত্য যে উর্দু গজলে এ-সুন্দর আইডিয়াটি সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রেই ফুটে উঠতে পারে নি, কারণ উর্দু গজলকারদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি নেই বললেই হয়। কিন্তু কবিত্ব বাঙালির স্বধর্ম—তাই শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিদের কাছে আবেদন—তাঁরা এখন একটু এদিকে মন দিন ও হাল্কা

ঠুন্‌কো গজল ছেড়ে ভাবগভীর গজল রচনায় ব্রতী হোন্‌, বাংলা সঙ্গীতের একটা বড় অভাব পূর্ণ হোক্‌।

গজল সম্বন্ধে আর একটি কথা বলবার আছে। যদিও গজলকে মার্গসঙ্গীতের মধ্যে ফেলা চলে না, তবু ওর স্বরবৈচিত্র্য যদি বাড়ে তবে ঠুংরির মতন ওকেও মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত না করার কোনো সঙ্গত হেতুই থাকবে না। এ আমাদের কথার কথা নয়: লক্ষ্ণৌয়ে ইন্দর বাইয়ের ও জয়পুরে গহর বাইয়ের মুখে এত স্বরসমৃদ্ধ গজল শুনেছি যে মনে হয় গজলে স্বরসমৃদ্ধিবিকাশের আরো যথেষ্ট অবকাশ আছে। এবং যখন স্বরঝঙ্কারে গজলের রূপ আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে—যখন গজলে গুণী শুধু কাব্যরূপ নয় স্বররূপও আরো ফুটিয়ে তুলবেন—তখন গজল মার্গসঙ্গীতের শ্রেণীতে না হোক পদবিতে উত্তীর্ণ হবেই। ইতিমধ্যেই গজলে নানারকম স্বরসমৃদ্ধি আনা হয়েছে ও হচ্ছে, আশা করি ভবিষ্যতে আরও হবে।

এ ছাড়া হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে আরও অনেক রকম দেশীসঙ্গীত আছে যথা কাজরি, হোলি, লাউনি, মসিয়া, গুলনক্স প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকেরই একটু আধটু রূপশ্রী স্বরশ্রী প্রাণশ্রী আছে বৈ কি—তবে কোনো বড় রকমের বৈশিষ্ট্য বা বিকাশসম্ভাবনা এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। বাংলায় এরা রামপ্রসাদী, সারি, পাঁচালি, তর্জা, বারোয়ারি শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের মতনই: সুষমা, সৌরভ, রস কমবেশি আছে কিন্তু নাটমঞ্চ ছোট, পটভূমিকা অপ্রশস্ত, প্রেরণা ক্ষীণ, বৈচিত্র্য দীন। তাই এদের বেশি ব্যাখ্যানা রেখে দেশীসঙ্গীতের বর্ণনে বাংলা গানের অধ্যায়ে আসা যাক্‌। বাংলাসঙ্গীত নিয়ে পরে আলাদা একটি বড় বই লেখার ইচ্ছা রইল—কিন্তু সে হবে পরে। আপাতত এ-পর্বকে সমাপ্তি দিতে যতটা পারি সংক্ষেপে বলি বাংলাসঙ্গীতের উদ্ভবকাহিনী, বিকাশধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা যা না বললেই নয়।

১৪

কীর্তন

বাংলা সঙ্গীতে সবচেয়ে বৃহদঙ্গ সঙ্গীত যে কীর্তন সঙ্গীতসমাজে এ-বিষয়ে মতভেদ নেই—যদিও কীর্তনের সাঙ্গীতিক মূল্য নিয়ে নানান্ তর্ক আছে। একে কেউ বলেন লোকসঙ্গীত, কেউ বা বলেন সেন্টিমেন্টাল সঙ্গীত, কেউ বলেন কথাপ্রধান স্বরবৈচিত্র্যহীন সঙ্গীত—কেউ বা বলেন মহান নাট্যসঙ্গীত। আমরা এই শেষের দলে। আমরা আরো বলি যে যদি বিশুদ্ধ স্বরকারু শ্রুতিবিশুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে না মেপে মানব-মনপ্রাণআত্মার বহুবিচিত্র গভীর আবেগমূলক নাট্যরাগ প্রেম ও ভক্তির মাপকাটি দিয়ে কোনো জাতীয় সঙ্গীতকে বিচার করতে হয় * তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের মতে সায় না দিয়ে উপায় থাকে না যে, "উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের পরিসর হিন্দুস্থানি গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানি গানে নেই। ···চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে-হিল্লোল তুলেছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যাকুল হোলো। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এই জন্য সেদিন কাব্যে ও সঙ্গীতে বাঙালি আত্মপ্রকাশ করতে বসল।" (সঙ্গীতের মুক্তি)

* একথা বলছি এইজন্যে যে একই বস্তুকে দৃষ্টিভঙ্গি বা মাপকাঠি দিয়ে মাপলে বিচারী মনের রায়ও বিভিন্ন হ'তে পারে, এই কথাটি অনেকে ভুলে যান। য়ুরোপীয় সংধ্বনি সঙ্গীতকে (সিম্‌ফনি) যখন বিচার করি তখন তার মধ্যে মেলডির দৈন্য থাকলেও মেলডির দুর্ভিক্ষে তার শ্রেষ্ঠতা নাকচ করা চলে না। তেম্‌নি রাগসঙ্গীতের বিচারে স্বরসঙ্গতি (হার্মনি) খুঁজে এ-সঙ্গমের সৌন্দর্য না পেলে বলা চলে না যে রাগসঙ্গীত নিম্নশ্রেণীর সঙ্গীত। উইলার্ড সাহেব একথা বুঝতেন, সেই জন্যে বারবার তাঁর বইয়ে লিখে গেছেন যে হার্মনি ও মেলডিকে এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে গেলেই ভুল হবে। কীর্তন ও রাগসঙ্গীত সম্বন্ধেও ঐ কথা : দুয়ের লক্ষ্য, রস, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কাজেই তুলনা করতে যাওয়াটাই ভুল।

কীর্তনকে যাঁরা লোকসঙ্গীতের কোঠায় ফেলেন তাঁদের ভুল এইখানে যে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক ও গঠনপদ্ধতি এত বহুবিচিত্র হয় না, হ'তে পারে না। বাউল ভাটিয়ালি সারি রামপ্রসাদী এরাই হ'ল যথার্থ লোকসঙ্গীত। কীর্তনের গঠনপদ্ধতিতে যে "বহুশাখান্বিত নাট্যরস" আছে, যে মহৎ স্থাপত্যশিল্প আছে, যে ছবি ও সুর, প্রেম ও কাব্য, রূপ ও ভাবের একত্র-সমাবেশ, তাল ও আঁখরের বৈচিত্র্য আছে সে-সবই সঙ্গীতের একটি উচ্চ সাধনার পরিণাম। বস্তুত কীর্তনের নানামুখী সমৃদ্ধির কথা ভাবলে মনে সম্ভ্রম না জেগে পারে না, এ-সিদ্ধান্ত না ক'রে থাকা যায় না যে, একটা উদার সুরের আলো নেমেছিল প্লাবনের কূলছাপানো কল্লোলে —সে-আলো মানব হৃদয়ের আবেগতটে লেগে উচ্ছ্বসিত উচ্ছলিত হয়েছিল প্রেমের তরঙ্গভঙ্গে—যার ফলে দিকে দিকে ছুটেছিল সে গানে তানে, ছবিতে রেখায়, গন্ধে বর্ণে, আঁখরে ভাবে—সর্বোপরি ভক্তিরসের মন্দাকিনী মাধুরী-বন্যায়।

যতদূর জানা যায় কীর্তনের প্রবর্তক—স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে: "বহিরঙ্গ সনে নামসঙ্কীর্তন, অন্তরঙ্গ সনে রস আস্বাদন।" এখনো এই দুই শ্রেণীর কীর্তনের চল আছে— নামকীর্তন ও রসকীর্তন। রসকীর্তনের চারটি প্রধান শাখা: গরানহাটি, মনোহরসাহি, রেনেটি ও মন্দারিনি। শেষের দুটি হাল্কা, প্রথম দুটি উদাত্ত গভীর ঠায় লয়ে গেয়। শ্রেষ্ঠ কীর্তন বলতে গরানহাটি মনোহরসাহিই বোঝায়। তবে এ ব্যাখ্যা বা ইতিহাস এ-বইয়ের লক্ষ্যবহির্ভূত। তাই এ-প্রসঙ্গে শুধু নাম কয়টি উল্লেখ ক'রেই সমাপ্তি টানছি—বিশেষ আরো এই কারণে যে কীর্তনের মতন বহুসমৃদ্ধ সঙ্গীতের যথাযথ বর্ণনা এ ছোট পরিসরে সম্ভবও নয়—এখানে তার দরকারও দেখি না। তাই আমি কীর্তনের ধারা ও আমাদের সঙ্গীতে তার ভাস্বর স্থানটি কোথায় সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ব'লেই ইতি করব।

কীর্তন সম্বন্ধে প্রথম কথা যেটা মনে আসে সেটা এই যে ওর যথার্থ বিশেষণ হচ্ছে "ক্লাসিক"। তাই ওকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে

জহুরিপনার পরিচয় দেওয়া হয় না। একথা মানি অবশ্য যে কীর্তন লোকপ্রিয়—কিন্তু কীর্তনের মূল্যনির্ধারণে এ-বিচার অবান্তর। কেননা কীর্তন যেজন্যে লোকপ্রিয় সেজন্যে বড় নয়। পপুলারিটি বা লোকপ্রিয়তা কোনো বড় শিল্পকলার মহত্ত্বের পক্ষে প্রামাণিক নয়। এমন কি, একথাও বোধ হয় অকুতোভয়ে বলা যেতে পারে যে, কীর্তন অধিকাংশ স্থলেই পপুলার হয় তার ছোট আবেদনটুকুরই জন্যে, তার মাতামাতি, ঝাঁপাঝাঁপি, হৈ হৈ রৈ রৈ এর জন্যে—যেমন হিন্দুস্থানি সঙ্গীতও অধিকাংশ ক্ষেত্রে করতালি পায় তার তালের টঙ্কার, তানের হুঙ্কার, কসরতের বাহ্বাস্ফোট—এককথায় মল্ললীলার জন্যে। সব বড় শিল্পেরই অবনতি হয় অরসিকদের অন্ধতায়, অসংখ্য ছোট গ্রহীতার বহুবিস্তীর্ণ মাধ্যাকর্ষণে। সস্তা আবেদন ব্যাপক, গভীর রস হৃদয়ের অনুভূতির গভীরতার অপেক্ষা রাখে। মানুষ স্বতই চায় আদর, আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই সস্তা পথেই সে নগদ-বিদায়ের জন্যে লুব্ধ হ'য়ে ওঠে। সুরের, ভাবের, ছন্দের গভীর আবেদন লোকপ্রিয় নয়—অন্তত লোকশিক্ষার ও সংস্কৃতির এ-দৈন্যের যুগে তো নয়ই। ভবিষ্যতে আশা করি জনসাধারণও বিদগ্ধ রসিক, গভীর বোদ্ধা হবেন—কিন্তু সে আশা-পূরণ বহুদূর এ নিশ্চয়। তাই উপস্থিত বলা যায় বৈ কি যে, বড় জিনিষ বড় বিকাশ বড় আবেদন অন্তত বহুদিন ঠিকমত গৃহীত আদৃত হবে না, যেজন্যে তারা বড় সেজন্যে প্রতিষ্ঠা পাবে না, পাবে অবান্তর কারণে।

যা বলছিলাম: কীর্তনকে পপুলার ব'লেই বলা হয় প্রায়ই: দেখ, এত লোকের ভালো লাগল, কাজেই এ বড়, যা সবাইয়ের ভালো লাগে তাই তো মহৎ—টলষ্টয়ও বলেছেন—ইত্যাদি।

কিন্তু এ-কথায় "সবাইয়ের" মনে এ ডিমক্রাসির যুগে আত্মগৌরবের হিল্লোল বইলেও ডিমক্রাসির সস্তা নৌকা যে আজ বানচাল হবার জো হয়েছে একথা সব চিন্তাশীল মানুষই স্বীকার করছেন। তার শেষরক্ষা হবার তো অন্তত গতিক নয়। কিন্তু সে যাই হোক্ সর্বসাধারণের কীর্তন ভালো লাগাটাই যে কীর্তনের মহত্ত্বের প্রতিপাদক নয় একথা অপ্রতি-

বাগ্য। Vox populi, Vox dei একথায় যে মন আর সাড়া দেয় না—উপায় কি? গণতন্ত্রের মহিমা সম্বন্ধে যে স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম তা প্রায় ভেঙেছে বৈ কি। যাই হোক্, ফিরে আসি কীর্তনের কথায়।

সবাই জানেন কীর্তন ও বাউল এ দুয়ের নাম প্রায়ই একনিশ্বাসে করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু ওদের ভাবগত কিছু সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও রূপগত কোনো মিলই নেই—বিশেষ সঙ্গীতরাজ্যে। বাউলই হ'ল সত্যকার লোকসঙ্গীত। অল্প এর গণ্ডি, অল্প এর কল্পনা, অল্প এর প্রতিভা, অল্প এর উচ্চাশা। এ মিষ্টি, সহজ আবেদনে সুললিত—যাকে ইংরাজিতে বলে 'প্রেটি', বাংলায় বলে—চিকণ বা চটকদার। এথেকে যেন কেউ আমাকে ভুল না বোঝেন। বাউল খুবই ভালো জিনিষ। কিন্তু বাউল হ'ল একতারা, একমুখী, অল্পসুখী। পক্ষান্তরে কীর্তন হ'ল বহুতন্ত্রী, বহুবল্লভ, বহুঝঙ্কার, বহুছন্দিত। রেশ ওর অশেষ, সুরের ভাবের সুষমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—বহুমুখী। নানা বিকাশ-সম্ভাবনার ইঙ্গিতই ওর মধ্যে—প্রাণসম্পদ ওর অজস্র: শুধু কথায় নয়—আঁখরে, তানে, তালে, ছন্দে, নাট্য-পরিকল্পনায় ও মহীয়ান্। তাই কীর্তনকেও ক্ল্যাসিক্যাল বা মার্গসঙ্গীতের পর্যায়েই ফেলা উচিত—দেশীসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে অবশ্য আপত্তি নেই যদি না কীর্তনের গরিমা নাকচ করা হয় এই ব'লে যে ও মাত্র লোকপ্রিয়। একথা জানা এবং মানা দরকার যে কীর্তন একটি অতি উচ্চবিকশিত সমৃদ্ধ সঙ্গীত—কৌলীন্য শালীনতায় অচলপ্রতিষ্ঠ।

কিন্তু কীর্তনের ক্লাসিসিসম্ বা কৌলীন্য হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সমশ্রেণিক নয়, ওর জাতই আলাদা। কী জাত ওর? বলি।

রবীন্দ্রনাথ কীর্তন সম্বন্ধে একটি পত্রে লিখেছেন: "বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানি গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি। সে সমস্ত

নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হ'লে চিত্তের বেগ এম্‌নিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।"

কীর্তন সম্বন্ধে এ হ'ল লাখ কথার এক কথা। কেবল একটি কথা: কীর্তন হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর কাছে হাত পাতেনি: সুর-সম্পদে ও একেবারেই স্বকীয়—রাগসঙ্গীতের সঙ্গে ওর নাড়ির যোগ নেই। তবে সে যাক্, কবির আসল কথাটি সত্য: যে, কীর্তনের প্রেরণা এল মানুষের অন্তর্নিহিত গভীর ও দুর্নিবার হৃদয়াবেগ থেকে—বাইরের কোনো কলাকারু বা এস্থেসিস থেকে নয়। এর মানে নয় অবশ্য যে, হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রেরণা নেই। আছে যথেষ্ট। প্রতি মহীয়ান শিল্পে হৃদয়ের, প্রাণের আবেগ থাকবেই নইলে সে শিল্পের কোঠায়ই পড়ে না। কিন্তু হ'লে হবে কি, হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের যে-হৃদয়াবেগ তার ভঙ্গি, ছন্দ, ধারা ও প্রেরণা কীর্তনসঙ্গীতের সগোত্র নয়। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে রাগের রূপ-আল্পনা একটা মস্ত কথা; এত মস্ত যে, সেখানে হৃদয়াবেগ লুকিয়ে আছে রূপের উচ্চ আকুতির পিছনে। ভাবটা এই যে, রূপ যদি ফোটে তবেই আবেগ সার্থক। কীর্তনে ঠিক উলটো; এখানে রূপ ফুটছে না বলি না—(তাহ'লে শিল্পই হয় না, যেহেতু শিল্পের কাছে রূপ মস্ত কথা—অন্তত গৌণ তো নয়ই)—কিন্তু প্রাণের ভাবকে হৃদয়ের আবেগকে ছাপিয়ে ও নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে না। একথা বলতে ঠিক কী বুঝছি সেটা ছন্দের ওরফে তালের প্রসঙ্গে বলি। (একটু টেকনিকাল আলোচনা ক্ষমনীয়—কিন্তু শিল্পের আলোচনায় টেকনিকের আলোচনাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া চলে না যে।)

সবাই জানেন: হিন্দুস্থানি গানের উৎকর্ষের সঙ্গে তার তাল-নৈপুণ্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ধ্রুপদে চৌতাল সুরফাঁকতাল ধামার জাতীয় কল্লোলিত ছন্দকে যদি বাদ দেওয়া যায় তবে সুরের ইমারৎ ধ্বসে পড়ে বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। এসব সঙ্গীতের স্থাপত্যশিল্পে তাল বহিরলঙ্কার নয়—ইমারতেরই উপাদান। ধ্রুপদী তালের জলদগম্ভীর কদম, তথা—কনট্রাস্‌টে—বাঁট, আড়ি,

কুআড়ির বক্রগতিতে যিনিই দুলে উঠেছেন তিনিই জানেন একথা কত সত্য। মনে আছে ৺বিশ্বনাথ রাও বা ৺অঘোর চক্রবর্তী বা আমার ধ্রুপদ-গুরু পূজনীয় ৺রাধিকা গোস্বামীর উদাত্ত লয়ে যখন তাঁরা সমে ফিরি ফিরি করতেন—মন আনন্দে উঠত অধীর হ'য়ে। সে-ছন্দকারুতে কোনো অহঙ্কার নেই, জাহিরিপনা নেই, মাতামাতি নেই—অথচ তবু তাল যেন সুরের সঙ্গে চলেছে হাত ধরাধরি ক'রে, সই পাতিয়ে। পরমহংসদেব বলতেন দুধ ও দুধের সাদা রংকে আলাদা ক'রে ভাবাই যায় না—এ-ও তেমনি। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ধ্রুপদ সঙ্গীতের বাঁধুনিতে তাল ও সুরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। খেয়াল টপ্পা ঠুংরিতে তালের এই বাঁধাবাঁধি থেকে গান অপেক্ষাকৃত ছাড়া পেয়েছে বটে, কিন্তু তবুও একথা বললে বোধ করি কোনো সঙ্গীতজ্ঞই আপত্তি করবেন না যে, হিন্দুস্থানি গানে—এক আলাপ ছাড়া—তালের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।

কীর্তনে তালের অভিব্যক্তি ঠিক এ-ধারায় হয় নি। এখানে ফের বলি—কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন: কীর্তনে তালের বিভূতি নেই এমন কথা বলছি না আমি মোটেই। কীর্তনের তালনৈপুণ্যেও চমৎকারিত্বের অভাব নেই। গরাণহাটি বা মনোহরসাহি কীর্তনের তেওট, মধ্যম-দশকুশি বিলম্বিত ঝাঁপতাল প্রভৃতিতে তালের মাধুর্য হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের ছন্দের মতনই অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের তালের সঙ্গে কীর্তনের তালের এই তফাৎ সর্বত্রই লক্ষিত হয় যে, কীর্তনের তাল হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের তালের মতন স্বাতন্ত্র্যবাদী নয়, বহির্মুখী নয়। কীর্তনে তালও সুরের মতনই অন্তর্মুখী—নিজেকে রাখে গোপনেই, চলে যেন অন্তঃশীলা ছন্দে। বড় সুন্দর তালের এ-ভঙ্গি কিন্তু সেই জন্যেই আবার অত্যন্ত কঠিনও বটে। কারণ যেখানে তালের লয় আপনাকে পদে পদে জানান দিয়ে যায় সেখানে তাল রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু যেখানে তালের লয় অন্তর্গূঢ় সেখানে তাল রাখাও দুরূহ, তালের রস পাওয়াও কঠিন। তাই ব'লে এ-তালের সুষমা কবিকল্পনা নয়: এ-ও কংক্রীট, বাস্তব। অর্থাৎ কীর্তনে তালেরও রস

পাওয়া যায়—শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখলে। এ আমার অনুমান নয়—অন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনুভবের সাক্ষ্য। কীর্তনের তেওট দশকুশির ছন্দে অপূর্ব রস পেয়েছি যে।

কিন্তু তবু বলব—কীর্তনের তাল বা ছন্দের রস হিন্দুস্থানি তালের রসের স্বজাতীয় নয়। এখানে কীর্তনের ছোট বা চুটকি তালের কথা বলছি না যেমন জপ, ধামালি, ছোট দুঠোকা প্রভৃতি তাল: বলছি ওর কল্লোলিত বিলম্বিত তালগুলির কথা। এসব তালের রচনা-নৈপুণ্য অতি সুন্দর।

কিন্তু একটু কথা আছে। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে তাল অতি স্পষ্টভাবে সজাগভাবে অলঙ্কৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তালের নানা ভঙ্গি নানা লীলায়ন অতি আশ্চর্য কৌশলে প্রয়োগ করা হয়—তালের ছন্দের তুল্‌কি চালে শিহরণ জাগাতে। এ-ও কম কথা 'নয়। য়ুরোপে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞরাও দেখেছি বিস্মিত হতেন আমাদের হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের—বিশেষ ক'রে বিষমপদী তাল-নৈপুণ্যে। তালের জালবুনুনির যে কৌশল হিন্দুস্থানি সঙ্গীতজ্ঞের নখদর্পণে সে-নৈপুণ্য বিশ্বের বিস্ময়। আলাউদ্দিন খাঁর তালের ইন্দ্রজাল—তার মহিমার তুলনা সত্যই নেই। বিশ্বনাথ রাওয়ের তালের সাধনা ছিল অবিশ্বাস্য। জগদ্বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া অর্কেষ্ট্রার নায়ক ষ্টকভ্‌সকি—যিনি একশো কুড়িটি বাদকের জুড়ি হাঁকান—তিমিরবরণের স্বরোদের তাল-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে গোয়ালিয়র থেকে লিখেছিলেন আমাকে: "তালে আমরা তোমাদের কাছে শিশু।" এসব কথার অবতারণা করলাম শুধু দেখাতে যে কীর্তনের তাল ঠিক এ-শ্রেণীর বিস্ময় জাগাবে না। কিন্তু সে প্রত্যাশাই যে ওর কাছে করা অসঙ্গত। কারণ বলেছি, কীর্তনে তাল আত্মবিজ্ঞপ্তি চায়ই না—ছন্দ সেখানেও আছে, কিন্তু অতিপ্রকট নয়। কীর্তনে তাল ও সুর উভয়েই অন্তরের ভাবগাঢ়তার আবেগোচ্ছলতার অনুবর্তী, তারা বাইরের কোনো কারুকলার কাছে হাত পাতে নি—তার দরকারই হয় নি ব'লে।—"হৃদয়াবেগ"ই-যে ওর মূল প্রেরণা, ও যে স্বভাব-

অন্তর্মুখী সঙ্গীত, ভাবমুখী সঙ্গীত: তালে বিস্ময়-জাগানো চমক-জাগানো ওর স্বধর্মই নয় যে। কীর্তনের ভাবঘন অন্তর্লোকে সব আগে ডেকেছিল ভক্তির বান প্রেমের বান—তাই তো ও বাধা মানে নি, সুরে ছন্দে আঁখরে কাব্যে এঁকে বেঁকে যথেচ্ছ গতিতে পথ কেটে বেরিয়ে চলেছে উধাও অসীমের পানে, অকূলের অভিসারে। তাই তো সুর তাল ওর আজ্ঞাবহ—হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের মতন অনুশাসক নয়: পরিচারক, ব্যজনীকার—হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের মতন সখী নয়।

বলেছি, হিন্দুস্থানি সঙ্গীত ও কীর্তনের তুলনা করাই উচিত নয়। এরা দুই আলাদা ধর্মের স্বভাবের সঙ্গীত। অবশ্য হিন্দুস্থানি সঙ্গীত ও কীর্তন উভয়ই উচ্চ-সঙ্গীত—চুটকি-সঙ্গীত নয়। কেবল এ দুয়ের বিকাশধারা আলাদা আলাদা পথ কেটে নিয়ে চলেছে—এদের প্রেরণা আলাদা ব'লে—লক্ষ্য আলাদা ব'লে। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত চেয়েছে—স্বরশুদ্ধি, ছন্দনৈপুণ্য, রূপকৌশল। কীর্তন চেয়েছে ভক্তির প্রেমের তরঙ্গ—সুরের কল্লোলে, আঁখরের আল্পনায়, ছন্দের অন্তঃশীলা শিঞ্জনে। কেউই কারুর চেয়ে কম নয়—উভয়েই নিজের নিজের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবু যে এ-তুলনা করলাম সে শুধু দেখাতে যে, ওদের লক্ষ্য ভিন্ন—ওরা পরস্পরের সঙ্গী—প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

বলেছি কীর্তনের একটি প্রধান সম্পদ হ'ল ওর নাট্যস্থাপত্যকারু—dramatic architectonics—তার কথা না বললে ওর একটি প্রধান কথাই না-বলা থেকে যায়।

এই স্থাপত্যকারুতে কীর্তন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—যেমন সুরের অতি-সূক্ষ্মতায় হিন্দুস্থানি সঙ্গীত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এক য়ুরোপের অপেরার সঙ্গে কীর্তনের খানিকটা তুলনা হয় দুই-ই নাট্যসঙ্গীত-বর্গীয় ব'লে। কিন্তু অপেরাও কীর্তনের সমকক্ষ নয় ভাব-ব্যাখ্যানে। কারণ অপেরায় যন্ত্রসঙ্গীতই প্রধান—অনির্বচনীয়তাই তার লক্ষ্য। পক্ষান্তরে কীর্তন অনির্বচনীয় হ'য়েও শুধু সঙ্গীত নয়—কাব্যও বটে। তাই ও বচনীয়ও বৈকি। অপেরার কথা অতি অকিঞ্চিৎকর—আখ্যানভাগ

প্রায়ই ছেলেমানুষি। পক্ষান্তরে কীর্তনের কথা অপূর্ব মনোহর, কাব্য উদাত্ত, মর্মস্পর্শী, সনাতন অথচ নিত্য-পুনর্ণব।

কীর্তনের কাব্যোৎকর্ষ নিয়ে বেশি বলতে যাওয়া বাহুল্য। কিন্তু এ-কাব্য কি ভাবে যে স্থাপত্যকারুকে অবলম্বন ক'রে মধুর হ'য়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ধ্রুপদের স্থাপত্য বিধৃত মূলত সাঙ্গীতিক গঠন-পরিকল্পনায়—আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ এই চার তুকে সে কখনো উদাত্ত-কখনো অনুদাত্ত কখনো বিলম্বিত কখনো জলদ লয়ে অপরূপ সুর-সৌধ-রচনা-বিলাসী। কীর্তনীও কবি, স্থপতি—কিন্তু সে স্থাপত্য রচনা করে কাব্যের নানা ছবিতে—কাহিনীতে—বর্ণনায়—বিশেষ ক'রে আঁখরে। এই আঁখর সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করি।

কীর্তনের একটা প্রধান লক্ষ্য যে আলেখ্যশিল্প একথা বাঙালিকে বলারও দরকার নেই। কিন্তু এ-শিল্প ছবি হ'লেও সঙ্গীত ব'লে যেন চলন্ত ছবি গোছের হ'য়ে উঠল। তখন সে দেখল যে, সবটুকু বাঁধাধরা হ'লে গায়ক পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। হিন্দুস্থানি মার্গসঙ্গীতে সুরলীলায়—improvisationএ—গায়ক ছাড়া পান সুরের পর সুরে, মিড়ের পর মিড়ে, তালের পর তালে, বাঁটের পর বাঁটে। এই সবেই তাঁর প্রতিভা পায় প্রকৃত সৃষ্টির অবকাশ। কীর্তনী কীর্তনে সৃষ্টির সুযোগ পান প্রধানত আঁখরে। এ-পদ্ধতি জগতের আর কোনো সঙ্গীতেই নেই। এ অপূর্ব, মনোহর। যাঁরা ভালো কীর্তনীর আঁখর শুনেছেন তাঁরা জানেন আঁখর-গৌরবে কীর্তনের ভাব-রস-রূপ সম্পদের শ্রী কি ভাবে ফিরে যায়। সামান্য ছবিও আঁখরের আলোতে শোভায় রঙে ব্যঞ্জনায় হ'য়ে ওঠে দীপ্ত সুষমিত কুসুমিত। একটুখানি ভাবের স্ফুলিঙ্গে আঁখরের বাতাসে যেন যজ্ঞের আগুন ওঠে জ্ব'লে।

মানুষের মন অন্যমনস্ক—তার চেতনার সজাগ তন্তুজাল থেকে থেকে শ্লথ হ'য়ে পড়ে,—সে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই যা বলতে চাই বলা হয় কই? কীর্তনী একথা জানেন। আরো জানেন—একটি স্থির চিত্রভঙ্গি কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে কি ভাবে দুলে ওঠে। আন্‌মনা মনকে জাগাবার জন্যে

এই যে ছবির আলোর সঙ্গে সুরের ঢেউ—এরা দুয়ে মিলেই হ'ল আঁখর। তাই বড় ওস্তাদের গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি যেমন তাঁর সুরসৃষ্টিতে—বড় কীর্তনীর গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি তেম্নি তাঁর আঁখর-যোজনায়। মার্গসঙ্গীতে ওস্তাদ দেন সুরের তান—কীর্তনে প্রেমিক দেন কথার তান—আঁখরের তান। এইখানেই তিনি সত্যিকার স্রষ্টা। আর এ-সৃষ্টির ভারা বয় কীর্তনীর প্রেমের গভীরতা ও কল্পনার বিস্তীর্ণতা। শ্রেষ্ঠ কীর্তনকারদের পদাবলীর পদলালিত্য ভাবমাধুর্য এম্নি ক'রেই প্রেমিক শ্রোতার মরমে পশে—আঁখরের অমোঘ শরসন্ধানে।

আঁখরের পদ্ধতিটিও বড় সুন্দর। যেন অশ্রুত রেশ ধীরে ধীরে শ্রুত হচ্ছে—পূর্বপটে ঐ একটি রং—উষার চাউনিতে ঐ আর একটি জাগল তারই মাথায়—ঐ ঐ আর একটি তার ঠিক পাশে...এম্নি ক'রে

রেখার উপর রেখা জাগে, রঙের উপর রঙ:
মাটি খোঁজে আকাশ-লীলা, আকাশ মাটির ঢঙ।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি ঠিক কী বলতে চাইছি। ধরা যাক্ জ্ঞানদাসের পদাবলী:

কী রূপ হেরিলাম কালিন্দী-কূলে:
অতি অপরূপ কদম্ব মূলে!

কীর্তনী এতে আঁখর দিচ্ছেন। এখানে অনুধাবনীয় কী ভাবে আঁখর বিকশিত হ'য়ে উঠছে—ছোট থেকে হচ্ছে বড়, সূক্ষ্ম থেকে স্পষ্ট, আভা থেকে আলো (এ-আঁখরগুলি আমার কীর্তনগুরু শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের কাছে পাওয়া):

ওগো দুটি আঁখি—
আমায় সবে দিলে দুটি আঁখি—
বিধি দিলে দিলে দুটি আঁখি—
আমি তাই বলি—সে কেমন বিধি?
হায় দিলে বিধি দুটি আঁখি—
কেন তাতেও আবার নিমিখ দিলে?

সখী, যে হেরিবে কৃষ্ণানন—
তারে কোটি নয়ন দেয় না কেন ?

কী সুন্দর! কে জানত—কালিন্দীকূলে নবঘনশ্যামকে দেখে কবির অন্তর এ-হেন দুকূলভাঙা প্রেমের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—এমন ক'রে জানাতে চায় সে-আনন্দের বেদনা—তৃপ্তির মাঝেও তৃষ্ণার আকুতি—তবু কাঙাল মন চায় সেই তৃষ্ণাকেই করতে জপমন্ত্র।

ইংরাজিতে যুক্তিবাদীরা বলবেন—অতিশয়োক্তি, হাইপার্বোল! কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভালো যে একবারো বেসেছে সে জানে যে প্রেমের উদ্বেল মুহূর্তে চিত্তাকাশে যখন রঙের আগুন লাগে তখন নগণ্যতমও হয় সে-আলোর সরিক। হায় রে, আমাদের আধার অপটু—রাখতে পারে না এ-আলো। নেমে আসে বাস্তব দৈনন্দিনতার ছায়ার পাখা, আমরা বলি—উচ্ছ্বাস, হাইপার্বোল! কিন্তু প্রেমের চেতনার ভুল হয় নি তো: সে যে দেখেছিল তাই না মজেছিল—তাই না খেদ করেছিল কোটি আঁখির অভাবে! কিন্তু আশার কথা এই যে এ-উপলব্ধি না হ'লেও, যুক্তি তিরস্কার করলেও, এর রঙ আমাদের কল্পনাকে তোলে রঙিয়ে। তাই তো এ-অতিশয়োক্তিকে যুক্তির অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে এতটুকু সাধ যায় না—মন আর্দ্র হ'য়ে মেনে নেয় যে সে ভুবনমোহনের কান্তি যদি চোখে সত্যই পড়ত তাহ'লে এম্‌নি কান্নাই উঠত জেগে, রোমে রোমে জাগত ঐ কোটি নয়নেরই আকাঙ্ক্ষা। এইখানেই না কাব্যের সার্থকতা, শিল্পের ইন্দ্রজাল—অনিবার্যতা—inevitability: গভীরে আমরা কী দেখি, কী গাই আমরাই কি জানি উপর-উপর-ভেসে থাকার মুহূর্তে? কবির আছে তৃতীয় নয়ন, তৃতীয় শ্রুতি—তিনি দেখতে পান শুনতে পান এ-অগম দর্শনের, এ-গহন গানের রেশ—ধরিয়ে দেন, দেখিয়ে দেন কোন্ দোলায় কী কাঁপন জাগা উচিত—আমাদের প্রাণের বাষ্পলোকে করেন বিদ্যুৎকটাক্ষ—অম্‌নি ছায়া-চেতনার দিগন্ত অবধি ফেটে পড়ে আলো—আবেগের আলো, আনন্দের আলো, অঙ্গীকারের আলো—আর ঘুমন্ত

মনের মাটিও জেগে ওঠে আশ্চর্য ভূমিকম্পে! আঁখরে সত্য কবি-কীর্তনী পারেন এই ভূমিকম্পের স্পন্দন জাগাতে।

আর শুধু কি আঁখরে? কত বিরহে মিলনে, আবেগে উচ্ছ্বাসে, পূজায় নিবেদনে কীর্তনের উচ্ছল প্রেম চেয়েছে নাট্যসঙ্গীতের অদিগন্ত রূপসাগরে ভাবের খেয়া বেয়ে চলতে—শরণার্থী ও শরণ্যের হাস্যালাপে, অশ্রুব্যথায়, রাসে ঝুলনে, গোষ্ঠে ব্রজে, যমুনাতটে কদমতলায়—সে কী ছবির পর ছবির সমারোহ, আশার পর আশার শোভাযাত্রা, স্বপ্নের পর স্বপ্নের জয়ধ্বনি! অপেরা কোথায় পাবে আধ্যাত্মিক প্রেমের এ অফুরন্ত ঐশ্বর্য, সান্তের সঙ্গে অনন্তের এ অপরূপ সাযুজ্য-রহস্য, সাঙ্গহীন স্বার্থ-বিলোপে আত্মার পরমার্থলাভের এ অতৃপ্ত পিপাসা?

তবে এখানে একটা কথা ভুললে অপেরার প্রতি অবিচার হবে: যে, আধ্যাত্মিকতা অপেরার লক্ষ্যই নয়—সে মূলত ঐহিক, দৈবিক নয়। তাছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে যে, অপেরা হ'ল ওদের দেশের সঙ্ঘ-বাদী জীবনের অভিব্যক্তি—যার গোড়াকার কথা হ'ল ব্যূহরচনা, দলগড়া—বহুস্বরের, বহুযন্ত্রের, বহুকণ্ঠের: এক কথায়—অর্গ্যানিসেশনের। তাই অপেরা চেয়েছে—প্রাণশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের কল্লোল, জনতার বহুমর্মর, হৃদয়ের অজস্র রূপব্যঞ্জনা—ধ্বনি-সমবায়ে; অপেরা চেয়েছে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য ও জনসঙ্ঘের আবেদনের মধ্যে দিয়ে জাগতিক মানবিক হাজারো বিরুদ্ধ গতির সুর-সামঞ্জস্য। কীর্তন চেয়েছে ঐকান্তিক ভাগবত প্রেম প্রীতি, যদিও একটি মাত্র পথে নয়—হৃদয়াবেগের নানামুখী ভঙ্গিতে শাখায়িত হ'য়ে, পল্লবিত হ'য়ে, পুষ্পিত হ'য়ে: অভিমানে, সখ্যে, দাস্যে, পূজায়, বেদনায়, মৃদুহাস্যে, আনন্দে, বিরহে, মিলনে, অশ্রুতে—সর্বোপরি অসীমের পায়ে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে, বরণের শরণা-গতিতে। আধ্যাত্মিক নাট্যসঙ্গীত হিসেবে তাই কীর্তনের দোসর নেই। কথাকালি, জাভার নৃত্য প্রভৃতির রস কীর্তনের আত্মিক নাট্যরসের তুলনায় অগভীর—ছেলেমানুষি। কারণ অতি স্পষ্ট: কীর্তনের লক্ষ্য মানুষ নয়, ওর লক্ষ্য ভাগবত করুণা—হাবে ভাবে, আবেশে আবেগে, রূপে রসে, রঙে ঢঙে। মানুষের হৃদয়রাজ্যের

গভীরতম অনুভূতি—প্রেম : কীর্তনে এ-প্রেমের ঢল নেমেছে দুর্ণিবার' প্লাবনে, অশ্রান্ত কল্লোলে, উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গে। তাই হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের রাগশুদ্ধির বাঁধাবাঁধির সব বাঁধকে সে খড়কুটোর মতন ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সুরশাসকদেরকে বলতে পারল : "কার সাধ্য রোধে মোর গতি!" বলতে পারল তালনিয়ন্তাদেরকে : "আমি কাউকে মানি না।" বলতে পারল মার্গসঙ্গীতের ঐতিহ্যকে : "তোমাকে আমি পেলেও ঢেলে সাজাব মনে রেখো কিন্তু—কোনো আপত্তিই শুনব না—শুনব না—শুনব না।" এক কথায় কীর্তন আপন ধারায়, আপন স্রোতে সৃষ্টি করতে পেরেছে এক বিপুল পটভূমিকা—হৃদয়কে কেন্দ্র ক'রে, প্রেমকে প্রতিমা ক'রে, ভক্তিকে আরাধ্য ক'রে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, প্রেমের ভক্তির আবেগকে যাঁরা অবিশ্বাসের চোখে দেখেন তাঁদের কাছে কীর্তনের সুরকে হৃদয়ালুতা মনে হবেই। কেননা শুধু মস্তিষ্ক বা মনের বিচার দিয়ে ওর নাগাল মিলবে না। ওর যে-নাট্যরূপ, যে মেলডিকরূপ যে-ছন্দেররূপ সে-সবের কলাকারু নেই একথা অবশ্যই বলি না—কিন্তু তার মহিমা ও প্রবণতা হ'ল একান্তভাবেই অন্তর্মুখী—অন্তর থেকেই তার উদ্ভব, অন্তরের প্রতি আবেগের ভাগবত উদ্বোধন ও উচ্ছল আত্মোৎসর্গেই তার সার্থকতা। তাই শুধু সুরজ্ঞ হ'লে যেমন কীর্তন গাওয়া যায় না তেম্নি বোঝাও যায় না। ওর রসজ্ঞ হ'তে হ'লে হ'তে হবে প্রেমপন্থী, ভক্তিবল্লভ : ভাগবত ভক্তিকে বাদ দিয়ে কীর্তনের বিচার হ'ল হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের সমালোচনেরি সামিল : বিড়ম্বনা।

কীর্তন সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভালো ক'রে বলা হ'ল না—ওর কাব্যশিল্প, নাট্যশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, আঁখরে নিত্য নূতন কল্পনা-শিল্প, রচয়িতার মূল সুরমূর্তি বজায় রেখেও গায়কের নিজের সুরকারু ও ভাবপ্রতিভাকে ফলিয়ে তোলার শিল্প—কত কী। এর প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ লেখা যায়। সে কাজ পরে করার ইচ্ছা রইল। এখানে শুধু একটি কথা না ব'লেই পারছি না। সেটি এই যে কীর্তন মহান্ সঙ্গীত হ'লেও তার বিকাশ যে

আর হ'তে পারে না এমন নয়, যেমন ধরা যাক সুরের দিকে। এ পর্যন্ত কীর্তন মূলত ভাবপ্রধান কাব্যপ্রধান হ'য়ে এসেছে। কিন্তু ভাব তো রূপের অন্তরায় নয়—সাথী। কাব্য তো সুরের পরিপন্থী নয়—মিতা। কীর্তন এ-যাবৎ সুরের সূক্ষ্ম শ্রুতিবিলাসের পথে যায় নি—যেমন গেছে হিন্দুস্থানি সঙ্গীত। কিন্তু তাই ব'লে সুরের সূক্ষ্ম কারুকলা কীর্তনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হবার কোনো কারণই নেই। কীর্তনজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বেশ সুন্দর ক'রে বলেছিলেন এ-কথাটি: "দিলীপ, কীর্তনে সুরের কাজ কেন হবে না বলো দেখি? কণ্ঠ-সাধনায় সুর-সাধনায় সিদ্ধ গুণী কীর্তন গাইলে তা আরও অপরূপ হ'য়ে উঠবে নিশ্চয়ই। কীর্তনের ভাব বজায় রেখে সুরের আরও বিকাশ খুবই সম্ভব এবং সেই কাজই করা উচিত তোমাদের—যারা হিন্দুস্থানি পদ্ধতিতে সুরের সাধনা করেছ, কিন্তু এজন্যে আগে ভালোবাসতে হবে কীর্তনকে—চিনতে হবে তার মহত্তম বিকাশকে—জপ করতে শিখতে হবে তার মূল মন্ত্রটিকে। এ-প্রেম বিনা কীর্তনের জগতে কোনো নব সৃষ্টিই করা যাবে না। আমার খুব দুঃখ হয় দেখে যে, সুরে-অসিদ্ধ লোক কীর্তনে সুর-সৃষ্টি করতে পারে না ব'লে সেই অক্ষমতাতেই ধরা হয় কীর্তনের স্বকীয় সুর-বন্ধ্যাত্বের চরম প্রমাণ।" কথাটা মনে লেগেছিল, এবং তার পরে কীর্তনে নানা রচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কীর্তনেও ঢের বিকাশের পথ আছে। অবশ্য এ-বিকাশ হয়ত সব সময়ে মামুলি কীর্তনভঙ্গি হবে না। না-ই হ'ল। কীর্তনের কাব্যশ্রী ও প্রেমশ্রীর সঙ্গে সুরশ্রী এসে মিললে সে-সমন্বয়ে যে অভিনব ত্রিবেণী-সঙ্গমের উদ্ভব হবে সে-ও হবে এমনিই এক নবসৃষ্টি যেমন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুরকারদের বাংলা গান হয়েছে অভিনব সৃষ্টি আধুনিক বাংলা সঙ্গীতে—যা বাংলার গৌরব। আর এ গৌরবের ভিত্তি হ'ল বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতা রসার্দ্রতা। তাই রবীন্দ্রনাথ ২৯-৭-১৯৩৬ তারিখে একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন:

"কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর

মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে ব'লে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সঙ্গীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌবব অনুভব করি।...কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে—রাগ-রাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারিনে হিন্দুস্থানি গাইয়ে কীর্তন গাইচে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে এতে স্বর-সমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানি পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না? অর্থাৎ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের স্বরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

একথা অংশত সত্য সন্দেহ কি? আর সেই জন্যেও কীর্তনকে আরো বলা চলে বাঙালির একমাত্র ক্লাসিকাল জাতীয় সঙ্গীত। কেবল একটা কথা: হিন্দুস্থানি সঙ্গীতেব কিছু আমেজ কীর্তনে আছে ব'লেই এ-সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, কীর্তন হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের "মূল উপাদানের" কাছে হাত পেতেছে। কবির ভাষায় নির্ভয়েই বলা যায় যে, এ-বিষয়ে কীর্তন সম্পূর্ণ অনন্যতন্ত্র। সেই জন্যেই কীর্তনের রাগ-রাগিণী নিয়ে নতুন হিন্দুস্থানি রাগের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়। সম্ভব হ'ত যদি কীর্তনের মূল ধারাটি কাব্যসুরের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম-বিবাগী না হ'য়ে হ'ত শুধু আলাপের একমুখী গঙ্গোত্রীমিলনোন্মুখ।

কিন্তু কীর্তনের মহিমা-তর্পণে এসব বিচার অবান্তর। কীর্তনের রসিক হ'তে হ'লে চাইতে হবে সব আগে গভীর হৃদয়াবেগের দাম দিতে শেখা, ভাগবত প্রেমের উদাসী হওয়া, ভক্তির সাধনাকে বরণ করতে চাওয়া। এ-সাধনার আলো অন্তরাত্মায় পড়লে সংশয়গ্রন্থি ভিন্ন হবে,

মনে প্রত্যয় জাগবেই জাগবে যে, প্রেমের দিশারি ক'রে যে-সঙ্গীত অচিনের অভিসারে চলে কোনো একান্ত-ঐহিক এস্থেটিক অণুবীক্ষণ দিয়ে তার রসঘন আত্মার নাগাল মেলে না।

১৫

বাউল

কীর্তনের প্রসঙ্গে বাউলের উল্লেখ করেছি। বলেছি যে সৃষ্টির বহুধা বৈচিত্র্যে কীর্তনের সঙ্গে বাউল সমান নয়। কিন্তু তার মানে নয় যে বাউলের সাঙ্গীতিক বা সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। ওর সত্যিই একটা স্থান আছে সঙ্গীতে, তথা কাব্যে। ওর বৈশিষ্ট্যে একটা নিটোল সুডৌল স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে যার রূপরস কুসুমসম্ভারে, পল্লবমর্মরে, বহুমুখিতায় ঐশ্বর্যশালী না হ'লেও ও বঙ্গ-বীণাপাণির সুরবাহারে একটি সুন্দর সুকুমার তন্ত্রী সন্দেহ নেই: প্রধান তন্ত্রীদের সভায় যদি না-ও হয়, চিকারির পরিষদে ওর স্থান আছেই। সারি ভাটিয়ালি হ'ল নদীর সুরে বাঁধা নাবিক মাঝিদের দিলদরিয়া গান: "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে—আমি আর বাইতে পারলাম না—সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে—তবু তোর মনের নাগাল পেলাম না—" নামে বিখ্যাত ভাটিয়ালি গানটি সবাই শুনেছেন ব'লে আর উদ্ধৃত করলাম না। এদের বৈশিষ্ট্য কম—কিন্তু আছে কিছু। এ-বৈশিষ্ট্য কি-প্রকৃতির, গেয়ে ছাড়া তার ব্যাখ্যান সম্ভব নয়—কিন্তু একটু কান পেতে শুনলেই টের পাওয়া যায় কোথায় ওদের দরদ, ব্যথা। কখনো ওরা স্নিগ্ধ, কখনো শান্তিস্নিগ্ধ, কখনো গন্ধবহ, কখনো অশ্রুমুখী। কিন্তু বাউলের কথাই বলি—যেহেতু বাউলের সম্বন্ধে বলার কথা যথেষ্ট আছে।

সবাই জানেন, বাউলের উদ্ভব আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে: বাউল শব্দটি সম্ভবত হিন্দি বাউরা (পাগল) শব্দেরই অপভ্রংশ।

বাউলদের ধরণধারণ ক্ষ্যাপাটে গোছের ছিল তো বটেই—হয়ত সেই জন্যেই এ-নামের চল হয়েছিল প্রথমটায়। এ-বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা হয়ত শক্ত কিন্তু এটা বোধ হয় বলা যায় যে বাউলরা খৃষ্টান মিসটিক না হোক, ঘরছাড়া, আচারতন্ত্রবিমুখ সুফী ফকীর দরবেশের আত্মীয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে সুফী গজল ও হিন্দু বাউলের species আলাদা হ'লেও genus এক। একই প্রেরণার কুঙ্কুমাভা উভয়েরই অঙ্গে—যদিও প্রসাধন ব্যঞ্জনায় ভেদ আছে। সুরে কাব্যভঙ্গিতে রচনার ঢঙে ওদের মিল নেই কিন্তু তবু দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্যে ওদের চেনা যায় সগোত্র ব'লে। বাউল সুফী সাধককবিরা ধরাচারী হ'য়েও হাত বাড়ায় অধরার পানে যেখানে তার আসল আস্তানা। ওরা যে জানে—এখানে যে-আলো নামে সে-আলোর উৎস সেখানে। তাই বাউলদের কান্না: "আমার মনের মানুষ যে রে—আমি কোথায় পাব তারে?" এই আত্মার আত্মীয়ের জন্যেই ওদের নিরুদ্দেশ যাত্রা: "হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।" এই চিরাত্মীয়ের জন্যে ওরা হায় হায় করে কেন না সেই যে আলোর গোমুখী তাকে না পেলে জনপদবাহিনী সুরধুনীর সুরকে সে চিনে নেবে কী ক'রে? এই সুরটি ওরা খোঁজে কারণ এরই কষ্টিপাথরে চায় ওরা যাবতীয় দৈনন্দিন নাগরিক সুরকে কষতে, এই বিশ্বাতীতের রঙে বিশ্বরূপের যাবতীয় রঙকে রঙিয়ে তুলতে, এরই সমগ্রতার ভাবে দৈনিক হাজারো বিচ্ছিন্ন ভাবের প্রতি টুকরোকে সমগ্রতা পরিপূর্ণতা দিতে। তাই বাউল দরবেশরা বৈদান্তিকের মতন চায় না তো শুধু ভাব, চায় সেই সঙ্গে রূপও। শুধু অদ্বৈত উপলব্ধির অচল প্রতিষ্ঠায় নিরাকারের সীমান্তহীন অবর্ণ দ্যুতিই ওদের কাম্য নয়—আকারে রঙে ব্যঞ্জনায় এ-দ্যুতির আত্মপ্রকাশ—ধরা-ছোঁওয়া-যায় এমন রূপরাগ বর্ণচ্ছটাও ওদের ঈপ্সিত। মানুষের মধ্যে ওরা ছুঁতে চায় মানবাতীত সত্যকে। প্রকাশলোকের অন্তরে শুনতে চায় অপ্রকাশলোকের মন্ত্র, খণ্ড বেদনার মধ্যে দেখতে চায় নিস্তারিণীর অখণ্ড উল্লাস।

অনেক সময় ওদের স্বপ্নের নিহিত সুরটি যেন ফুটি ফুটি ক'রে ফোটে না···কিন্তু তবু যে অস্ফুটের মধ্যেও এমন একটা আবেশ মেলে যাতে মন ওঠে ভ'রে, যেহেতু বুঝতে পারা যায় যে জীবনের বহু অসঙ্গতির মধ্যেও ওরা খুঁজেছে একটা ঐক্যের সুর, বেসুরার কলরোলেও খুঁজেছে সুরেলার কলনৃত্য। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী : কাজেই বৈরাগী বৈদান্তিকের দল পেলেন অরূপের অকল্লোল-স্থিতি, আউল বাউল সুফী সন্তরা পেল রূপের হিল্লোল ভাবের সোহাগ। ওরা চিন্তালোকে খানিকটা দার্শনিক হ'লেও ভাবলোকে কবি—স্বভাব-কবি। এ-কবিত্বের, সুরের ভাবের রূপরস যিনি একটুও পেয়েছেন তিনি জানেন যে, সব সময়ে নির্মল কাঁচা সোনার সোহাগে রঙিয়ে না উঠলেও বীণাপাণি তাঁর কেয়ূরকঙ্কণের সোনার ছটা দিয়েছেন ওদের স্বপ্নাকাশে ছিটিয়ে। এই উদাসী বিবাগী সুরটিই সুফী গজল তথা বাউলের বাদী সুর। বেশি দৃষ্টান্ত দেবার স্থানাভাব। তাই দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই পাশাপাশি :

এক মেহমাঁকা গুজর্ দেখো তো দো মন্‌জ়িল্‌মে হৈ।
উন্‌কি সুরৎ আঁখমে—উন্‌কি মহব্বৎ দিল্‌মে হৈ ॥
ঢুঁঢতা ফির্তা হৈ তু জো চীজ় তেরে দিল্‌মে হৈ।
দেখ্ ও মজ্‌নু! তেরি লৈলা ইসি মহমিলমে হৈ ॥
রোবে হুস্নে য়ারসে খুল্‌তি নহি অপ্‌নি জ়বাঁ।
কিস্ তরে উন্‌সে কহৈঁ—জো কুছ্ হমারে দিল্‌মে হৈ ?

ভাবানুবাদ :

এক অতিথিই দুই নিকুঞ্জে গুঞ্জে উছল দুই সুরে :
তার মাধুরীই—আঁখিতারায়, তার প্রেমই ভায়—প্রাণপুরে।
ফিরিস খুঁজে যে-মণি তুই—জ্বলছে তোরি অন্তরে :
বিরহী! তোর বিরহিণী আছে কাছেই—নয় দূরে।
তার রূপে মন মজ্‌ল—বচন ডুবল নিথর সিন্ধুমাঝ :
মনের কথা কেমনে আর বলব আমার বন্ধুরে ?

এই সঙ্গে দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্ একটি সেকেলে বাউলের :

আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে ॥
গভীর কালোয় যমুনাতে চলেছে লহরী,
(কালোয় ঢালা যমুনাতে রসের লহরী)
(ও তার—জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী)
(ও তার—জলে ভাসে কানে আসে সাঁইয়ের বাঁশরী)
(আমি) বাইরে ছুটি বাউল হ'য়ে সকল পাসরি'
(আমি—বাইরে ছুটি ঘর ছাড়িয়ে)
(শুধু) কেঁদে মরি ভাসাই কুন্ত রসের নীরে।
আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।

দুয়ের মধ্যেই ফুটেছে গভীরে মজ্জনের সুর। ইন্দ্রিয়কে সুফী ও বাউল উভয়েই চেয়েছে ফেরাতে অতীন্দ্রিয়লোকের পানে, উপনিষদের "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্"-এর পানে। বাউলে এ-সুরটি এত স্পষ্ট যে যে-কোনো আধুনিক বাউলেই এ-সুর গুণগুণিয়ে উঠতে না উঠতে প্রাণ সাড়া দেয়: এ বাউলই বটে। সুকবি অজয়কুমারের একটি অত্যাধুনিক বাউলের পাশে রুমির একটি প্রাচীন সুফী গজল রেখে দেখাতে চেষ্টা করি কোথায় ওরা একসুরে বাঁধা। এ দুটি গানের ইংরাজি অনুবাদ দিলাম এই সাদৃশ্যটুকু দেখাতেই—কেননা সুফী গজলের ইংরাজি কাব্যানুবাদের সঙ্গে আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকলেও বাঙালির ঘরোয়া বাউলের কাব্যানুবাদ বড় একটা হয় নি।

রুমির এই বাউলভঙ্গি গানের নাম দেওয়া যাক "অগ্নিহোত্র"।

[বাউল সুরে গেয়]

কথার মায়ায় আর কতকাল থাকবি ভুলে মন?
অন্তরে তোর দে জেলে প্রেম-সূর্য-আবাহন।
জাগিয়ে প্রাণের যজ্ঞদ্যুতি
চিন্তাবিলাস দে আহুতি
মঞ্জু বাণীর রূপসভা কর্ দাহন—কথা শোন্!
(ভোলা মন, মনরে আমার!)

ছায়া-কূজন নয়—চাই আলো-প্রেমের আরাধন।
রঙের ঢেউয়ে মাতে যারা
রঙের ভেলায় ভাসুক তারা :
রইবে কি সে-ও তাদের দলে—পাবক যাহার পণ ?
ছায়ার ছায়া নয়—চাই আলোর আলোর আরাধন।

এর অনুবাদ করা যেতে পারে এই ভাবে :

HYMN OF FIRE

How long live wed O soul, to words dream-spun ?
Kindle the yearning flame of Love's own sun.
Invoke the luminous day,
Burn fancy's flickering play,
Wither the song-gardens of siren-bloom ;
Rise, radiant Love, life's shadow-whispers doom.
Let the hue-hunter float
Upon his irised boat :
Not he—who stakes his all to adore the fire :
Come, light of lights! O gloom of glooms, retire!

এর সঙ্গে নেওয়া যাক অজয়কুমারের অচিন ফুলের সুন্দর বাউলটি —এত সুন্দর খাঁটি বাউল কমই শোনা যায় আধুনিক কবিদের রচনায় —মনস্বী সাধক দার্শনিক কৃষ্ণপ্রেম (Ronald Nixon) এ-গানটি প'ড়ে চমৎকৃত হ'য়ে আমাকে লিখেছেন এর খুবই তারিফ ক'রে—কোনো মিস্‌টিক সাধনা যাঁরা করেছেন এ-শ্রেণীর গানে তাঁদের হৃদয়ের তন্ত্রী বেজে উঠবেই। অজয়কুমারের আরো কয়েকটি এ-ধরণের গান প'ড়ে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দও মুগ্ধ হ'য়ে লিখেছেন যে এদের মূল প্রেরণা আত্মিক (psychic)। আশাকরি অজয়কুমার এ-রকম গান আরো অনেক লিখবেন :

আমার) মনের মাঝে মন রয়েছে :
সেথায় ফোটে অচিন ফুল !
সবাই বলে : "ওরে পাগল,
এ শুধু তোর মনের ভুল।"

আমার) আঁখির মাঝে রয় যে-আঁখি
সে তো কভু দেয় না ফাঁকি,
কয় সে ডেকে : "দেখেছি ফুল,
অরূপ সে যে রূপের মূল।"

আমার) সেই সে-ফুলের সুবাস ল'য়ে
কত বিশ্ব-কমল জাগে,
সেই ফুলেরি আলোর ছোঁওয়া
কোটি তপন চাঁদে লাগে।

কেউ দেখে না কোথায় আছে
আছে জানি প্রাণের কাছে,
আমি যে তার গন্ধপাগল
সবাই মোরে কয়—"বাতুল"।

এর অনুবাদ করা যেতে পারে এই ভাবে :

THE MARVEL BLOOM

Within my heart is shrined a heart:
There blows a strange bloom hyaline!
"Thou ravest, fool," they laugh, "alas,
'Tis but one more day-dream of thine!"

The eye that gleams within the eye
Nor fancies nor e'er tells a lie:
"Hearken," it sings, "I've seen the Formless:
The source of all Forms' beauty-shine."

That flower of flower's perfume has petalled
    The lotus-legions of the world,
Her golden glow caresses myriad
    Suns and moons in sky empearled.

None may divine where she's concealed,
I know in soul she lives revealed,
And thrill to her ambrosial madness :
    "Folly", they call this joy of mine.

শুনলেই মনে হয় না কি এ-দুটি ভাবের মধ্যে রসের মধ্যে একটা সহজ আত্মীয়তা রয়েছে—একই রঙের স্বপ্ন উভয়ের চোখে, একই সুরের রেশ উভয়ের অনুরণনে, একই আনন্দের উচ্ছলতা উভয়ের প্রবাহে—যার গোড়াকার কথা হ'ল ভাবের অন্তর্মুখিতা ও প্রকাশের সরলতা? আর এই সরলতার মধ্যে বাজে এক অপূর্ব মেঠো রাগিণী—যার বাদী স্বর হ'ল হৃদয় থেকে উৎসারিত গানের সুর, সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর সুর, ঘরছাড়া বাঁশির ডাকে অভিসারিণী হিয়া-রাধার ঐহিক বাসনাবিসর্জনের সুর।

বাউলের এই সাদামাটা মেঠো সুরের সম্বন্ধে আরো দুএকটি কথা বলবার আছে। বাউলের এই যে সুর এ বড় সরল, কিন্তু সুন্দর। চাঁদনি রাতে মেঠো বাঁশি শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে গেয়েছিলেন: "কে গায় ওই?...বহুকালবিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? ...কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদীসৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্ধাবৃতা সুন্দরীর নীলবসনের ন্যায় শীর্ণশরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিণী সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন..."—শুনতে না শুনতে মন যায় উদাস হ'য়ে। বাউলের সুর শুনেও তেম্‌নি হয়—কেবলই ঘুরে ফিরে মনে হয়—"কে গায় ওই? বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের...।" মনে পড়ে কবি ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের :

"But trailing clouds of glory do we come
From God who is our home !"

মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের : "যেন পথহারা কোন্ বৈরাগীর একতারা !"

পড়ে, কারণ বাউলের স্বকীয় সুরটি ঐ একতারার মৃদু গুঞ্জনেই অনুরণিত। তাতে চাঁদের আলোয় বাঁশির স্মৃতি-জাগানিয়া কী একটা ব্যথা জাগে। রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যথাকে তাঁর "পঞ্চভূত"এ ইঙ্গিতময়ী ভাষায় বলেছেন বড় সুন্দর ভঙ্গিতে :

"বাঁশির শব্দে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু কিসের স্মৃতি তাহার কোনো ঠিকানা নাই। যাহার কোনো নির্দিষ্ট আকার নাই তাহাকে এত দেশ থাকিতে স্মৃতিই বা কেন বলিব, বিস্মৃতিই বা বলিব না কেন?...অতীত জীবনের যেসকল শতসহস্র স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতন মহাদেশের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া যাহারা বিস্মৃতি-মহাসাগররূপে নিস্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা কোনো কোনো সময়ে চন্দ্রোদয়ে অথবা দক্ষিণের বায়ুবেগে একসঙ্গে চঞ্চল ও তরঙ্গিত হইয়া উঠে, তখন আমাদের চেতন হৃদয় সেই বিস্মৃতি-তরঙ্গের আঘাত অভিঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যপূর্ণ অগাধ অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহাবিস্মৃত অতিবিস্তৃত বিপুলতার একতান ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।"

কিন্তু এ-ধরণের উচ্ছ্বাসের মস্ত বাধা এই যে, "কি বললে—ভালো, ক'রে গুছিয়ে বলো তো বৎস"—বললে আর বাক্‌স্ফূর্তি হয় না। দরদের কান-পাতা স্বপ্নছোঁওয়া অভ্যর্থনা বিনা এ-ধরণের কথা বলতে যাওয়ার নাম বিড়ম্বনা। রবীন্দ্রনাথেরি ভাষায় বলি : "একটা তর্কের কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মানুষ তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভাবের কথায় কেহ মাঝখানে ব্যাঘাত করিলে বড়োই দুর্বল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শ্রোতার সহানুভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শ্রোতা যদি বলিয়া উঠে, কী পাগলামি করিতেছ,

তবে কোনো যুক্তিশাস্ত্রে তাহার কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

বাউল ভাটিয়ালি কীর্তন প্রভৃতি ভাবাত্মক সঙ্গীত সম্বন্ধে একথা বিশেষ ক'রে খাটে ব'লেই ভাবুক কবির করুণ অসহায়তার দোহাই পাড়লাম। মার্গসঙ্গীতের বহুবিচিত্র বহুসমৃদ্ধ স্বরকোবিদবৃন্দকে মেঠো বাউলের একতারা-সঙ্গতী স্বপ্ন-উচ্ছ্বাসী গান শুনতে নিমন্ত্রণ করতে ভয় করে। ভয় এজন্যে নয় যে বাউল শুনে তাঁরা বলবেন : "এ কী! এতে মার্গসঙ্গীতের বা সংধ্বনিসঙ্গীতের বা অপেরাকীর্তনের বহুমুখী ধ্বনিধারা কই, ঐশ্বর্যসম্ভার কই, সমৃদ্ধ আনন্দ কই?" কারণ আমরা তো গোড়ায়ই মেনে নিয়েছি যে বাউলকে উচ্চবিকশিত সঙ্গীতের পাংক্তেয় করাটাই ভুল হবে। ওদেশেও দুরকম গান আছে একথা ভূমিকায় বলেছি : folk-song এবং art-song; বাউল পড়ে ঐ লোকসঙ্গীতেরই এলাকায়। কাজেই বহুসমৃদ্ধ শিল্পসঙ্গীতের গজকাঠি দিয়ে ওকে মাপতে যাওয়া চলে না। বাউলের পৃষ্ঠপোষক তো রাজরাজড়ারা নন। তার এ-স্পর্ধাও নেই যে গুণিমানিবিদ্বৎসভায় সে আসর জম্‌কে বসবে, তার কাব্যমণিমঞ্জুষা থেকে স্বরদীপালির সহস্রধারা উচ্ছলিত হবে, আর রসজ্ঞবৃন্দ বিস্ময়ে ঔৎসুক্যে উল্লাসে জয়ধ্বনিতে আত্মহারা হ'য়ে উঠবেন —রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি' দেয় তাহা,
সভার লোকে শুনে' অবাক্ মানে, সঘনে বলে "বাহা বাহা।"

বাউলকে দেখতে হবে তার স্বস্থানে—নিজের ভূমিকায়—তার কণ্ঠে শুনতে হবে "যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে-শিশু তারই কান্নার সুর।" *

অবশ্য এখানে শ্রেষ্ঠ অনবদ্য বাউলের কথাই বলছি মনে রাখতে হবে যেখানে সাধনার উপলব্ধি ফুটে উঠেছে এই ধরণের অপূর্ব গানে :

* মৌলবী মুহম্মদ মন্সুর উদ্দিন সাহেবের "হারামণি" নামে বাউল-চয়নিকায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

মহাভাবের মানুষ হয় যেজনা—
তারে দেখলে যায় রে চেনা :
ও তার আঁখি দুটি ছল ছল, মুখে মৃদু হাসিখানা।
সদাই রে তার শান্তরতি হৃদকমলে জ্বলছে বাতি
রসিক সুজনা :
ও তার কামনদীতে চর পড়েছে, প্রেমনদীতে জল ধরে না।

কারণ যতই বলি না কেন, এ-যুগে শিল্পের সর্বাঙ্গীণ সুষমা ও নিখুঁৎ সৌন্দর্যের আদর্শকে আমরা গেঁয়ো শ্রীহীন হৃদয়ালুতার খাতিরে আর বাতিল করতে পারি না। যে-অধর স্ফটিকপাত্রের সুধার কাঙাল তার সামনে টোকো গুড়ের মেটে-ভাঁড় ধরতে বাধে—বাধা উচিতও বৈ কি। তাই দরদ সুন্দর জিনিষ এবং শ্রেষ্ঠ বাউলের মূল আকুতিটি অপূর্ব একথা সশ্রদ্ধে মেনে নিয়েও আধুনিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতার এ-বাণীকে আমরা নাকচ করতে পারি না যে :

"Who seeks perfection in the art
Of driving well an ass and cart,
Or painting mountains in a mist,
Seek God although an atheist."
—*Francis Carlin*

শিল্পের রচনারাগে সহে না যে মালিন্যের কণা,
ম্লানতম যাত্রাপথে তীর্থচরণের ছন্দ চায়,
বর্ণদীপ্তিহীন কর্মে পূর্ণসিদ্ধি যার আরাধনা—
নাস্তিকও সে হয় যদি—সর্বেশ-সঙ্গমে তরী বায়।

বড় সুন্দর কথা। আর শুধু কি সুন্দর—শ্রুতিমধুর? সেইসঙ্গে এক মহীয়ান্ ভরসার বাণী বেজে ওঠে না কি এ-আদর্শচারণে? সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার যে-তৃষ্ণা, তার বীজ আমাদের অন্তর-অতলে বপন করলে কে?—সেই পরমসুন্দরই তো—যাঁকে স্মরণ ক'রে খৃষ্ট বলেছেন : "Be thou perfect even as thy Father in heaven is perfect"; সেই

সত্যশাশ্বতই তো—যাঁকে স্মরণ ক'রে কবি কীট্‌স্ বলেছেন: "I am certain of nothing but of the holiness of the heart's affections, and the truth of imagination. What the Imagination seizes as Beauty must be Truth."

হিয়ার প্রেমের শুভ্র পুণ্যবাণী জানি আমি সার—
তারি সত্য-অঙ্গীকারে। সুন্দর অন্তর-কল্পনার
আনন্দ-পূজারী আমি: নম্রনতি অর্ঘ দেয় যারে
সৌন্দর্যের গন্ধদীপে—চিরন্তন সত্য মানি তারে।

না মেনে উপায় কী—সত্যে যাঁর প্রতিষ্ঠা রূপেও তো তাঁরই চিরস্থিতি ছন্দিত হ'য়ে এসেছে—যুগে যুগে দেশে দেশে। শিল্পী যে শিল্পকে ক্রমশই নিখুঁৎ ক'রে গড়তে চাইছেন এ-দুরাশার মূল প্রেরণাও ঐ আস্তিক্যবুদ্ধি থেকেই তো আসছে, যেহেতু দুয়েরি অবস্থান একই অস্তিত্বে। এই জন্যে বাউল ভাটিয়ালি কীর্তনেরও যেখানেই সৌন্দর্যচ্যুতি হবে, সুষমাবিভ্রাট ঘটবে—সেখানেই প্রতি সুন্দরব্রতীর আপত্তি করবার এক্তিয়ার থাকবেই। সুতরাং একথা বলবার অধিকার আমাদের মঞ্জুর যে, অধিকাংশ মেঠো "গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হ'য়ে দংশিয়াছেন আমার গায়" শ্রেণীর ভাটিয়ালি বা অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রার রচিত কুশ্রী বাউল গান গাওয়া সুকুমারমতি নরনারীর সাজে না। আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে অসুন্দরের সমর্থন করা চলে না কারণ আধ্যাত্মিকতার পরমতম বিকাশ সত্যে এবং সত্যের একটা মস্ত কষ্টিপাথর রূপে। অবশ্য সেই সঙ্গে আরো একটা কথা বলা চাই: যে, কোনো শিল্পের একটি আকস্মিক বা সাময়িক হালচাল দেখেই তাকে আন্দামানে অন্তরীণ করবার আদেশ দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এতে ক'রে বিচারকের সুবিচারে কলঙ্ক না অর্শাতে পারে, কিন্তু জীবনে সুবিচারই তো একমাত্র আরাধ্য নয়: সেই সঙ্গে থাকা চাই কল্পনা, দরদ, প্রেমের ভবিষ্য-দৃষ্টি। তাই সেকেলে বাউলের ভাটিয়ালির মধ্যে অনেক দোষ আছে এটুকু বললেই তাকে পুরোপুরি ঠিক্ চোখে দেখা হবে না। দেখতে হবে—প্রথম, তার দোষ

থাকলেও গুণ কিছু আছে কি না; দ্বিতীয়, তার কোনো ভবিষ্যৎ মহৎ বিকাশের সম্ভাবনা আছে কি না।

একথা বলছি শুধু যে একটা উদার নীতির পাঠ দিতে তা নয়: বলছি—দরদী কবির হাতে প'ড়ে গেঁয়ো মেঠো বাউলের কী সুন্দর পরিণতি ইতিমধ্যেই হয়েছে সেটা লক্ষ্য ক'রে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদের হাতে বাউলের কী চমৎকার বিকাশ হয়েছে ও নিশিকান্ত অজয়কুমার প্রমুখ সুকবিদের হাতে হচ্ছে দেখে কার না আনন্দ হয়? রবীন্দ্রনাথের "নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন, হবেই হবে" কার মনে না ভরসা আনে? অতুলপ্রসাদের "মিছে তুই ভাবিস মন, তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন"—সুরে কার হৃদয় না গান গেয়ে ওঠে? দ্বিজেন্দ্রলালের "গালভরা মা ডাকে—মা ব'লে ডাক্ মা ব'লে ডাক্ মা ব'লে ডাক্ মাকে" গানে কার মন না ভক্তিরসে নিষিক্ত হ'য়ে ওঠে? আধুনিক কবিদের মধ্যে নিশিকান্তের একটি অপরূপ বাউল ও জ্যোতির্মালা দেবীর একটি সুন্দর ভাটিয়ালি উদ্ধৃত ক'রে এ-পর্বের ইতি করি—যে-গান দুটি শুনে বহু দরদী শ্রোতা গভীর আনন্দ পেয়েছেন—গ্রামোফোনেও এরা শ্রবণীয় এত নিটোল এদের কাব্যরূপ।

আঁধারের এই ধরণী আলোর লীলায় তুলব ভরি'।
আকাশের উদয়চাঁদের স্বপনসুধায় পড়ব ঝরি'।
কে আমার মনের মাঝে
খোলে দ্বার মিলন-সাঁঝে?
এ সোনার শশীর পরশ দিলো আমায় উজল করি'॥

সাজাবো ধূলার গলে পারিজাতের মালা গাঁথি'।
বাজাবো বাঁশের বাঁশি সুদূর তারার সুরে সাধি'
তোমাদের ক্ষণিক সুখে—
বেদনের মলিন বুকে—
এ মনের অসীম পুলক-মাধুরী মোর দেব ধরি'॥

দুধারের   পথের কাঁটায় ফুল ফোটাবো বারে বারে।
হৃদয়ের   সুরের সুবাস বাজবে ভুবন-বীণার তারে।
ভেঙেছি   পাষাণ-কারা,
এনেছি   প্লাবন-ধারা,
জেলেছি   জীবন দিয়ে মরণ-কালো বিভাবরী ॥

জ্যোতির্মালা দেবীর গানটি ভাটিয়ালি ভঙ্গি, কেবল শেষের স্তবকে বৈচিত্র্য আশে বেহাগের খোঁচ আনা হয়েছে :

যখন   গাহে নীল পরী
গভীর   রাতের স্বপনপথে সঞ্চরি'।
নামে   দূর অলকার   জ্যোৎস্না-আসার
গগন-বিতান মঞ্জরি'!
নীল পরী—
গায়   নিশার স্বপন-পথে সঞ্চরি'।

চিরি'   মেঘের হিয়া সুধা-নিঝরে
প্রতি   তারার রেণু   বাজায় বেণু
চিন্ময় স্বরে :
শোনে   চাঁদের সাথী   উদাস রাতি
কানন দোলে মর্মরি'।
নীল পরী—
গায়   নিশার স্বপন-পথে সঞ্চরি'।

আনে   হৃদয়মাঝে এ কোন্ জাগরণ!—
ওগো   সে-ইসারা   আপনহারা
করে আমার মন!
ডাকে :   "আয় ছুটে আয়   অসীম ছায়ায়
শোন্ রে সুদূর বাঁশরী!
নীল পরী—
গায়   নিশার স্বপন-পথে সঞ্চরি'।

কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি সম্বন্ধে পরিশেষে বলতে চাই শুধু আর একটি কথা : এদের মধ্যেকার স্বকীয় সুর সৌরভ ও স্বপ্ন আগের যুগে অনেক সময়েই ফুটতে পেত না—সে সময়কার কাব্যে সর্বাঙ্গ-সুন্দরতার আদর্শ প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হ'ত ব'লে। কেন না বলেছি আমরা এ-বিষয়ে মনে প্রাণে আধুনিক : মানে, কাব্যে সর্বাঙ্গসুন্দরতার জন্যে ঐকান্তিক ও অশ্রান্ত সাধনার পক্ষপাতী। সেকালে এ-আদর্শ তেমন পরিণতি লাভ করে নি। সেই জন্যে পুরোনো সঙ্গীতের মধ্যে আনন্দ পেলেও এখানে ওখানে সেখানে যা খেতে হয়—বেধে যায়। এমন কি বরেণ্য বৈষ্ণবকবিদের পদাবলিতেও অনেক স্থলেই সুন্দর ভাবের মধ্যে অসুন্দর ভাবের ছোঁয়াচ অত্যন্ত স্পষ্ট, গদ্যের ঘর্ঘর অত্যন্ত মুখর, অনবদ্য পদলালিত্যের মধ্যে শ্রীহীন শব্দ উড়ে এসে জুড়ে বসে, চমৎকার সাবলীল ছন্দের মধ্যে প্রায়ই ঘটে ছন্দপতন—বহুস্থলেই সেকেলে মিলের অসম্পূর্ণতা শ্রুতিকে করে আঘাত—এককথায়—ঐ যে বললাম—সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার অভাব ঘটায় আদর্শচ্যুতি, করে রসভঙ্গ। ঠিক্ সেই জন্যেই আধুনিকতার একটা মস্ত প্রবণতা হবে—এসব সঙ্গীতের ক্ষীরটুকু নিয়ে নীর পরিহার করা : গোঁড়ামি রেখে মন্দকে মন্দ ব'লে চিনে নব কাব্যসঙ্গীতে তাকে ঠাঁই না-দেওয়া : সর্বোপরি—আধুনিক বিচিত্র সুরধারার আলোছায়া সৌকুমার্য ও পেলবতা আমদানি করা। আধুনিক কীর্তনের বুকেও জেগেছে এই নবযুগের নিখুঁৎ-হবার উচ্চাশা—রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কবিদের সব না হ'লেও অনেক কীর্তন ভাবের রসের নিটোল মাধুর্যে নবসঙ্গীতের একটি অনবদ্য দান সন্দেহ কি? বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসঙ্গীত সম্বন্ধেও এই কথা। এদেরও বিকাশ হবে আধুনিক কাব্যসঙ্গীতের আরো-নিখুঁৎ-হবার তাগিদে। এ-প্রেরণা আধুনিক ব'লেই নিন্দনীয় ও সেকেলে অসুন্দরতা অসুন্দর হ'লেও বাঞ্ছনীয় এ-ধরণের সেকেলিয়ানা ছাড়তেই হবে। কালিদাসের কথা জপমালা হ'য়ে থাকুক আমাদের আধুনিক মনোমন্দিরে :

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্।"

তবে প্রাচীনের মধ্যে শ্রী যেখানেই আছে আদর করতে হবে, বরেণ্য যা কিছু আছে বরণ করতে হবে। যেমন বর্জনীয়ের বর্জন চাই তেম্‌নি চাই পূজ্যের পূজা। এ-পূজার প্রধান উপচার নয় নিষ্করুণ যৌক্তিক বিচার—এর জন্যে সব আগে চাই দরদী দৃষ্টি। কীর্তন বাউল প্রভৃতি সঙ্গীতে স্বরলালিত্যের যে বিকাশসম্ভাবনা ছিল তাকে আমাদের আধুনিক কবিরা বরণ করতে পেরেছিলেন ব'লে এসব সঙ্গীতের উত্তরোত্তর বিকাশ বঙ্গবাণীর তথা বঙ্গবীণার তন্ত্রীতে নব নব ঝঙ্কার আনছে। সবক্ষেত্রেই যে সাফল্যের বিজয়তিলক পাচ্ছে বলি না—কোনো বিকাশই একটানা সরলছন্দে হয় না—তবে মোটের উপর যে আধুনিক বাংলা গানে কীর্তন বাউল প্রভৃতির সুর নব জয়শ্রীর আভা এনেছে একথা আজ অবিসংবাদিত।

কিন্তু এদের নবজন্ম ও প্রগতির 'পরেই দেশীসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একথা বললে ভুল হবে। দেশীসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কাব্যসঙ্গীত ও নাট্যসঙ্গীতের অনিবার্য দীপ্ত অভ্যুদয়ের হাতে—কোনো অতীত সঙ্গীত-ইমারতের সন্তোষজনক সংস্কারে তার ক্রমবিকাশ সম্ভব নয়। এজন্যে চাই আধুনিক কাব্যসাঙ্গীতিক ও নাট্যসাঙ্গীতিক প্রেরণা। নাট্যসঙ্গীত কাব্যসঙ্গীতেরই অন্তর্গত ব'লে এ-বইটির শেষার্ধে তার সম্বন্ধেও নানান্‌ আভাষ নানা ভাবে ছড়ানো রইল—কিন্তু তবু মনে রাখতে হবে যে, এর বিষয়বস্তু প্রধানত কাব্যসঙ্গীতেরই উদয় বিকাশ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে পর্যালোচনা করা। এবার সময় এল এ-আলোচনার। দুঃখ এই যে এ-বইটির পরিসর অল্প, তাই নানা জরুরি আলোচনাকেই বিস্তৃতভাবে যথাযথ স্বরলিপির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। সে-কাজে ভবিষ্যতে হাত দেওয়ার ইচ্ছা রইল।

কাব্যসঙ্গীত ও কণ্ঠবাদন

কীর্তন-বাউলাদি বাংলাগানের রূপকে খানিকটা দেশীসঙ্গীতবর্গীয় ছাড়া কী বলা যাবে ? কিন্তু বাংলা গানের এছাড়া আর একটি মস্ত শাখা আছে—মার্গসঙ্গীতবর্গীয়। এরও আবার আছে নানান্ শাখা উপশাখা —যে-কোনো প্রাণবন্ত প্রবর্ধমান শিল্পকলা তো চাইবেই আপনাকে দিকে দিকে ছড়াতে। শুধু বাইরের দিকে নবীন সৃজন করতেই নয়—অন্তরের দিকে নানান্ আবিষ্কার আত্মপরীক্ষা করতেও বটে। বাংলা গানের বেলায়ও একথা সমান খাটে। এখানে ব'লে রাখি যে, আধুনিক বাংলা গানের এই রাগভঙ্গিম শাখায় শাখায় গান হ'য়ে যে-সব ফুল ফুটেছে ফল ফলেছে তাদের রূপ রস স্বাদ গন্ধের সঙ্গে হিন্দুস্থানি মূল রাগরাগিণীর ফুলফলের রূপ রস স্বাদ গন্ধের যথেষ্ট গরমিল আছে। সে-গরমিল কোথায় সেটা বিশদ করার আগে মার্গসঙ্গীতবর্গীয় বাংলাগানের বিকাশধারার পূর্ব-ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

গোড়ায়ই বলেছি যে, আমরা স্বভাবে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক জাত নই—অন্তত ছিলাম না সেই মান্ধাতার আমল থেকে : হাল আমলে চেষ্টা করছি মাত্র। সুতরাং বাংলা গানে মার্গসঙ্গীতের ক্রমারোহণীরও পর পর পৈঠা দেখিয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, এ-ও নিশ্চয়ই সহৃদয় পাঠক পাঠিকার চোখে পড়েছে যে, এ-বইটির দৃষ্টি বহির্মুখী নয় : এতে আমরা অনুসরণ করতে চেয়েছি আমাদের গানের ধারা ও দৃষ্টি-ভঙ্গির ক্রমবিকাশকে। অনুসরণের এ-ধারা ও বিন্যাস হয়ত অনেক-ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক হয় নি—তার কারণও গোড়াতেই বলেছি : গানের বাহ্যঘটনা তার আন্তরজীবনের সঙ্গে অখণ্ড যোগসূত্রে বাঁধা, কাজেই বাহ্যঘটনার দৈন্য ঘটলে তার আন্তরজীবনের ইতিহাস রচনা করাও কঠিন হবেই হবে। কিন্তু তবু আমাদের আশা আছে যে, অন্তত মোটমাট একটা আভাষ দিতে পেরেছি কী ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে

সুরেলা ধ্বনিসমুদ্রের একটি বিশেষ লহরীনৃত্যভঙ্গিকে আমরা আমাদের সঙ্গীত-সুরধুনীতে প্রবহমান রাখতে চেয়েছি—যার নাম রাগের কথা-নিরপেক্ষ সুর-তরঙ্গিনী।

রাগসঙ্গীতের এই সুরতরঙ্গিনী বইতে চেয়েছে আধুনিক বাংলা-সঙ্গীতেও তো বটেই। কিন্তু এ-চাওয়ার মধ্যে যে-বৈশিষ্ট্য, তার গোড়াকার কথা অনেকেই জানেন: বাঙালির বাংলা গীতশ্রীর শ্রী শুধু তার সঙ্গীতে নয়—তাতে বরাবরই কমবেশি কাব্য ও সুর অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে ফুটতে চেয়েছে: ফলে বাংলা রাগসঙ্গীতও প্রথম থেকেই বিকাশ চেয়েছে কাব্যসঙ্গীতের অভিমুখে। এককথায় দেশীসঙ্গীত বাংলা দেশে রূপ চেয়েছে "গান" হ'তে চেয়ে।

অবশ্য এ-ভঙ্গি হিন্দুস্থানি গানের ভজন গজল প্রভৃতিতে খানিকটা আত্মপ্রকাশ চেয়েছে ও পেয়েছে। কী ভাবে—তার একটা সংক্ষেপ ব্যাখ্যানও আমরা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শুধু হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের খাসতালুকেই যে "গান" প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা নয়—নানান্ প্রাদেশিক সঙ্গীতেও এ স্বতস্ফূর্ত হ'য়ে উঠতে চেয়েছে। মহারাষ্ট্রে বালগন্ধর্ব প্রমুখ নটগায়করা যে এই নাট্যসঙ্গীতের পথে চলেছেন সেকথা সবাই জানেন। এমন কি করিম-কন্যা প্রসিদ্ধ রাগগায়িকা হীরাবাই বরোদকরও সম্প্রতি এই নাট্যসঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছেন। উর্দুতে হায়দ্রাবাদে অমজদ প্রমুখ কবিরা গজলে নব নব ছন্দোবন্ধে নানাভাবেই এই কাব্যসঙ্গীতের স্বাদ গ্রহণ করতে চাইছেন। আধুনিক হিন্দিকাব্যে শ্রীমতী রাহানা তায়েবজি ও শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ: এঁরাও উত্তরোত্তর গানে কাব্যের ললিত আবেশই আনতে চাইছেন। শ্রীমতী রাহানা আমাকে একটি পত্রে সম্প্রতি লিখেছেন যে, আশৈশব রাগসঙ্গীতে দীক্ষিতা হ'য়েও হাল আমলে তিনি কথানিরপেক্ষ রাগবিস্তারে আর তেমন রস পাচ্ছেন না—আত্মবিকাশের এক বিচিত্র নবস্বাদ পাচ্ছেন এই ভজনাত্মক কাব্যসঙ্গীত রচনায়। এমন কি গত বৎসর ডিসেম্বরে সার শিবস্বামী আয়ার কর্ণাটী সঙ্গীত সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে খুব সাফ সাফ কথাই বলেছেন ওস্তাদি কর্ণাটী সার্গম-ধুরন্ধরদের ঠেশ

দিয়ে। বলেছেন—অমন যে দুর্ধর্ষ দক্ষিণী সঙ্গীতপিপাসুরা—তাঁরাও ক্রমশই কর্ণাটী সঙ্গীতের সুর ও তালের মল্লযুদ্ধে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছেন—সবাই এখন কাতর স্বরে করুণ নেত্রে চাইছেন গানে সুললিত কথাকে—কি না কাব্যসঙ্গীতকে—আবাহন করতে। একমাত্র মামুলিপন্থীরা ছাড়া সবাই উপলব্ধি করতে সুরু করেছেন আমাদের সঙ্গীতের এই মস্ত অভাব। এককথায়, সুরসর্বস্ব রাগসঙ্গীত কাব্যসঙ্গীতের দিকে এই যে মোড় নিয়েছে এ-কে আধুনিক সঙ্গীতের যুগধর্ম বললে একটুও অতিশয়োক্তি হবে না।

অনেকে বলতে পারেন যে এ একটা কথাই নয়—ধরা যাক্ ঠুংরি : এতে কথা থাকলেও সে গৌণ; জানি—বাধা দিয়ে বলব আমরা। ওসব যুক্তি শুধু যে জানি তাই নয়—মানতেও বাধা নেই যে, এযাবৎ ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে কথা-নিরপেক্ষ সুরের দিকেই। তার তর্পণও আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই করেছি। কিন্তু তবু বলব যে ভাবীকালের ধর্ম্ম নয় ভূতকালের পুনরাবৃত্তিতেই তুষ্ট থাকা সুতরাং অতীতে যা হয়েছে ভবিষ্যৎ তারই জের টেনে চলবে এ একটা কথাই নয়। ঠুংরিতে একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেই কি ভাবে ঠুংরিও চলেছে কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গমাভিমুখে, নাট্যসঙ্গীতের দিকে—গজলভঙ্গিতে।

লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত অচ্ছন বাইয়ের কাছে বছর বার আগে আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম। সেই সময়ে তাঁর কাছে একটি অপূর্ব ঠুংরি শিখেছিলাম। তার প্রথমাংশ নির্ভেজাল ঠুংরি। কিন্তু তার পরেই বাই সাহেবা এনেছিলেন এ-ঠুংরিতে নিছক কবিতা-পদাবলী। এর নাম শের। শেরের এক অর্থ শ্লোক, অন্য অর্থ—কাব্য-আঁখর : এ হ'ল চিত্রভঙ্গিম, এর প্রেরণা এসেছে খাস গজল থেকে। "কথা-দিশা" ব'লে আমাদের এক ধরণের আবৃত্তিবর্গীয় গান ছিল সাবেক কালে, গজল-শের প্রায় সেইভাবেই গাওয়া হয়। যাঁরা ঘরে ব'সে অল্প পরিসরে শেরের দৃষ্টান্ত চান তাঁরা গ্রামোফোনে জানকী বাইয়ের "মতরালে নয়নুরা জুলুম্ করে" গানটি যেন শোনেন। এ-ধরণের সুরশ্রীহীন শের সঙ্গীতরসিকদের বিশেষ ভালো লাগে না—কিন্তু

শেরকেও সঙ্গীতসমৃদ্ধ ক'রে গাওয়া সম্ভব – যেমন অচ্ছন বাই গাইতেন। তাহ'লে দেখা যায় এতে আনন্দ যথেষ্ট মেলে। কিন্তু এবার গানটি উদ্ধৃত করি।

মূল গান—ঠুংরি—তাল দাদরা :

মুকটধারী কান্‌হ বজায় বাঁশিয়া রে!
কুঞ্জসমীপ যমুনাকে তট
বাঁসিয়া বজায়ে নাচত গিরধারিয়া রে!
বোলো কৈসে বিসরুঁ রে!

শের :

বাজি উঠ ধাই,
বাজি দেখনকো দৌরি আই,
বাজি মুরঝাই সুন তান গিরধরকি।
বাজি ধরৈঁ না ধীর,
বাজি সম্‌হারৈঁ ন চীর,
মুরলী-ধুন্‌সে বাজিনকে অতল বিরহাভরকি।
বাজি হস বোলৈঁ
বাজি করত কলোলৈঁ
বাজি সঙ্গ লাগি ডোলৈঁ সুধ না রহি ঘরকি।
বাজি কহৈঁ : "কঁহা বাজি?"
বাজি কহৈঁ : "কহুঁ বাজি,
চলো আলি জঁহা বাজি ব্রজবাঁসরি সামরৈ সুঘরকি।"
জলকে ঘট না ভরৈঁ
মগপে পগ ন ধরৈঁ
ঘরকে কছু না করৈঁ বৈঠী ভরৈঁ সাঁসরি।
একে সুনি লোট গই,
একে সুনি লোট পোট ভই,
একনকে নয়নমে নিকস আয়ে আঁসরি।

কহেঁ রসনায়কসো :
"ব্রজনয়নন যহ্ বিধিক
কহায় হায় কলহাঁসরি—
করি উপায়—
বাঁস ডারয় কাটায়,
না উপজয় বাঁস তো নহি বাজৈ বাঁসরি।"

এখানে কী দেখতে পাই আমরা?—না, ঠুংরির নাগরদোলায় কাব্যের স্বভঙ্গিম আবর্তন : সরল আবেগের তুলিতে সরল ছবির রকমারি রেখাবিন্যাস। এ-গানটির তর্জমা দেই বাঙালি কাব্যানুরাগীদের জন্যে :

(পদাবলী)

শিখিচূড়াধারী স্বপন-বিহারী
বাজায় বাঁশরি রে!
কুঞ্জের ধারে যমুনা কিনারে
ডাকে সে—আমরি রে!
সুরে সুরে বাজে তালে তালে নাচে
কেমনে পাশরি রে!

(আঁখর)

বাঁশি শুনে কেউ যমুনায় ধায়;
কেউ বলে : "সই, দেখবি যদি আয়";
কেউ বা মুরছায় সহসা না পেয়ে সন্ধান।
কেউ বলে : "আর ধৈরয না ধরে";
কেউ বা না পায় কূল মুরলীর স্বরে—
গভীর বিরহের অতলে হারায় দিশা প্রাণ।
কেউ উছসি' হাসে—শুধুই হাসে;
উচ্ছলি' কেউ শুধুই কলভাষে;
কেউ ফেরে তায় খুঁজে—শুনে ঘরছাড়া তার তান।

কেউ বলে : "কই, কোথায় বাজে বাঁশি ?"
কেউ বলে : "ঐ—আয় না, দেখে আসি—
মোহন বাঁশি দূর-উদাসী করে—এ কোন্ টান !"
গাগরিতে হয় ভরা কই জল ?
পথের পরেই চরণ অচঞ্চল ;
মন বসে না কাজে—শুধুই দীর্ঘনিশাস বয়।
কেউ বা শুনে লুটায় বসুধায় ;
লুটোপুটি কেউ বা ধূলিকায় ;
অশ্রুছলছল রহে কেউ মুরলী-তন্ময়।
হেসে তখন বলেন রসরাজ :
"শোন্ তোদের এক উপায় বলি আজ :
উন্মূল না হ'লে বেণু র'বেই বাঁশির ভয় ;
বেণুর কূলে না যদি রয় কেউ—
থামবে বাঁশির দুকূলভাঙা ঢেউ :
কর্ সখী, তাই বেণুবীথি লুপ্ত ভুবনময়।"

এ-ধরণের কাব্যে যে-ছবির রস ফুটেছে : হাসিতে অশ্রুতে, আনন্দে ব্যথায়, আবেগে অনুরাগে, বিরহে মিলনে,—তার সঙ্গে বৈষ্ণব পালাগানের রসের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। একে তাই কাব্যসঙ্গীতের গোড়াপত্তন বলতেই হয়।

মনে আছে ঠুংরিতে চিত্রসমৃদ্ধ কাব্যসঙ্গীত সেই প্রথম শুনি এবং শুনবামাত্র মনে হয়—এই-ই আমরা চাই এ-যুগে। ভুলব না কোনোদিন সে-রাত্রের কথা : অতুলপ্রসাদের সভাপতিত্বে সে গুণিসভায় প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে গাইলেন অচ্ছন বাই এ-গানটি। তার পর কতক্ষণ যে আমাদের মুখে বাক্‌স্ফূর্তি হয় নি ! ওস্তাদ-নিন্দিত "বাইজি-লোগ-গাতে-হৈঁ" ঠুংরিতে চোখে জল আসে কাব্য ও সুরের মিলিত আবেদনে ! জীবনে গান শুনে আনন্দ পেয়েছি তো কতদিন—কিন্তু সে-আনন্দের স্মৃতিমন্দিরেও এক একটা রসপ্রতিমা সহসা ভাস্বর হ'য়ে ওঠে—কোন্ জাদুতে তাতে হয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা—সে তারার মতনই

জলতে থাকে আশেপাশের চন্দ্রিকা-রাজ্যের ঊর্ধ্বলোকে। এ-গানটির স্মৃতি আমার চিত্তাকাশে জ্বলে ঐ তারারই মতন। মনে আছে আর একদিন—যখন মোতিবাইয়ের মুখে শুনি তিলককামোদে ঠুংরিজাতীয় এই ভজনটি :

অব তো লাজ তোরে হাত
রাখো সরম
সৈয়াঁ!
হোঁ তো তোসে বিনতি করত
পরত স্বজন,
পৈয়াঁ।
উমর সারি য়োঁহি খোই
অয়গুণকি বেলি বোই
তুম বিন অব নাহি কোই
রাখো অপনি
ছৈয়াঁ।

অনুবাদ :

তব হাতে দিনু প্রাণ মন তনু
লাজ মোর রেখো
প্রিয় হে!
মিনতি জানাই শ্রীচরণে ঠাঁই
জীবনে মরণে
দিও হে!
গুণহীন হায়, আমি অভিমানী
বেলা ব'য়ে যায়···জানি বঁধু, জানি
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার?
করুণা ছায়ায়
নিও হে।

তখনও এই রকম অসহ আনন্দ অনুভব করেছিলাম। তিলক-কামোদের মিড়ে তানে এ-গানটির অশ্রুসজল আত্মনিবেদন সে অপরূপ গায়িকার কণ্ঠে নয়নে আবেগকম্পনে কী ভাবে ছায়ালোক থেকে কায়া ধরত—বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই। পরে আমি এ-গানটি তাঁর কাছে শিখবার সময়েও যে-গভীর আনন্দ অনুভব করতাম সে-ও অবিস্মরণীয়। কিন্তু সবচেয়ে আনন্দ হ'ত দেখে যে তিনিও বাংলা গানে অনুরূপ গভীর আনন্দ পেতেন। তাঁকে শিখিয়েছিলাম আমি অতুলপ্রসাদের মনোহর ঠুংরিজাতীয় "বাদল রুম ঝুম বোলে" পিলুখাম্বাজে, আর দ্বিজেন্দ্রলালের খেয়ালজাতীয় "এ-জগতে আমি বড়ই একা আমি বড়ই দীনা" ভীমপলশ্রীতে। গাইতে গাইতে তিনিও আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠতেন—বলতেন (হিন্দিতে অবশ্য): "আহা, কী গানের ভাব তোমাদের দিলীপ, কী বাঁধুনি সুরের! এ-জিনিষ হিন্দিতে নেই।"

এ-কথাগুলি বলছি স্মৃতিচারণের উচ্ছ্বাসবশে নয়—শুধু নিবেদন করতে যে, যে-সব সুরজ্ঞ সমালোচক গান ও সুরের এ-অপূর্ব সুষমার রস জানেন না তাঁরা যত বড়ই সুরজ্ঞ হোন না কেন তাঁদের জন্যে দুঃখ হয়: জীবনে একটা গভীর আনন্দ থেকে বেচারিরা বঞ্চিত রয়ে গেলেন অথচ "জানতি পারলেন না।" কেন না সুরের আবেদন মহিমময় হ'লেও তাতে নেই এ সুরকাব্যমিলনের সুষমিত রস—যার নাম গান ওরফে কাব্যসঙ্গীত। একথা বলছি এই জন্যে যে, হিন্দুস্থানি মার্গসঙ্গীত বলতে ঠিক যা বোঝায় তাকে আর যা-ই বলা হোক না কেন গান বলা চলে না—তাকে বলতে হয়—"কণ্ঠবাদন"। লাখ কথার এক কথা এই "কণ্ঠবাদন"।

কণ্ঠবাদন কথাটি সঙ্গীতকোবিদ শ্রীঅমিয়নাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের আমদানি। গত আগষ্টে তিনি সঙ্গীত সম্মিলনীতে একটি বক্তৃতা দেন গান কী বস্তু এই বিষয়ে। তাতে তিনি চমৎকার ক'রে বলেন এই কথাটি যে, কণ্ঠকেও সঙ্গীত-উৎপাদক যন্ত্রবিশেষ হিসেবে দেখা চলে—যেমন বীণা, বাঁশি, পিয়ানো। এসব বাদিত্রদের সঙ্গে কণ্ঠযন্ত্রের তফাৎ

শুধু এই যে, বাদিত্ররা দেহসম্বন্ধ নয়, কণ্ঠ—দেহাঙ্গ। এসূত্রে তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে, ওস্তাদেরা কণ্ঠ থেকে প্রায় সেই শ্রেণীরই ধ্বনিসঙ্গীত নিঃসৃত করেন যেমন করেন বাদিত্র থেকে—সেই জন্যেই তাঁদের কণ্ঠসঙ্গীতে কথা হ'য়ে রইল অকিঞ্চন—সুররাজেরই জয়জয়কার। হওয়াই স্বাভাবিক, কেন না কণ্ঠকে যখন নিছক বাদিত্র হিসেবেই গণ্য করা হ'ল তখন কথাকে আমল দেওয়াটাই যে হবে অসঙ্গত। তাই ওস্তাদি কণ্ঠে কণ্ঠসঙ্গীত গানের কোঠায় আদৌ উঠতে পারল না—হ'য়ে রইল "কণ্ঠবাদন"—কেন না গান হ'ল কেবল সেই সৃষ্টি যাতে কথার কাব্যমুল্য থাকাই চাই।

এই কথাটি নিয়ে এবার কিছু আলোচনা করতেই হবে—যেহেতু বাংলা গানের প্রাণের কথাটি এই যে, সেখানে শুধু সুরমহিমা বজায় থাকলেই চলবে না—কথাকেও হ'তে হবে সমান গৌরবের সরিক। এ-যুগলমিলনের মহিমা যাঁর কাছে নিরর্থক, "গান" তাঁর জন্যে নয়, তিনি যেন আমরণ হয় কণ্ঠবাদন নয় যন্ত্রসঙ্গীতের খাসতালুকেই খুসমেজাজে বাহালতবিয়তে কায়েম হ'য়ে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সে-জমিদারি ভোগদখল করতে থাকেন। "গান"-দরদী হ'তে হ'লে বীণাপাণির শুধু বীণাকেই নয়—বাক্‌কেও শিখতে হবে আদর করতে। নান্যঃ পন্থাঃ।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি এ-সম্পর্কে যে মূল্যবান্ কথাগুলি বলেছেন সেগুলি ঈষৎ দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধৃত ক'রে এ-অধ্যায়ের ইতি করি :

"সুরের মহলে কথাকে ভদ্র আসন দিলে তাতে সঙ্গীতের খর্বতা ঘটে কি না এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলচে। বিচার কালে সম্পাদক বলছেন, আসামীর বক্তব্য শোনা উচিত। সঙ্গীতের বড়ো আদালতে আসামী শ্রেণীতে আমার নাম উঠেছে অনেকদিন থেকে। আত্মপক্ষে আমার যা বলবার সংক্ষেপে বলব। আমার শক্তি ক্ষীণ, সময় অল্প, বিদ্যাও বেশি নেই। আমি যে-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকি সে বিশেষভাবে সঙ্গীত শাস্ত্রও নয়, কাব্য শাস্ত্রও নয়, তাকে বলে ললিতকলা শাস্ত্র, সঙ্গীত ও কাব্য দুই তার অন্তর্গত।

"কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন বাক্য এবং অর্থ একত্রে সংপৃক্ত। কিন্তু যে-বাক্য কাব্যের উপাদান, অর্থকে সে অনর্থ ক'রে দিয়ে তবে নিজের কাজ চালাতে পারে। তার প্রধান কারবার অনির্বচনীয়কে নিয়ে, অর্থের অতীতকে নিয়ে। কথাকে পদে পদে আড় ক'রে দিয়ে ছন্দের মন্ত্র লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের জাদু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্দ্রজালে বাক্য সুরের সমান ধর্ম লাভ করে। তখন সে হয় সঙ্গীতেরই সমজাতীয়। এই সঙ্গীতরসপ্রধান কাব্যকে ইংরেজিতে বলে লিরিক, অর্থাৎ তাকে গান গাবার যোগ্য ব'লে স্বীকার করে। একদা এই জাতীয় কবিতা সুরেই সম্পূর্ণতা লাভ করত। কবিতার এই সম্মিলিত সম্পূর্ণ রূপ সেদিন গান ব'লেই গণ্য হোতো, বৈদিক কালে যেমন সামগান।

"সুরসম্মিলিত কাব্যের যুগলরূপের সঙ্গে সঙ্গেই সুরহীন কাব্যের স্বতন্ত্ররূপ অনেকদিন থেকেই আছে। অপেক্ষাকৃত পরে যন্ত্রের সাহায্যে গানের স্বাতন্ত্র্যও ক্রমে উদ্ভাবিত হোলো। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এদের যে বিশেষ পরিচয় উন্মুক্ত হয়েছে সেটা মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই তাদের পরস্পরের সঙ্গ ঠেকাবার জন্যে জেনেনারীতি চালাতেই হবে এমন গোঁড়ামি মান্‌তে পারব না।

"শুনেছি চরক সংহিতায় বলেছে, তাকেই বলে ভেষজ যাতে হয় আরোগ্য। যারা চিরকাল একমাত্র অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় আসক্ত তাদের মতে তাকেই বলে ভেষজ যা অ্যালোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার ফর্দভুক্ত। বৈদ্যশাস্ত্রমতে বড়ি খেয়ে যে লোকটা বলে আরাম পেলুম তাকে ওরা অশাস্ত্রীয় গ্রাম্য ব'লেই ধ'রে নেয়। তারা বলে ডাক্তারি মতেই আরাম হওয়া উচিত, অন্যমতে কদাচ নয়।

"সাঙ্গীতিক চরক-সংহিতার মতে তাকেই বলে সঙ্গীত যার থেকে গীতরস পাওয়া যায়। কিন্তু ওস্তাদের সাক্রেদ্‌রা বলে সেটাই সঙ্গীত যেটা গাওয়া হয় হিন্দুস্থানি কায়দায়। ঐ কায়দার বাইরে যে গীতকলা পা ফেলে তাকে ওরা বলে স্বৈরিণী, সাধু সমাজের সে বা'র। সমজদারের খাতায় যারা নাম রাখতে চায় অন্যশ্রেণীর গানে রস পাওয়াই

তাদের পক্ষে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ! কিন্তু আমরা চরক-সংহিতার সঙ্গে মিলিয়ে বলব—গানের রস যেখানে পাই সেখানেই সঙ্গীত, কথার সঙ্গে তার বিশেষ মৈত্রী থাক্ বা না থাক্। ভালো কারিগরের হাতে শিল্পিত প্রদীপের মুখে শিখা জ্বলে উঠে উৎসবসভা আলোকিত করল; সেই শিখার আলোককে আলোই বলব, সেই সঙ্গেই গুণীর হাতে গড়া প্রদীপটাকেও বাহবা দিলে দোষের হয় না। বস্তুত প্রদীপটা আলোককেই সম্মান দিয়েছে, আর ঐ প্রদীপেরও মুখ উজ্জ্বল করেছে আলোক। যাঁরা এ রকম সম্মানের ভাগাভাগিকে সঙ্গীতের জাতিনাশ ব'লে রাগ করেন তাঁরা জ্বালুন না মশাল, তার বাহনটা নগণ্য হোক্ তবু তার আলোর গৌরব মানতে দ্বিধা করব না।

'কারি কারি কমরিয়া গুরুজি মোকো মোল দে'—

"অর্থাৎ কালো কালো কম্বল গুরুজি আমাকে কিনে দে। এটা হোলো মোটা মশাল, এর চূড়ার উপরে জ্বলচে পরজরাগিণীর আলো, মশালটার কথা মনেও থাকে না। কিন্তু কারুখচিত বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন ক'রে তোলে তাহ'লে কোনো দিক থেকে মূল্যের কিছু হ্রাস হ'তে পারে বলে তো মনে করিনে।

"এর পরে তর্ক উঠবে, বাক্যের অনুগত হ'লে সঙ্গীতে তার পূরো পরিমাণ চালচলন তানকর্তবের ব্যাঘাত হবার কথা। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে স্বক্ষেত্রের বাহিরে আর কিছুরই অনুগত হওয়া সঙ্গীতের পক্ষে দোষের এ কথা মানি। আমরা যে-গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা অতিক্রমণের দ্বারা সমগ্রসৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতিবিরুদ্ধ। যে বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীতে বাক্য ও সুর দুইয়ে মিলে রসসৃষ্টির ভার নিয়েছে সেখানে আপন গৌরব রক্ষা ক'রেও উভয়ের পদক্ষেপ উভয়ের গতি বাঁচিয়ে চল্‌তে বাধ্য। এই পন্থার অনুসারী বিশেষ কলানৈপুণ্য এই শ্রেণীর সঙ্গীতেরই অঙ্গ।

"কিন্তু এমনতরো বাঁচিয়ে চলতে হ'লে তানকর্তব পল্লবিত করার ব্যাঘাত হতে পারে। এ ভাবনা নিয়ে অন্তত তানসেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হননি। সঙ্গীত মাত্রই সোরি মিঞার পদানুবর্ত্তী নয়। অধিকাংশ ধ্রুপদ গানে বাক্যের ঠাসবুনানির মধ্যে অলঙ্কারবাহুল্য স্থান পায় না, শোভাও পায় না। এই স্বরসংযমে তার গৌরব বাড়িয়েছে। ধ্রুপদের এই বিশেষত্ব।

"আধুনিক বাংলাগানও একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সঙ্গীতে কথাশিল্প ও সুরশিল্পের মিলনে একটি অপরূপ সৃষ্টিশক্তি রূপ নিতে চাচ্চে। এই সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানি কায়দা আপন পূরো সেলামি পাবে না, যেমন পায়নি বাংলার কীর্তন গানে। তৎসত্ত্বেও বাংলা গানের নূতন ঠাট বাংলার বাহিরের শ্রোতাদের মনে বিশেষ একটি আনন্দ দিয়ে থাকে এ আমাদের পরীক্ষিত। দেয়না তাঁদেরই, সঙ্গীত-ব্যবসায়িকতার বাঁধা বেড়ার মধ্যে যাঁদের মন সঞ্চরণে অভ্যস্ত। (৪-১১-১৯৩৭)"

এ নিয়ে কবি ধূর্জটিপ্রসাদকে একটি পত্রে সম্প্রতি লিখেছেন তাঁর অনুপম ভঙ্গিতে :

"গানে কথা ও সুরের স্থান নিয়ে কিছুদিন থেকে তর্ক চলেছে। আমি ওস্তাদ নই, আমার সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয় এ বিষয়টা সম্পূর্ণ তর্কের বিষয় নয় ; এ সৃষ্টির অধিকারগত অর্থাৎ লীলার। জপতপ ক'রে মন্ত্র-তন্ত্র আউড়িয়ে হয়তো কৃচ্ছ্রসাধক যথানিয়মে ভবসমুদ্র পার হোতে পারে, কিন্তু যে সরল ভক্তির মানুষ বলে, ভজন পূজন জানি নে মা জানি তোমাকেই, সেই হয়তো জিতে যায়। সে আইনকে ডিঙিয়ে গিয়ে মানে লীলাকে, ইচ্ছাকে,—সেই বলে ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, সে বলে সকলের উপরে আছেন যিনি, তিনি নিজে হতে যাকে বেছে নেন তার আর ভাবনা নেই। যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে সেই সকলের উপরওয়ালা হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ। এই আনন্দ যখন রূপ নেয় তখন সেই রূপেই তার সত্যতার প্রমাণ হয়, আইনকর্তার দণ্ডবিধিতে নয়! উড়ন্ত পাখির পালকওয়ালা ডানা থাকে জানি, কিন্তু সৃষ্টির বড়ো

খেয়ালির মর্জি অনুসারে বাদুড়ের পালক নেই—শ্রেণীবিভাগওয়ালা তাকে যে শ্রেণীভুক্ত ক'রে যে নামই দিন সে উড়বেই। প্রাণী-বিজ্ঞানের কোঠায় তিমিকে মাছ নাই বলা গেল, আসল কথা হচ্ছে সে জলে ডুব সাঁতার দিয়ে বেড়াবেই। অন্যান্য লক্ষণ অনুসারে তার ডাঙায় থাকাই উচিত ছিল কিন্তু সে থাকেনি, সে জলেই রয়ে গেল। সৃষ্টিতে এমন অনেক অভাব্য ভাবিত হয়ে থাকে, হয় না জড়ের কারখানায়। কথা ও সুরে মিলে যদি সুসম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেটা হয়েছে ব'লেই তার আদর, সেই হওয়ার গৌরবেই সৃষ্টির গৌরব। এই মিলিত সৃষ্টিতে যে রস পাই তর্কের দ্বারা তাকে যে যা বলে বলুক সেটা বাহ্য, কিন্তু সৃষ্টির খাতির উড়িয়ে দিয়ে তর্কের খাতিরে যারা ব'লে বসে রসই পেলুম না এমনতরো অভ্যাসগ্রস্ত আড়ষ্টবোধসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই, কী সাহিত্যে, কী সংগীতে, কী শিল্পকলায়। অভ্যাসের মোহ থেকে, আইনের পীড়ন থেকে তারা মুক্তিলাভ করুক এই কামনা করি কিন্তু সেই মুক্তি হবে, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

"তেলে জলে যেমন মেলে না কথা ও সুর তেমনতরো অমিশুক নয় —মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে। তাদের স্বাতন্ত্র্য কেউ অস্বীকার করে না—কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাদের সুগভীর স্বাভাবিক আসক্তি লুকোনো নেই। এই আসক্তি একটি শক্তিবিশেষ, বিশ্ববিধাতার দৃষ্টান্তে গুণীরাও এই প্রবল শক্তিকে সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দেন—এই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই শক্তি মনকে বিচলিত ক'রে তোলে। এর থেকেই উদ্ভূত হয় বিশ্বের সব চেয়ে প্রবল রস, যাকে বলে আদিরস। এই যুগলমিলন-জাতীয় সৃষ্টি উচ্চশ্রেণীর কি না হিন্দুস্থানি কায়দার সঙ্গে মিলিয়ে তার বিচার চলবে না, তার বিচার তার নিজেরই অন্তর্গূঢ় বিশেষ আদর্শের উপর। মাদুরার মন্দিরে স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের প্রভূত তানমানসম্পন্ন যে ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই তারই নিরন্তর পুনরাবৃত্তিতেই স্থাপত্যসাধনার চরম উৎকর্ষে নিয়ে যাবে তা বলতে পারি নে, তার চেয়ে অনেক সহজ সরল শুচি আদর্শ আছে যার বাহুল্যবর্জিত শুভ্র সংযত রূপ হৃদয়ের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে একখানি গীতিকাব্যেরই মতো। যেমন

চিস্তির শ্বেতমর্মরের সমাধিমন্দির। মাদ্রার মতো তার মধ্যে বারংবার তানের উৎক্ষেপবিক্ষেপ নেই ব'লেই তাকে নিচের শ্রেণীতে ফেলতে পারব না। আনন্দ সম্ভোগ করবার সহজ মন নিয়ে কৃত্রিম কৌলীন্যের মেলবন্ধন না মেনে সৃষ্টির রসবৈচিত্র্য স্বীকার ক'রে নিতে দোষ কী?

"রসসৃষ্টির রাজ্যে যাদের মনের বিহার তাদের মুশকিল এই যে, 'রসস্য নিবেদন'টা রুচির উপর নির্ভর করে, সেই রুচি তৈরি হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অভ্যাসের উপর। এই কারণে শ্রেণীবিচার সহজ, রসবিচার সহজ নয়।

"নিয়তি নিয়মকে রক্ষা করবার খবরদারিতে বাঁধা পথে বারংবার স্টীম রোলার চালায়, ইতিমধ্যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির ঝরনাকে বইয়ে দিতে থাকেন তারই স্বকীয় গতিবেগের বিচিত্র শাখায়িত পথে—এই পথে কথার ধারা একলা যাত্রা করে, সুরের ধারাও নিজের শাখা ধ'রে চলে, আবার সুর ও কথার স্রোত মিলেও যায়। এই মিলে এবং অমিলে দুয়েতেই রসের প্রবাহ—এর মধ্যে যাঁরা কম্যুনাল বিচ্ছেদ প্রচার করেন, সেই শ্রেণীমাহাত্ম্যের ধ্বজাধারীদেরকে সৃষ্টিবাধাজনক শান্তিভঙ্গের উৎপাত থেকে নিরস্ত হোতে অনুরোধ করি। ইতি—৮।১০।৩৭

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"এত বড়ো চিঠি লিখে ভাঙা শরীরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অপরাধ করেছি। কিন্তু রোগদৌর্বল্যের আঘাতের চেয়েও বড়ো আঘাত আছে, তাই থাকতে পারলুম না। **কথাও সুরকে বেগ দেয়, সুরও কথাকে বেগ দেয়,** উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে; রসসৃষ্টিতে এদের পরিণয়কে হেয় করতে হবে যেহেতু সাংগীতিক মনুসংহিতায় এ'কে অসবর্ণ বিবাহ বলে, আমার মতো মুক্তিকামী এটা সইতে পারে না। সংগীতে চিরকুমারদের আমি সম্মান করি যেখানে সম্মানের তারা যোগ্য, কিন্তু কুমার কুমারীদের সুন্দর রকম মিলন হোলে আনন্দ করতে আমার বাধে না। বিবাহে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হ'য়ে শক্তি হ্রাস করে একথা সত্য হোতেও পারে, না হোতেও পারে, এমন

হোতেও পারে একরকম শক্তিকে সংযত করে, আর একরকম শক্তিকে পূর্ণতা দেয়।"

এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে-চিঠিটি লেখেন সেটিও সমান উপভোগ্য :

"'ছন্দা'-য় তোমার 'কথা বনাম সুর' প্রবন্ধে তোমার তর্কটা খুব জোরালো হয়েছে। কিন্তু তর্কে বিজ্ঞান বা গণিত ছাড়া আর কোনো কিছুর মীমাংসা হতে চায় না। যদি কেউ হুঙ্কার দিয়ে বলেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় আম্র বলা যেতে পারে একমাত্র ফজলিকে, যদি তার আয়তন তার ওজন তার আঁটির বিশালতা প্রমাণ-স্বরূপে সে ব্যবহার করে, যদি বলে গুরুত্বহীন অন্য সমস্ত আমকে সংস্কৃত নামে অভিহিত করা চলবে না, বড় জোর গ্রাম্য ভাষায় 'আঁব' নামেই তাদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, তা হলে জামাই-ষষ্ঠির দিনে ফজলি আম দিয়ে তার সম্মান রক্ষা করা শ্বশুরের পক্ষে নিরাপদ হবে—কিন্তু 'ইতরে জনাঃ' বিচিত্র আমের বিচিত্র রস সম্ভোগ ক'রে সমজদার নাম খোয়াতে কুণ্ঠিত হবে না। ওস্তাদেরা ফজলি সঙ্গীতের কলমের চারা বানাতে থাকুন যুগযুগান্তর ধ'রে, তৎসত্ত্বেও মানুষের হৃদয়পদ্মে সৃষ্টিকর্তা ঘুমিয়ে পড়বেন না।

"সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তনা। শ্রেণীর বেড়ার মধ্যে পায়ের বেড়ির ঝঙ্কার দিয়ে বেড়ানোকেই যে-ওস্তাদ সাধনা ব'লে গণ্য করে তার সঙ্গে তর্ক কোরো না ; শ্রেণীর সে উপাসক, শাস্ত্রের সে বুলিবাহক, পৃথিবীর নানা বিপদের মধ্যে সে-ও এক বিশেষ জাতীয়—কলাবিভাগে সে ফাসিস্ট্‌। ইতি, কলিকাতা, ২৯-১০-১৯৩৭।"

সুর ও কথার কলহ

কাব্য ও স্থরের মিলনাকাঙ্ক্ষা যে একটি বিশ্বজনীন আকুতি, দেশীসঙ্গীতের ব্যাখ্যানে এই কথাটিই রকমারি যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা পেয়েছি। সর্বদেশে সর্বকালে রসিকমন সাগ্রহেই চেয়েছে এ-দাম্পত্যরসের আস্বাদ। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকাতেও তাই পাশ্চাত্য গানের অধ্যায়ে একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, "গানের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য"—"Song is inseparably connected with poetry." এ-উদ্ধৃতিটি দিলাম এই জন্যে যে আমাদের দেশে সম্প্রতি কয়েকটি সঙ্গীতবিৎ ছাপার হরফে লিখছেন যে য়ুরোপে নাকি কণ্ঠসঙ্গীতের কোনো প্রতিষ্ঠাই নেই, শুধুই যন্ত্রসঙ্গীতেরি একতরফা সিংহনাদ। এ-অত্যদ্ভুত তথ্যটি তাঁরা কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন জানি না!! এখনো ওদেশে বড় গায়ক বড় বাদকের চেয়ে ঢের বেশি লোকপ্রিয় : কারুসো, শালিয়াপিন, লিলি লেমান প্রমুখ গায়ক-গায়িকার দক্ষিণাদি যে কোনো ক্রাইসলার, পাদ্রেউস্কি, হাইফেটজের চেয়ে বেশি। এ-তুলনা করছি যন্ত্রীকে গায়কের চেয়ে ছোট প্রতিপন্ন করতে নয়—শুধু দেখাতে যে কণ্ঠসঙ্গীতের আবেদন যন্ত্রসঙ্গীতের চেয়ে এখনো বেশি ব্যাপক। অন্তত গড়পড়তা স্থকুমার স্থকুমারীরা যে আবহমানকাল গানে ঢের বেশি সহজে সাড়া দিয়ে এসেছেন একথা প্রমাণ করা যায়—যদিও একথা প্রমাণ করা শক্ত যে, কণ্ঠসঙ্গীতের আবেদন যন্ত্রসঙ্গীতের চেয়ে গভীর—কেন না কোনো শিল্পের অনুরাগীর সংখ্যা দিয়ে তার গুণমূল্যের যাচাই হ'তে পারে না। কোন্ পরখে যে ঠিক্ যাচাই হয় তারও কোনো নিশ্চিত নির্দেশ মেলে না—স্থতরাং রুচির দোহাই দিয়ে বলাই ভালো যে গান বড় না বাজনা বড় এ-বিতণ্ডায় কোনো চরম মীমাংসা এখনি এখনি হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য একথা সত্য যে যন্ত্রসঙ্গীতে পাশ্চাত্যদেশে স্থরবৈচিত্র্য এক অভিনব জগত আবিষ্কার করেছে স্বর-সঙ্গতিতে ও সংধ্বনি-সঙ্গীতে। কিন্তু

বহু-স্বরসঙ্গমে মানুষ বেশি গভীর আনন্দ পায় না স্বরের স্বচ্ছ একমুখী স্বরধুনীতে এ-তর্কেরো কোনো নিষ্পত্তিই আজ অবধি হয় নি। য়ুরোপে এমন বহু সঙ্গীতানুরাগী আছেন যাঁরা শালিয়াপিনের গান শুনবেন সব ছেড়ে, পক্ষান্তরে এমনো অনেক সঙ্গীতানুরাগী আছেন যাঁরা ক্রাইস্‌লারের বেহালা শুন্‌তে যাবেন সব আগে। উইলার্ড সাহেব তাঁর বইয়ে এ-আলোচনা করতে গিয়ে কম বিপদে পড়েন নি। লিখছেন স্বয়ং রুসোর মতন সুকুমার বিদগ্ধ মনীষী যখন বলতেন মেলডি হার্মনির চেয়ে ঢের বড় তখন ভাবতে হয় বৈ কি। টলষ্টয়ও স্বরের সরলতাই ভালোবাসতেন—বলতেন ওয়াগ্‌নার প্রভৃতির হার্মনি সিমফনি কৃত্রিম। আবার একদল বলেন হার্মনি হ'ল সঙ্গীতের মস্ত বিকাশ—তার তুলনায় মেলডিকে বলতে হয় আদিম—প্রিমিটিভ। মুস্কিল এই যে, যে যাতে গভীরতর আনন্দ পায় সে তাকে মহত্তর বলবেই: মুখে তুলনা না করলে হবে কি?—মনে মনে আমরা যে অনুক্ষণই তুলনা ক'রে থাকি—না করার সঙ্গত কারণও খুঁজে পাওয়া ভার। সুতরাং দিশাহারা হ'য়ে শেষটায় ভিন্নরুচি-রূপ নন্দ ঘোষের 'পরেই সব দোষ চাপিয়ে হাঁফ ছাড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ধন্য কালিদাস!

কিন্তু যা বলছিলাম: নিষ্ফল বাগ্বিতণ্ডা রেখে যন্ত্রসঙ্গীতের মহিমা খুবই বেশি স্বীকার ক'রে নিয়েও একথা বোধ করি সমান অকুতোভয়েই বলা যেতে পারে যে কণ্ঠসঙ্গীতও বড় কেও-কেটা নন—সার রজার ডি কভার্লির ভাষায়: "Much can be said on both sides"—যেহেতু সব দেশেই এ-বিষয়ে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই একমত যে কণ্ঠের আবেদনে এমন একটা জাদু আছে যা কোনো যন্ত্রেই নেই। আর এই কণ্ঠসঙ্গীত যে কথা ও সুরের মিলন-মোহানায় এক মস্ত পরিণতি খুঁজেছে এ-বিষয়েও মতভেদ নেই। একথা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করি যখন বার্লিনে কণ্ঠসঙ্গীতের তালিম নেওয়া সুরু করি—যদিচ এ-উপলব্ধির আভাষ বহুবারই পেয়ে এসেছি—আশৈশব। ওদেশের কথা উঠতে মনে পড়ে আমার জীবনে একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের কথা—যেদিন ইংলণ্ডের বিখ্যাতা গায়িকা ক্লারা বাট্-এর

(Dame Clara Butt) মুখে প্রসিদ্ধ Abide with me গানটি শুনি :

Abide with me, fast falls the eventide :
The darkness deepens, Lord, with me abide !
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, oh, abide with me.

Swift to its close ebbs out life's little day :
Earth's joys grow dim, its glories pass away.
Change and decay in all around I see:
O Thou, who changest not, abide with me.

I need Thy presence every passing hour :
What but Thy grace can foil the tempter's power?
Who like Thy self my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, oh, abide with me.

Be Thou Thyself before my closing eyes :
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks and earth's vain
shadows flee :
In life, in death, O Lord, abide with me!

থেকো প্রিয় পাশে···সাঁঝপাখা আসে নেমে :
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো পাশে প্রেমে।
যবে ছেড়ে যায় সবে—সুখ নাহি হাসে,
অনাথের নাথ, তুমি থেকো মোর পাশে।

জীবনের ছোট দিনখানি হয় মায়া···
ধরণীর খেলা দীপমেলা হয় ছায়া···

মরণে অচিরে সবই ঝরে অবিকাশে :
হে চিরন্তন, তুমি থেকো মোর পাশে।

পলক-আড়াল নয়—থেকো কাছে কাছে :
তুমি ছাড়া আর বলো কে আমার আছে ?
তুফানে কে আর তারাদিশা উদ্ভাসে ?
আঁধারে আলোকে তুমি থেকো মোর পাশে।

কাছে এসো যবে আঁখি মুদিব হে শেষে,
দেখায়ো আকাশ কালোবুকে আলোরেশে।
ধরাছায়া সরে—অ-ধরার উষা আসে :
জীবনে মরণে নাথ, থেকো মোর পাশে।

মনে পড়ে টাইটানিক জাহাজ-ডুবির কথা। কল্পনানেত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে মজ্জমান নরনারীর এই গানটি গাওয়া—যখন অপার পারাবারে আসন্ন ধ্বংস থেকে বাঁচাবার আর কেউ কোথাও নেই। শেষ মুহূর্তে ৺মহাপ্রাণ মনস্বী ষ্টেডও সে গানে যোগ দিয়েছিলেন জলসমাধির প্রাক্-অন্তিম লগ্নে।

বেশ মনে পড়ে—কেম্ব্রিজে যেদিন ৺ক্লারা বাট্ এলেন। অত বড় কনট্রালটো গায়িকা ইংলণ্ডে খুব কমই জন্মেছে। প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান নেই। সবাই উদ্‌গ্রীব—আশায় আগ্রহে আনন্দে···ধীরপদবিক্ষেপে এলেন শ্রীমতী। জয়ধ্বনি করতালি ফুলের তোড়া—আরো কত কী !··· গাইলেন গান। কী কণ্ঠ !·· কী উচ্চারণ···ভাব ব্যঞ্জনা !···উচ্ছ্বসিত না হ'য়ে পারা যায় ! মনে কেবলই হতাশার সুর ওঠে রণিয়ে : এরকম কণ্ঠ না হ'লে কী হবে গান ক'রে ?—গান তো হ'ল সুরু।···কত সুন্দর কাব্যসঙ্গীতই যে গাইলেন তিনি ! শেষে সবাইয়ের আর্জি : "Abide with me, please". মৃদু হেসে অভিবাদন ক'রে শ্রীমতী ধরলেন এ-বিখ্যাত স্তোত্রটি।···পাশের মহিলার চোখে জল। ওপাশেও চোখ মুছছেন একটি শ্মশ্রুবহুল গম্ভীরানন।

সেদিন মনে একটা পুরোনো প্রশ্নই উথলে উঠেছিল যেন এক নূতন হিল্লোলে। বলেছি, গানের স্মৃতিচারণে এক এক দিনের রেশ যেন মিলিয়েও মিলোয় না, ফুরিয়েও ফুরোতে চায় না। অচ্ছন বাইয়ের স-আঁখর ঠুংরি, বালক চন্দ্রশেখর পন্থের তুলসীদাসী ভজন, সিদ্ধেশ্বরী বাইয়ের "জয় জগদীশ হরে" পদাবলীর মতন ক্লারা বাটের এ-স্তোত্রটি আমার স্মৃতির পুঁজিতে চিরদিনই মহার্ঘ হ'য়ে বিরাজ করবে। কণ্ঠসঙ্গীতে যাকে ওরা বলে 'টোন' তার মূল্যও বোধ হয় সেদিন সবচেয়ে বেশি হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। শ্রীমতীর সে কন্ট্রাল্টো উদাত্ত কণ্ঠে অপূর্ব ট্রেমোলো কম্পন-সহযোগে আবেগের গভীরায়মান ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠল যেন কাব্যের ছবিখানি! ইংরাজিতে একটা কথা বলে: "Scales fall from the eyes": চোখের ঠুলি খ'সে পড়া। কিন্তু তবু সেই পুরানো প্রশ্ন ঢেউ তুলেছিল মনের তটে: কথাও ভালোবাসি···স্থরও করে উদাসী।···কিন্তু দুয়ের মধ্যে কি কোনো গরমিল আছে? কতদিনই তো এ-জিজ্ঞাসা মনে জেগেছে। না জেগে পারে? যে-মন আশৈশব রাগসঙ্গীতে দীক্ষিত এবং কবিতার পূজারী···সে গানে না ছাড়তে পারে কথাকে, না স্থরকে। অথচ কথার মধ্যে যেন এমন একটা স্থূলতার ইঙ্গিত আছে যা স্থরের নেই। কথার এলাকা যেন জলস্থল: স্থরের রাজ্য যেন আকাশ। নয়?

অথচ কে যেন গহনস্থরে বলত: "ওসব উপমা ভুল ভুল। মানি এরা ভিন্ন। কিন্তু তবু কোথায় এদের মিল আছেই আছে, খোঁজো দেখি—পাবে!" কল্পনানেত্রে ফুটে উঠত সেই স্বরময়ীর অধরে স্ফিংক্সের হাসি—আমি ব'লে দেব না তুমি খোঁজো প্রাণসাধনায়—শিল্পসাধনায়। কবীরের অপরূপ গানটি মনে পড়ত বার বার:

বাস কহে: "হম ফুলকো পাউঁ", ফুল কহে: "হম বাস।"
ভাস কহে: "হম সৎকো পাউঁ", সত্য কহে: "হম ভাস॥"
রূপ কহে: "হম ভাবকো পাউঁ", ভাব কহে: "হম রূপ।"
আপসমে দুঁহুঁ বন্দন চাহে, পূজা অগধি অনুপ॥

গন্ধ গাহিল : "আমি ফুল-ফুল্‌ঝুরি চাই"—ফুল গায় : আমি চাই বাস।"
বাণী গায় : "আমি চাই সত্য"—সত্য গায় : "আমি চাই বাণী পরকাশ।"
রূপ গায় : "আমি চাই ভাব-রস"—ভাব গায় : "আমি চাই রূপের বিলাস।"
একান্তে দুঁহুঁ চায় দুঁহুঁ পূজা-বন্দনে অগাধ মিলন-সম্ভাষ।

মনে হ'ত আরো কত কথা। কখনো মন ঝুঁকত আলাপের দিকে, কখনো ভজনের দিকে। আরো কতরকম অনৈশ্চিত্য। কিন্তু বেশ মনে পড়ে সেদিন অনেকদিনকার একটা আবছায়া প্রতীতি যেন আলো হ'য়ে ফুটেছিল। মনে হয়েছিল : কেন এত ভুলবোঝা, মনকষাকষি? মিলন যদি আনন্দের হয় তবে কী যায় আসে বিশুদ্ধি বজায় থাকা না থাকা নিয়ে? তাছাড়া সুর ও কথা দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির মেনে নিলেই বা কী? স্বতন্ত্র ব'লেই তো চাই ওদের মিলন; দুজনার দুই ছন্দ দুই কদম—তাই না ওদের মিলনে জাগবে নব সুষমা। হঠাৎ মনে ভিড় ক'রে এল দূরশ্রুত তরঙ্গরেশে কত দিনের শোনা কত গানে কত কথা পেয়েছে সুরের পাখা, সুর পেয়েছে কথার আলো…যেন এক চেয়েছে আরেকের প্রেমে মিলনমুক্তি। দুয়ের মধ্যে বিরোধ না থাক বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু তাতে কী? ব্যবধান আছে ব'লেই না ওরা চায় মিলতে প্রেমের সেতু বেঁধে। দোসরের কাছছাড়া হ'য়ে একজনের এক মূর্তি, দোসরকে কাছে পেলে আর এক কান্তি। দাম্পত্য-সুষমা যারা চায় তাদের প্রত্যেকেই ছাড়ে কিছু। কিন্তু ছাড়ে কেন? ছাড়া তো নয় জীবনের ধর্ম। অহেতুক যে ছাড়ে তার চেয়ে মূঢ় কে? আত্মার ধর্ম 'ছাড়া' নয়—'পাওয়া'। বাইরে থেকে দেখতে যাকে ছাড়া বলি সেও হ'ল আসলে পাওয়াই—তবে এ-পাওয়ার মূর্তি ফুটতে সময় নেয় এই যা। তাই প্রথমে অনেক সময়ে অনেক ত্যাগকে ত্যাগ মনে হয়…ব্যথা বাজে :

জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।

বাজে তো বটেই প্রথমটায়। নৈলে ত্যাগ তো সাধনা হ'ত না, হ'ত ছেলেখেলা।

কিন্তু ত্যাগ ছেলেখেলা হয় নি শুধু তাতে ব্যথা আছে ব'লেই নয়—ছাড়ার মধ্যে দিয়ে আরো বড় কিছু পাই ব'লেই।

গানের বেলায়ও এম্‌নিই ঘটেছে। মানুষের কণ্ঠে প্রথমে ফুটেছে সুর, পরে—কথা। ওরা পরস্পরের কাছে আসতে চেয়েছে। আসার পথে বাধা দিল হানা। সব বড় মিলনের ফুলপথেই তো কাঁটার অন্তরায় আছেই: শেক্ষপীয়র গান নি কি—"The course of true love never did run smooth?" তবু ওরা চাইল পরস্পরকে। পেতে গিয়ে দেখল প্রত্যেককেই তার অহমিকা ছাড়তে হ'ল, মিলনের চরণে শরণ নিতে গিয়ে যাকে বলি আত্মবৈশিষ্ট্য তার অনেকখানিই দিতে হ'ল বিসর্জন। অভিমান নেই কার? তাই ত্যাগের ব্যথা বাজল না কি আর প্রথমটায়? বাজল বৈ কি। কিন্তু তবু সে ব্যথাও হ'ল সার্থক, কেন না সেই ব্যথা-বরণেই যে অভিমান হ'ল স্বেচ্ছানত—"পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্র"—মিলন হ'ল কৃতার্থ। তাই তো কথার সাথে সুরের হ'ল মালাবদল, সুরশ্রী হ'ল গীতশ্রী, কথার মালায় হ'ল সুরের গন্ধ ঢালা, দুয়ে মিলে ফুটে উঠল যে-সুষমা তার ছন্দ না সুরের, না কথার: এল এক অভিনব সুষমা—বিরোধ-সমঞ্জসা নব সার্থকতা।

কণ্ঠসঙ্গীতের বেলায় এই সামঞ্জস্যে সমন্বয়েই ফুটল গানের সুষমা। আমরা দেখেছি মার্গসঙ্গীতে আবহমান কাল কথা আমলই পায় নি। কারণ গুণীর কণ্ঠলোকে যখন

সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে।
তখন পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।

কিন্তু তার পরও গুণী হৃদয় বলে: "আরো চাই আমি। শুধু সুরে আমার আশ যে খানিকটা মেটে না তা নয়—মেটে সুরতৃষ্ণা —এ-ও আমার অন্তরের এক গভীর তৃষ্ণা বৈ কি। কিন্তু আমার অন্তর বিচিত্র, শুধু একের প্রেমে তার নেই পূর্ণ শান্তি, সার্থকতা।

সে যে প্রকৃতিতে বহুবল্লভ, বহুবিচিত্র, বহুছন্দ, বহুঝঙ্কার। তাই কথায় সুরে মিলে যে-রস তার তৃষ্ণাও আমার কাছে বিশুদ্ধ সুরতৃষ্ণার মতনই চিরন্তনী তৃষ্ণা। সুতরাং শুধু কণ্ঠবাদন বা যন্ত্রঝঙ্কারই আমি চাই না—কাব্যসঙ্গীতেরও আমি পিপাসী।"

একথা যখন সে বলল তখন আমাদের দেশের ধুরন্ধর ওস্তাদপন্থিরা রেগেই খুন: "কথা? কথা আবার কি? গান বিলোবে শুধু রাগ তান সুরের হাওয়া—কথার মাধ্যাকর্ষণে সে লুটোবে আকাশ ছেড়ে মাটিতে! রে উদ্বাহু বামন! সুরের চাঁদে লোভ তোর? আমরা—ওস্তাদ-মুসোলিনীরা—কচাকচ কেটে ফেলব অমন পাপিষ্ঠ হাত! পুড়িয়ে মারব তোর অস্পৃশ্য কথার কাঙালকে যদি তাকে ডাক দিস্ আমাদের খানদানী কুলীন সুরের পংক্তিভোজনে।"

কিন্তু হায় রে! ওস্তাদপন্থিরা ভুলে যান যে যাকে রাখে কৃষ্ণ সে বৈরী হ'ল মরিয়া-না-মরে-রাম! তাই আমাদের সুরকুলীনদের জাজ্বল্যমান ব্রহ্মতেজেও কথা-হরিজনের গায়ে আঁচটি লাগে নি: ঠুংরিতে, গজলে, ভজনে, কীর্তনে, বাউলে,—শেষটায় হাল আমলের বহুবিচিত্র বিপুলকায় বাংলাসঙ্গীতের অভিব্যঞ্জমান সাম্রাজ্যে সে প্রোজ্জ্বল স্বারাজ্যের নিত্যনব আইন অনুশাসন রীতি নীতি আবিষ্কার ক'রে রসে রূপে গন্ধে বর্ণে অপরূপ হ'য়ে পপুলেশন বৃদ্ধি করছেই। সুরকুলীনবংশীয়দের অজস্র আপত্তি সে হেসেই করল অগ্রাহ্য ওস্তাদ-কোতোয়ালদের অন্তরীণ-পরোয়ানার পরোয়া না রেখে।

কোতোয়ালরা কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করেন নি—শুধু ফতোয়াই নয়, তার সঙ্গে যুক্তিনামা অনেক কিছু দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা পেয়েছিলেন সপ্রমাণ করতে যে সঙ্গীতরাজ্যে কথা নাকি অচল। মনে পড়ে ষ্টীমএঞ্জিন প্রবর্তক ওয়াট্‌সের আমলে গাণিতিকবৃন্দের সেই বিখ্যাত তর্ক: তাঁরা ছক কেটে ওয়াট্‌স্‌কে দেখিয়ে দিলেন কেন ষ্টীমের জোরে গাড়ি সরলরেখায় চলতেই পারে না। তাঁদের যুক্তি তথা গাণিতিক হিসাবে ভুল হয়েছিল কি না জানা নেই, তবে এটা জানা গেছে যে, ষ্টীমে গাড়ি চলেছিল।

সুর ও কথার রফা

ওস্তাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হাসিতামাশার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা কথা বিশেষ ক'রে ব'লে রাখা দরকার : যে, এ-ঠাট্টার নিশানা মার্গসঙ্গীত নয়—ব্যঙ্গবাণ সে-নীলিমার নাগাল পায় না—আমাদের নিশানা শুধু ঐ অনুদার কুসংস্কারান্ধ ওস্তাদ কালোয়াৎবৃন্দ। কারণ প্রশান্ত উদার দৃষ্টিতে দেখলে বাংলাগানের সঙ্গে মার্গসঙ্গীতের ভাব ছাড়া আড়ি নেই। আসল কথা হ'ল এই যে ও দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কেন তার আভাষ দিয়েছি। সহজ সরল দৃষ্টিতে দেখলে কোনো গোলই থাকে না—যদিও তার্কিক চণ্ডীচরণের ভঙ্গিতে দেখতে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরূপ, যেহেতু :

(জানো) চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থকার
(হায়) এম্‌নি তিনি হিন্দুধর্মের মর্ম করতেন ব্যক্ত
(যে) দিনের মতন জিনিষ হ'ত রাতের মতন অন্ধকার
(আর) জলের মতন বিষয় হ'ত ইটের মতন শক্ত।

সত্যিই ওস্তাদিপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেই মনে হয় ভলটেয়ারের কথা যে আমি যুক্তিই দিতে পারি, মস্তিষ্ক—সে বিধাতার সৃষ্টি। একথা মনে হওয়ার কারণ এই যে যুক্তিটি সত্যিই জলের মতন : শুধু এই যে, মার্গসঙ্গীতের শাখা উপশাখার ইতরবিশেষ বাদ দিলে দেখা যায় যে সে-সঙ্গীত একান্ত ক'রে চেয়েছে গানের শুধু সুররূপ। বস্তুত মার্গসঙ্গীতের মামুলি ধারাটি ছিল এই যে ও আসলে যন্ত্রসঙ্গীতধর্মী—একপেশো সুরের কারবারী। তাই যখন ওস্তাদরা গান—থুড়ি, কণ্ঠবাদন—করেন, তখন অত্যন্ত অসার কথা ব্যবহার করতে তাঁরা একটুও কুণ্ঠিত হন না : অম্লানবদনে মধুর কালাংড়ায় গান করতে তাঁদের বাধে না। বিখ্যাত কদরপিয়ার একটি গান—শিখেছিলাম তাঁর পুত্রের কাছে লক্ষ্ণৌয়ে :

পিয়া, অবতক্ মোরি সিজিয়া নহি আয়ে
কহো তো গুঁইয়া অব কা কিয়া জায়ে ?
অর্থাৎ
প্রিয়, এখনো যে খাট এলো না হায়
বলো তো সজনি, কী করা যায় ?

মনে পড়ে "কারি কারি কামেলিয়া গুরুজী, মোহে মোল লে দে, রামজপনকো মালা লে দে, পানি পিবনকো তোঁবরিয়া গুরুজী" নামক বিখ্যাত পরজ গানটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব রসিকতা। কবির কথাগুলি শুধু মজারই নয়, এথেকে তিনি বেশ বুঝিয়েছেন বাংলা ও হিন্দুস্থানি গানের দৃষ্টিভঙ্গির কোথায় গরমিল। তাই একটু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও কবির কথাগুলি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

"পরজ রাগিণীতে একটা হিন্দি গান জানতুম, তার বাংলা তর্জমা এই :—কালো কালো কম্বল গুরুজি, আমাকে কিনে দে ; রামজপনের মালা এনে দে, আর জলপান করবার তুম্বি। ঐ ফর্দে উদ্ধৃত ফরমাসী জিনিষগুলিতে যে সুগভীর বৈরাগ্য আছে পরজ রাগিণীই তা ব্যক্ত করবার ভার নিয়েছে। ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি। আমি বাঙালি, আমার স্কন্ধে নিতান্তই যদি বৈরাগ্য ভর করত, তবে লিখতুম :—

গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা।
সম্পদ হোক্ জপের মালা
নাম মণির দীপ্তি জ্বালা,
তুম্বিতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয় তৃষা।

কিন্তু এ-গানে পরজ তার ডানা মেলতে বাধা পেত। পরজ হোত সাহিত্যের খাঁচার পাখী।" (সুর ও সঙ্গতি, ৮৫ পৃষ্ঠা)

এই কথাটাই বিশেষ ক'রে প্রণিধানের যোগ্য। যে-গানে কথার কাব্যরস আছে সেখানে সুর যদৃচ্ছ উড়ে বেড়াতে পারে না, কেন না সে আর একলা নেই পেয়েছে কথাকে সঙ্গিনী। যেখানে সেখানে হৈ হৈ ক'রে আর তার রাতকাটানো চলে না—নীড়টিতে তাকে ফিরে আসতেই হ'ল—গৃহলক্ষ্মীর মুখ চেয়ে।

এ-সমস্যা নিয়ে আমাকে কম ভাবতে হয় নি। আর সে কি আজ থেকে? কৈশোর থেকেই কাব্য ও সুরের দৃশ্যত বিরোধের মধ্যেও মিলনাভাষ পেয়ে আসছি, এ নিয়ে কত তর্ক কত আলোচনা যে করেছি কত লোকের সঙ্গে তার শেষ নেই। সবচেয়ে বেশি লাভ করেছি দুজনের আলোচনায়: অমিয়নাথ ও রবীন্দ্রনাথ। অমিয়নাথের কথা একটু আগেই বলেছি। তিনি বহুদিন ধ'রে আমাদের হিন্দুস্থানি সঙ্গীত চর্চা ক'রে আসছেন। সুরে এঁর দখল অসামান্য, সঙ্গীতে অভিজ্ঞতাও খুব পাকা। তিনি বরাবরই বলতেন কণ্ঠসঙ্গীত গানের পর্যায়ে উঠবে কেবল তখনই যখন সে-পুণ্যতীর্থে কাব্য ও সুরের হবে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম। আর বারবারই বলতেন যে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে এটা অতীতে ঘটে নি ব'লেই যে ভবিষ্যতেও ঘটবে না একথা বলার শুধু একটি নাম আছে: হঠকারিতা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এ-বিষয়ে বহু তর্ক আলোচনা করেছি। এসূত্রে তাঁর চরণতলে কত যে প্রত্যক্ষভাবে শিখতাম তা বলতে পারি না। তাই সে-সবের অনুলিপি আমি প্রায়ই রাখতাম। বর্তমান প্রসঙ্গে তার মধ্যে একটি এখানে ফের উদ্ধৃত করি। এ-অনুলিপিটি কবি স্বহস্তে সংশোধিত ও অনুমোদন ক'রে আমাকে ছাপতে পাঠান আজ বার বৎসর আগে। এর তারিখ ২৯শে মার্চ, ১৯২৫ সাল, এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩২ এর বঙ্গবাণীতে। কবির মুখের কথাগুলির ভাষা সেটা ওঁর স্বকীয় দীপ্তিতেই প্রতীয়মান হবে।

কবিবর অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন, তাঁকে গিয়ে প্রণাম করতেই উঠে বসলেন। হেসে বললেন: "তোমার সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা আজ বিজলীতে পড়ছিলাম।"

আমি বললাম : "মন্তব্য ?"

কবি বললেন : "তোমার লেখার সঙ্গে মূলত আমি একমত। যারা রস রূপের লাবণ্যে মজে জগতে তাদের সংখ্যা অল্প, যারা বাহাদুরিতে ভোলে তাদেব সংখ্যাই বেশি। এই জন্য অধিকাংশ ওস্তাদই কসরৎ দেখিয়ে দিগ্বিজয় ক'রে বেড়ায়। ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ-মর্যাদায় ছিল, বাইবের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের ম'ত তাল ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই—বিখ্যাত যদুভট্ট—যাঁর কাছে ৺রাধিকাবাবু কিছু শিখেছিলেন।"

বললাম : "কিন্তু আপনার কি তাঁর গান মনে আছে ? খুব ছেলেবেলায় আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে খুব অন্তর্দৃষ্টি থাকে না; কাজেই সে সময়ে উচ্চ সঙ্গীতে আমাদের হৃদয় কেমন সাড়া দেয় সেটাও ভাল স্মরণ থাকার কথা নয়।"

কবি বললেন : "কিন্তু আমার স্মৃতিতে এখনও সে-সঙ্গীতের রেশ লুপ্ত হয় নি। যদু ভট্টের জীবনের একটি ঘটনা বলি শোনো। ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর গানের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার তাঁর সভায় অভ্যাগত একজন হিন্দুস্থানি ওস্তাদ নটনারায়ণ রাগে একটি ছোট গান গেয়ে যদু ভট্টর কাছে তারি জুড়ি একটি নটনারায়ণ গানের প্রত্যাশা করেন।

"যদুভট্টর সে রাগটি জানা ছিল না, কিন্তু তিনি পরদিনই নটনারায়ণ শোনাবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হ'লেন। ওস্তাদজি গাইলেন। যদুভট্টের কান এমনই তৈরি ছিল যে তিনি সেইদিনই রাতে বাড়ি গিয়ে চৌতালে ঐ রাগে গান বাঁধলেন, পরদিন সভায় এসে সকলকে সেটি শুনিয়ে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত সেই সুরে জ্যোতি দাদা একটি বাংলা গান রচনা করেছিলেন।" ব'লে কবিবর গুণ গুণ ক'রে একটু গেয়ে শোনালেন।

বললাম : "এ-রকম গায়ক এক একজন ক'রে যাচ্ছেন তাতে দুঃখ করা এক রকম বৃথা, কারণ গায়কও সঙ্গীতের খাতিরে কিছু অমর হ'তে

পারেন না। তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের দেশে সঙ্গীত-রাজ্যে একজন গুণী গেলে তাঁর স্থান নেবার লোক আর মেলে না। য়ুরোপে এ-রকমটা হয় না। সেখানে এক গায়ক যায় বটে কিন্তু তার স্থান নেয় অন্য গায়ক।"

কবি বললেন: "তা সত্য।" একটু থেমে: "আজ তোমার সঙ্গে একটা আলাপ করতে চাই।"

সাগ্রহে বললাম: "বলুন।"

কবি বললেন: "অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে যে মত-ভেদের কল্পনা করি, আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় তার অনেক-খানিই ফাঁকি। বাংলা ও হিন্দুস্থানি গান নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ যদি বা থাকে তাহ'লে অন্তত তার সীমাটি স্পষ্ট ক'রে নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। নইলে সত্যের চেয়ে ছায়াটা বড় হ'য়ে অমিলটা প্রকাণ্ড দেখতে হয়। গোড়াতেই একটা কথা জোর ক'রে ব'লে রাখি, ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানি গান শুনে আসচি ব'লে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানি গানে আমাকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করে।"

বললাম: "কী খুসি যে হ'লাম—যদিও অনেকেরই দেখি ধারণা যে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের আপনি বিরোধী।"

—"মোটেই না। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের যে একটি উদার বিশেষত্ব, যেটাকে তুমি বলেছ—স্বরবিহার, অর্থাৎ স্বরের মধ্য দিয়ে শিল্পীর নিত্যনিয়ত নব নব সৌন্দর্যসৃষ্টির স্বাধীনতা—সেটা য়ুরোপের সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা ক'রে আরও স্পষ্ট বুঝতে পারি।"

—"আমারও য়ুরোপে অনেকবার মনে হয়েছিল যে, আমাদের শুধু সঙ্গীতে নয়, সভ্যতায়ও, ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটি ঠিক ঠিক বুঝতে হ'লে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয় লাভ করা দরকার। নইলে ঠিক যেন চোখ ফোটে না।"

—"সত্যি কথা। কিন্তু একটা বিষয় আমি তোমাকে আজ একটু বিশেষ ক'রে বলতে চাই। তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানি

সঙ্গীতের ধারার বিকাশ যে-ভাবে হয়েছে আমাদের বাংলা গানের সেভাবে হয় নি? এ দুয়ের মধ্যে প্রকৃতি-ভেদ আছে। বাংলার বিশেষত্বটি যে কি, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আমাদের কীর্তনে। সেখানে আমরা যে আনন্দ পাই সে ত অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হ'য়ে মিলিত।"

—"কিন্তু সুর—"

—"কীর্তনে সুরও অবশ্য কম নয়; তার মধ্যে কারুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তা সত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার ভাবের, সুর তারই সহায় মাত্র। এ কথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কীর্তনের প্রাণ অর্থাৎ আঁখর কি বস্তু সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার তান নয় কি? হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই; সঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত হ'য়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি, নয় কি? কিন্তু কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাব রসটিকেই নানা আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ ক'রে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আঁখর অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মত কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম ক'রে বর্ষিত হ'তে থাকে। সেই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্চে সঙ্গীতসম্মিলিত কাব্য। সঙ্গীতই তাকে সেই আবেগ-বেগের তীব্রতা দিয়েছে যাতে ক'রে নূতন নূতন আঁখর তা-থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে। গীতহীন কাব্য যেখানে স্তব্ধ থাকে সেখানে আঁখর চলে না। বিদ্যাপতি পাঠকালে পাঠক তাতে নূতন বাক্য-যোজনা করলে ফৌজদারি চলে, কারণ পাঠক তো বিদ্যাপতি নয়! কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বিশুদ্ধ কাব্যের আদর্শে আঁখরে যে-দৈন্য অনিবার্য, কীর্তনের সুরের ঐশ্বর্য সেটাকে পূরণ করে দেয় ব'লেই তাতে ক'রে রসের সহায়তা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কীর্তনে, সুরে-বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েচে। যোগের এই দুই অঙ্গের মধ্যে কে বড় কে ছোট সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। উভয়ের যোগে যে-সৌন্দর্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে উভয়কে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে সেই সৌন্দর্যকেই হারাতে হবে। জলের থেকে অক্সিজেনকেই নিই, বা

হাইড্রোজেনকেই নিই তাতে জলটাই যায় মারা। বাংলা পদগান জলেরই মত যৌগিক সৃষ্টি—দুইয়ে মিলে তবে অখণ্ড। হিন্দুস্থানি গান রূঢ়িক, তা একাই বিশুদ্ধ। সৃষ্টি ব্যাপারে রূঢ়িক শ্রেষ্ঠ না যৌগিক শ্রেষ্ঠ এ তর্কের কোনো অর্থ নেই। ভালো যা তা ভালো ব'লেই ভালো—রূঢ়িক ব'লেও না, যৌগিক ব'লেও না।"

—"বাংলার-যে কাব্যে একটা নিজস্ব দান আছে একথা না মানবে কে? কিন্তু তাই ব'লে কি প্রমাণ হয় যে আমাদের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না! আমাদের দেশে বড় বড় কবি জন্মেছেন সত্য; কিন্তু তা থেকে কি সিদ্ধান্ত করা চলে যে আমাদের দেশে সঙ্গীতকার জন্মাতেই পারে না? ধরুন যদুভট্ট, অঘোর চক্রবর্ত্তী, রাধিকা গোস্বামী, সুরেন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বড় বড় গায়কও তো জন্মেছেন আমাদের দেশে?"

—"বটে, কিন্তু তাঁরা কেবলমাত্র গাইয়ে, অর্থাৎ সুর-আবৃত্তিকার—হিন্দুস্থানির কাছ থেকে শিখে। হিন্দুস্থানিদের মধ্যে বিশুদ্ধ সঙ্গীতে একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি আছে যেটা তাদের একটা সত্যকার সম্পৎ, ধার-করা জিনিষ নয়। কাজেই এ-উৎস তাদের মধ্যে সহজে শুকিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীতে অর্থাৎ হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে বড় গায়ক মানে কি জানো? যেন খাল কেটে জল-আনা—একটু দৃষ্টি না রাখলেই শুকিয়ে যেতে বাধ্য। ওদের দেশে কিন্তু বিশুদ্ধ সঙ্গীতের বিকাশ খাল কেটে টেনে আনা নয়, নদীর স্রোতের মতনই স্বচ্ছন্দগতি, চলার চালেই মাতোয়ারা।"

(সে সময়ে কবির সঙ্গে এক্ষেত্রে সায় দিতে পারি নি—আজ বুঝেছি যে, কবিই ঠিক বলেছিলেন, আমার ধারণাই ছিল কাঁচা। খাল ও নদীর উপমাটি অনবদ্য)।

কবি ব'লে চললেন: "বাংলার বৈশিষ্ট্য যে অবিমিশ্র সঙ্গীতে নয় তার একটা প্রমাণ মেলে যন্ত্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। সঙ্গীতের বিশুদ্ধতম রূপ কিসে?—না, যন্ত্র-সঙ্গীতে। একথা তো অস্বীকার করা চলে না? কিন্তু দেখ, বাংলা দেশ কখনও হিন্দুস্থানিদের মত যন্ত্রীর জন্ম দিয়েছে কি?

আরও দেখ ওরা কেমন অকিঞ্চিৎকর কথা গানের মধ্যে অম্লান-বদনে চালিয়ে দেয়। অক্ষমতা বশত নয়, সুরের তুলনায় ওদের কাছে কথার খাতির কম ব'লে। বাঙালী ভাগ্যদোষে কুকাব্য লিখতে পারে কিন্তু অকাব্য লিখতে কিছুতেই তার কলম সরবে না। 'সামলিয়ানে মোরি এঁদোরিয়া চোরিরে।' এঁদোরিয়া মানে বুঝি জলের ঘড়ার বিড়ে। শ্যামচাঁদ সেটি চুরি করেছেন, কাজেই তার অভাবে শ্রীরাধার জল আনার দারুণ অসুবিধা ঘটেছে। এইটেই হ'ল সঙ্গীতের বাক্যাংশ। বাঙালি কবি এঁদোরিয়া চুরি নিয়ে পুলিশ-কেসের আলোচনা করতে পারে কিন্তু গান লিখতে পারে না।"

আমরা ভারি হেসে উঠলাম। কবিও আমাদের হাসিতে যোগ দিলেন। হাসির রোল থামলে বললাম: "একথা আমি মানি। কিন্তু এথেকে কি তাহ'লে এই সিদ্ধান্ত করব যে ওদের গান শেখা আমাদের পক্ষে পণ্ডশ্রম?"

—"কখনই নয়। আমরা কি ইংরেজি শিখিনা? কেন শিখি? —ইংরেজি সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্যে হুবহু নকল করবার জন্য নয়: তার রস-পানে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় স্বকীয় শক্তিকেই নূতন উদ্যমে ফলবান ক'রে তোলবার জন্যে। রেনেসাঁস যুগে ইংরেজি সাহিত্য ধাক্কা পেয়েছিল ইতালি থেকে, কিন্তু জাগরণটা তার নিজেরই। শেক্সপিয়রের অধিকাংশ নাট্যবস্তুই বিদেশের আমদানি কিন্তু তাই ব'লেই শেক্সপিয়রের রচনা ইংরেজি সাহিত্যে চোরাই মাল এমন কথা তো বলা চলে না! গানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত ভালো ক'রে শিখলে তা থেকে আমরা লাভ না ক'রেই পারব না। তবে এ লাভটা হবে তখনই যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ ক'রে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তর্জমা ক'রে বা ধার ক'রে সত্যিকার রসসৃষ্টি হয় না; না সাহিত্যে, না সঙ্গীতে।"

—"তা তো বটেই। বাঙালির গান কেন হিন্দুস্থানি সঙ্গীত থেকে লাভ করবে না? এ লাভ করাই তো স্বাভাবিক, কারণ সত্য লাভে তো স্বকীয়তা নষ্ট হয় না—অনুকরণেই হয়। আমরা আমাদের নিত্য-নূতন

বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই না শিল্পজগতে নতুন সৃষ্টি ক'রে থাকি? আর এতেই ত সমৃদ্ধতর হার্মনি—সুষমা—গ'ড়ে ওঠে?"

—"নিশ্চয়। দেখ, য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে কি আমরা একটা নতুন সমৃদ্ধি লাভ করি নি? না, যদি না করতাম তবে সেটাই হ'ত বাঞ্ছনীয়?"

—"অবান্তর হ'লেও এখানে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। অনেকে বলেন যে অমুক বাঙালি নাট্যকারই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক। যুক্তি জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উত্তর দেন যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে এক তাঁর মধ্যেই য়ুরোপের প্রভাব বিন্দুমাত্রও প্রতিফলিত হয়নি। আমার সত্যিই আশ্চর্য লাগে যখন আমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের মুখেও অম্লানবদনে এরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হ'তে শুনি! এহেন কূপমণ্ডূকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যেরকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো সভ্যদেশে সেভাবে পেতে পারে না, পারে কি?"

—"বটেই তো। দুর্গম গিরিশিখরের উৎস থেকে যে আদি নির্ঝরটি ক্ষীণ ধারায় বইচে তাকেই বিশুদ্ধ গঙ্গা ব'লে মানব, আর যে-ভাগীরথী উদার ধারায় সমুদ্রে এসে মিলেছে তার সঙ্গে পথে বহু উপনদীর মিশ্রণ ঘটেছে ব'লে বলব অশুদ্ধ, অপবিত্র এমন কথা নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধেয়। প্রাণের একটা শক্তি হচ্ছে গ্রহণ করার শক্তি, আর একটা শক্তি—দানের। যে মন গ্রহণ করতে জানে না, সে ফসল ফলাতেও জানে না, সে তো মরুভূমি। যদি বাঙালির বিরুদ্ধে কেউ এ অভিযোগ আনে যে, তার মনের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা সব আগে প্রভাব বিস্তার করেছে তা হ'লে আমি তাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা পাই না, বরং গৌরব বোধ করি। কারণ এই-ই তো জীবনের লক্ষণ।"

—"আপনার কথাগুলি আমার ভারি ভালো লাগল। আর্ট জগতে চিন্তারাজ্যের একটু খবর রাখলেই কি দেখা যায় না যে এক সভ্যতা নিত্যই অপর সভ্যতা থেকে নূতন সম্পদের প্রবর্তনা পেয়েছে। তাই যে দু-চার জন লোক থেকে থেকে তারস্বরে রোদন ক'রে ওঠেন—গেল গেল য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালির বাঙালিত্ব ডুবল, তাঁদের সে-আর্তনাদে অন্তত আমার মন তো সাড়া দিতে চায় না।"

—"তা তো বটেই। তাছাড়া কোন্‌টা বাঙালির আর কোন্‌টা বাঙালির নয়, তার বিচার শোনবার জন্ম আমরা কি কোনো স্পেশাল-ট্রিবিউনালের মুখ চেয়ে থাকব? বাঙালি গ্রহণ-বর্জনের দ্বারাই আপনি তার বিচার করচে। হাজার প্রমাণ দাও না যে, বিজয়বসন্ত বাংলার বিশুদ্ধ কথা-সাহিত্য, বঙ্কিমের নভেল বিশুদ্ধ বঙ্গীয় বস্তু নয়,—তবু বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা বিজয়বসন্তকে ত্যাগ ক'রে বিষবৃক্ষকে গ্রহণ করার দ্বারাই প্রমাণ করচে যে, ইংরেজি সাহিত্য-বিশারদ বঙ্কিমের নভেল বাংলার প্রাণের জিনিষ। আমি তো একবার দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সম্বন্ধে লিখেছিলাম যে, তাঁর গানের মধ্যেও য়ুরোপীয় আমেজ যদি কিছু এসে থাকে তবে তাতে দোষের কিছু থাকতেই পারে না, যদি তার মধ্যে দিয়ে একটা নূতন রস আপন মর্যাদায় ফুটে ওঠে। আর দেখ, য়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদের দুয়ারে এসেছে, আমাদের পাশে শতবর্ষ বিরাজ করেছে। আমি বলি আমরা কি পাথর, না বর্বর যে তার উপহারের ডালি প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যাওয়াই আমাদের ধর্ম ব'লে মানব? যদি একান্ত অবিমিশ্রিতাকেই গৌরবের বিষয় ব'লে গণ্য করা হয়, তাহ'লে বনমানুষের গৌরব বড় হ'য়ে দাঁড়ায় মানুষের গৌরবের চেয়ে। কেন না, মানুষের মধ্যেই মিশেল চলছে, বনমানুষের মধ্যে মিশেল নেই।"

কবির এ-কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তনীয় ব'লেই আমি এ কথোপকথনটি পুনর্মুদ্রিত করলাম।

এর মধ্যে সার কথাটি অনুধাবনীয়: যে, বাংলা গানে একরোখা সুরবিহার নামঞ্জুর। কারণ এ-গানকে বলা যেতে পারে কাব্যসঙ্গীত, কাজেই এখানে কথা ও সুর উভয়ে মিলে তবে সৃষ্টি—যুগলমিলনেই রস। প্রাচীন কীর্তনের ভাষায় রাধাশ্যামের মূর্তি এর—

"আধ শিরে শোভে চাঁচর চিকুর আধ শিরে শোভে বেণী।"

আধুনিক কবির ভাষায়:

"ভাবের হাওয়া যখন বহে প্রাণে
তখন ভেসে যাই যে অকূল পানে।

স্বরের পালে কথার তরী
আপন ভোলে মরি মরি !
মনমাঝি মোর বিরাম নাহি জানে।

তখন যেন আমায় ডাকে শুনি :
কোন্ সাগরের গোপন পারের গুণী।
সেই সুদূরের বঁধুর লাগি'
হৃদয় আমার হয় বিবাগী,
কণ্ঠ আমার ছায় যে গানে গানে।"

১৯

বাংলা গানের ক্রম

বাংলা গান যে রূঢ়িক পদার্থ নয়, সে যে একটা যৌগিক উদ্ভব এই সত্যটিকে "শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে"—তেম্নি ভাবে নানা স্বরে নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণ করারও সার্থকতা আছে—কেন না এই কথাটি উচ্চারিত মন্ত্রের ম'ত কানের ভিতর দিয়ে মরমে না পৌছলে বাংলা গানের প্রাণের-কথাটি অন্তরে আকুতিটিই থেকে যাবে অনাত্মীয়, ফেনিয়ে উঠবে গানে কথা বড় না স্বর বড় এই ধরণের যত সব অবান্তর তর্ক, রসলীলার স্বচ্ছ আলোটি হ'য়ে আসবে আবিল। তাই বাংলা গানের সবরকম ধারার বিচারেই, সবরকম অভিব্যক্তির মূল্যনির্ধারণেই সব আগে এই যুগলমিলনের তত্ত্বটিকে সুরনিকষ হিসেবে স্থাপনা করতে হবে আমাদের মনের মঞ্জুরমহলে।

কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতির পরে—বা সঙ্গে সঙ্গে—আরো অনেক শাখাসঙ্গীত বাংলা গানে ছিল, যথা তর্জা, বারোয়ারি, পাঁচালি, যাত্রা ইত্যাদি। এরা গান হিসেবে অপাংক্তেয়—কেবল যাত্রা-সঙ্গীতে কখনো কখনো এক আধটা স্বরের ফুট্‌কি ফুটে উঠত। তবে সে

নিতান্তই এক আধটা, কেন না জুড়ির অত্যাচারে ও স্থানে অস্থানে অজস্র তানের সিন্ধু-গর্জনে সে-দুচারটি স্বরবিন্দু তুফানে ফস্ফরেসেন্সের মতন একটু ঝিকমিকিয়েই যেত মিলিয়ে।

একমাত্র নিধুবাবুর দাশুরায়ের রাম কথকের ও অন্য দুচারজনের টপ্পায় কিছু খাটি গানের রস ফুটে উঠেছিল। দাশুরায়ের

"ননদিনী বোলো নাগরে
ডুবেছে রাই কমলিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।"

ধরণের দুএকটি কৃষ্ণসঙ্গীতে বা নিধুবাবুর

"ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানি নে।
বিধুমুখে মধুহাসি দেখতে বড় ভালোবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি—দেখা দিতে আসিনে।"

ধরণের দুএকটি প্রেমসঙ্গীতে বা রাম কথকের

"দীনে দেহি দেবি দরশন
আর দিও না দুখ দীন দয়াময়ি
দনুজদলনি দেবি দেব-হৃদয়ধন।"

দুএকটি শ্যামাসঙ্গীতে।

কিন্তু এ-ধরণের গান সংখ্যায় নিতান্তই মুষ্টিমেয়। নিধুবাবুর দুএকটি প্রেমের গান ছাড়া প্রাণের বেদনা মন্থন ক'রে অমৃত প্রায়ই ওঠে নি, উঠেছে পঙ্ক ও অশ্রুবাষ্প—অসহ্য সেন্টিমেণ্টালিটি ও ন্যাকামি—প্রেমের নামে সব দেশে সব যুগেই যে-নাকেকান্না প্রথমটায় বেদনার নৈবেদ্য-মর্যাদা পায়, যে দুর্গতি দেখে শেক্ষপীয়র হেসেছিলেন: "It is true that men have died and worms have eaten them, but not for love."

মরিয়াছে নর ভখিয়াছে কীটচয়:
সত্য—কেবল প্রণয়ের তরে নয়।

গান যখন এইভাবে নানাদিকে আত্মলাভের পথ খুঁজে মরছে—কোথাও বা একটু আলোর আভাষ পাচ্ছে, কোথাও পেতে না পেতে

পথ হারাচ্ছে ঠিক সেই সময়েই এদেশে গ্রামোফোনের অভ্যুদয়। যন্ত্র-মাত্রেরই দোষত্রুটির অবধি নেই, কিন্তু তবু সব দেশেই আজ যন্ত্র ললিত শিল্পের সহযোগে এসেছে, ক্রমশ যে আরো আসবেই এ-বিষয়ে এমন কি সংশয় পোষণ করারো পথ নেই। বর্তমান সভ্যতা ক্রমেই এমন বিপুলপ্রস্থ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে তার মনোরঞ্জনের খোরাকির জন্যে পাইকিরি ব্যবস্থা না করলে আর চলে না। কাজেই খুচরো গুণিবৃন্দও গ্রামোফোনের প্রেসে একই গানের অজস্র সংস্করণ মার্ফৎ বহুর কাছে হাজিরি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। রেডিয়োর বেলায়ও ঐ কথা।

এর মধ্যে একটা বেদনা যে নেই তা নয়। শিল্পের জীবন্ত মূর্তিকে প্রস্তরীভূত—mechanized—দেখার একটা দুঃখ আছেই। তাই প্রথমটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গ্রামোফোন ও রেডিয়োর যান্ত্রিক ঝড়ে গানের নৌকাডুবি হ'ল ব'লে। কিন্তু ঐ সঙ্গে একথা অস্বীকার করারো উপায় নেই যে ডিমক্রাসি যদি চাইতে হয় তবে মাঝপথে থামলে চলবে না —যন্ত্রকেও গ্রহণ করতে হবে যথাসম্ভব তার দোষত্রুটির সংশোধন করতে করতে। ভালো সঙ্গীত এক সময়ে ছিল শুধু আভিজাত্যের আজ্ঞাবহ। ঘরে ঘরে—বিশেষ, দরিদ্রের ঘরে—বড় ওস্তাদের গান-বাজনা ছিল অভাবনীয়। এ-অভাব পূরণ করতে পারে এক গ্রামোফোন রেডিও। এদের গুণাগুণ-বিচারের স্থান এ নয়—এ-বিষয়ে আমি অন্যত্র বিশদভাবে লিখেছি * —এখানে শুধু বলতে চাই যে, সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দানে সবাইয়েরই অধিকার সমান এ-প্রতিজ্ঞাটি মেনে নিলে সে-দানের মর্মজ্ঞ হবার শিক্ষাসুযোগও সবাইয়ের সমান থাকা উচিত এ-সিদ্ধান্তটিও মেনে নিতেই হবে। গ্রামোফোন রেডিও এই সুযোগ অনেকখানি সার্বজনীন এমন কি বিশ্বভৌম করেছে একথা অপ্রতিবাদ্য। সুতরাং ডিমক্রাসির সভ্যতা বাঞ্ছনীয় এ-অঙ্গীকার করলে রেডিও গ্রামোফোনকেও সভ্য মানুষের অপরিহার্য সরঞ্জাম ব'লে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

আমার নিজের দিক দিয়ে এ-বিষয়ে আর সংশয় নেই (যদিও অনেক-

* "উদ্বোধন" মাঘ, ১৩৪৪

দিন ছিল) যে গ্রামোফোন-রেডিয়োর দোষত্রুটি আছে ব'লে ওদের বর্জন করা শুধু যে অসম্ভব তাই নয়—যন্ত্রের অত্যাচার থেকে মুক্তি মিলবে না যন্ত্র-উচ্ছেদের পথে, যেহেতু গানে গ্রামোফোন রেডিয়োর ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা আছেই আছে। তাই ওদের দোষত্রুটি শোধন করতে করতে উভয়ের নির্মাণকৌশলের উন্নতিসাধন করতে করতে ওদেরকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। যন্ত্রে বাজে গানই বেশি গাওয়া হয় এ-অভিযোগ এ-তর্কে বাহ্য—কারণ এজন্যে অপরাধ মূলত যন্ত্রের নয়—শ্রোতার। তাই শ্রোতৃবৃন্দের চাহিদা ও রুচির প্রগতি হ'লে ওরা গানের পরিবেষণে মস্ত সহায়ই হবে, এমন কি লোকমত গঠনের জন্যে উঠে প'ড়ে লাগলে অদূর ভবিষ্যতে ওরা জনসাধারণের রুচি ও মতিগতিকেও দ্রুতবেগে উন্নতির পথে ঠেলে দিতে পারবে, কেন না তাদেরকে ভালো গান শোনবার ব্যাপক সুযোগ দেবার শক্তি ওদের অপর্যাপ্ত। যারই ভবিষ্যৎবিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে—তার শুধু বর্তমান গ্লানি ও অসম্পূর্ণতাকেই একান্ত ক'রে দেখলে সত্যকে বিস্তীর্ণ পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখা হয় না। তাই রেডিও-গ্রামোফোনের এখনকার বহু দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাদের নিরাকরণ খুবই সম্ভব একথা মনে ক'রে যথেষ্ট ভরসা পাবার পথ রয়েছে।

গ্রামোফোন অভ্যুদয়ের সেই যুগের কীর্তিকলাপ স্মরণ করলে একথা যেন আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করা যায়। সে সময়ে সঙ্গীতে কী সাড়াই পড়েছিল, এ-যন্ত্রের মাধ্যমে কত ভালো গায়ক গায়িকার গান শোনারই সুযোগ পেয়েছিলাম—আজও পাচ্ছি—যাদের নামও হয়ত শুনতে পেতাম না গ্রামোফোন এদেশে না এলে! কিন্তু এবার বাংলা গানের ক্রমবিকাশের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি।

বাংলা গানের প্রগতিতে স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের নাম সাদরে স্মরণীয়। তাঁর গানে ত্রুটি ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু তিনি বাংলা গানকে একটা নাড়া দিয়ে যান একথাও প্রতি বাংলাগানরসিকের কৃতজ্ঞচিত্তে মানা চাই। তাঁর কণ্ঠকৃতিত্বের গুণে ও

প্রাণের ওজঃশক্তির প্রসাদে বড়াল মহাশয় বাংলা গানে তান ও স্বর-বিহারের এক নব আভাষ দিয়ে যান। তাঁর অনেক স্বরতানপরীক্ষা (experimentation) ব্যর্থকাম হ'য়েও আপ্তকাম হয়েছে এই জন্যে যে, তাঁর ভুল ভ্রান্তি থেকেও বাংলা তানপন্থীদের বহু শিক্ষালাভ হয়েছে। তাই শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অকৃতকার্যতার গজকাঠি দিয়েই তাঁর গানের সিদ্ধিকে মাপতে গেলে চলবে না। কারণ একথা ভুললে চলবে না যে, তিনি বাংলা গানে এক ধরণের জীবনীশক্তি আনেন যার মধ্যে সুষমাবোধের অভাব সময়ে সময়ে সংস্কৃত রুচিকে আঘাত করলেও—সে শক্তির ও কৃতিত্বের মূলে সাধনা ও প্রতিভা দুই-ই ছিল। গ্রামোফোনের ফলে এ-শক্তি সহজেই ব্যাপক হয়েছিল একথাও সানন্দে স্বীকার্য। আরো স্মরণীয়, যে, তাঁর অভ্যুদয়ের পূর্বে উন্নাসিক ওস্তাদপন্থীদের অবজ্ঞায় বাংলা গান মনমরা হয়ে ছিল। বড়াল মহাশয় তাঁর মনোহর ওজস্বী কণ্ঠ ও অনন্যসাধারণ তানকৃতিত্বের বৈদ্যুতিক প্রবাহে সে-ওস্তাদি অবজ্ঞাকেই খানিকটা অবজ্ঞেয় ক'রে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-ও কম কথা নয়। তাছাড়া হিন্দুস্থানি স্বরবিহারের অনেক পূর্বাভাষও তিনি বাংলা গানে ফুটিয়ে তুলেছিলেন—যদিও এদিকে তাঁর চেয়ে বড় শিল্পী আরো ছিল। কিন্তু সে যাই হোক, গ্রামোফোনের মধ্যবর্তিতায় তিনি বাংলা গানরসিকদের ঘরে ঘরে বাংলা তানের আনন্দ সরবরাহ করেছিলেন এ আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি। বিশেষ ক'রে তাঁর "এ কী রূপ হেরি হরি" বাগেশ্রীতে তিনি মন্দ্রসপ্তকের যে উদাত্ত কল্লোল আনেন খাদের পর্দায় সে-রকম গাম্ভীর্য এক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছাড়া আর কেউ সে-সময়ে আনেন নি বাংলা গানে। (আজকের দিনেও বাংলা গানের একটা মস্ত অসম্পূর্ণতা এইখানে : উদারায় স্বরস্থিতি খুব কম কণ্ঠেই ফুটে ওঠে।)

ঐ গ্রামোফোনেই আর একজন বড় গায়ক ৺ধ্রুপদী অঘোর চক্রবর্তী, একটি বাংলা গানে (বিফল জনম বিফল জীবন) ও একটি পদাবলির খাম্বাজে (গোবিন্দ মুখারবিন্দ) বড় সুললিত—যদিও মামুলি—দানাদার টপ্পার তান দেন। সে সময়ে তাঁর আরো একটি হিন্দি ভজন গানে

(আনন্দ বন গিরিজা) তিনি ঐ একই খাম্বাজের তানে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অঘোর বাবু আসলে ছিলেন ধ্রুপদী, তাই সুরবিহার তানলীলা প্রভৃতির যথেষ্ট চর্চা করবার সময় পান নি। ফলে তাঁর অমন সুকণ্ঠেও বাংলা গান স্ফূর্তি পায় নি, কাব্যসঙ্গীতে তাঁর দান পায় নি কোনো শিরোপা।

অঘোর বাবুর পরে বাংলা গানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রসসৃষ্টি করেন ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও ৺ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। এঁদের দুজনের কথা এবার বলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

রাধিকাবাবু সারা বাংলায় গোঁসাইজি ব'লেই বিশ্রুত। বিংশ শতকে বাংলায় এত নামডাক আর কোনো ধ্রুপদীর হয় নি একথা বোধকরি নির্ভয়েই বলা যায়। মিশ্রদের ঘরানা ধ্রুপদ, মুসলমানি ধ্রুপদ, খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ, গৌরহারবাণীর ধ্রুপদ, বিষ্ণুপুরি ধ্রুপদ আরো কতরকম ধ্রুপদের পুঁজিই যে তাঁর ছিল। তাঁর শেষ বয়সে তাঁর চরণতলে ধ্রুপদ শিখতে গিয়ে আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না তাঁর সংগ্রহ, স্মৃতিশক্তি ও ধ্রুপদী স্থাপত্যকারু দেখে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বিশেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর কাছ থেকে বহু অপ্রচলিত রাগের ধ্রুপদ তুলে নেওয়ার। দুর্ভাগ্যবশত সে-শুভ যোগাযোগ হ'য়ে ওঠে নি লক্ষ্ণৌয়ে আমি এঁদের দুজনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সত্বেও। পণ্ডিতজি আমাকে বলতেন যে ধ্রুপদে এমনতর বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য তিনি খুব কমই দেখেছেন সারা ভারতে। কিন্তু গোঁসাইজির ধ্রুপদী ব্যুৎপত্তির কথা এ-অধ্যায়ে অবান্তর ব'লে বাংলা গানের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি।

গোঁসাইজির স্বভাবগত মাধুর্য ছিল অবর্ণনীয়। তাঁর বাংলা গানেও এ মাধুর্য বিকীর্ণ হ'ত। এমন নির্বিবাদী সরল উদার শান্ত ধ্রুপদী ওস্তাদ-জগতে অতি বিরল। তাঁকে দেখে সে-সময়ে সত্যিই বিস্ময় জাগত ভাবতে : তবে ভয়ঙ্কর ওস্তাদ হ'য়েও মানুষ অপ্রলয়ঙ্কর ভাবে কথা কইতে পারে !—এমন কি দেশী সঙ্গীতকে, বাংলা গানকেও, পারে এমন সহজভাবে ভালোবাসতে !! আত্মঘাতী অহঙ্কারে নিজের দেশের পরমসুন্দর শিল্পকে ধিক্কার দেবার প্রশংসনীয় প্রয়াসে অজস্র কূটতর্কের গোলোকধাঁধায়

বেচারি বাংলাগানরসিককে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে না দিয়ে এমন সহজে এমন সরল ভঙ্গিতে ধ্রুপদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গান গাইতে পারে—এমন কি বাংলা ভাষাতেই ধ্রুপদ গাইতে পারে এ-হেন উদার শ্রদ্ধার সঙ্গে !!!

পরে তাঁর শিষ্য হ'য়ে তাঁর স্নেহলাভ ক'রে যখন তাঁর আরো কাছে আসি তখন আরো সহজে বুঝতে পারি—কেমন ক'রে সেই দুর্ধর্ষ ওস্তাদি যুগেও এ-অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। বুঝেছিলাম যে, ভালোবাসাই আনে সরল বুদ্ধি, সহজ বোধ, অনাবিল শ্রদ্ধা: বাংলা গানকে গোঁসাইজি ভালোবেসেছিলেন। তবে সম্ভবত বাংলা গানের প্রতি তাঁর এ-অনুরাগ এতটা গাঢ়বদ্ধ হ'ত না যদি তিনি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে প্রথম থেকেই না আসতেন। কিন্তু নিদানতত্ত্ব ছেড়ে তার বাংলা গানের কথাই বলি।

রবীন্দ্রনাথ গোঁসাইজির সহযোগে দুটি স্মরণীয় কাজ করেন বাংলা গানের চাষ আবাদে: প্রথম বাংলা গানের বীজ বপন করেন ধ্রুপদী সুরের মাটিতে—গোঁসাইজির নানান্ হিন্দি ধ্রুপদ ভেঙ্গে অবিকল সেই সুর-তালের কাঠামোয় বাংলা গানের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন; দ্বিতীয়, নিজের অনেক মৌলিক বাংলা গান এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে তাঁকে দিয়ে সুর-সংযোগ করান। এর ফলে রাগভঙ্গিম বাংলা গানের ফসল যে সে-যুগে বেশ একটু সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলা গানের ক্রমবিকাশের পথে আর একজনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে: তিনি কলকণ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি ছিলেন সৌখিন গায়ক, ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তার উপর রায়বাহাদুর: মানে—ওস্তাদ একেবারেই নন। সুরেন্দ্রনাথের পদতলে রাগসঙ্গীত তথা লীলায়িত বাংলা গানের বর্ণপরিচয় আমার হয়। এরকম কণ্ঠ এযুগে বোধকরি আর শোনা যায় নি: এমন কি ৺আবদুল করিমের কণ্ঠেও এমন জোয়ারি মধুরতা ও স্বরগ্রামবিস্তৃতি (range) খেলত না। খাদের পর্দায় তাঁর গলা যেমন গম্‌গম্ করত—চড়া পর্দায়ও তেম্‌নি সুধাবর্ষণ করত। তিনসপ্তকে তিনি সহজেই চলাফেরা করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু সুরেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ স্বরপ্রতিভা আমাদের আলোচ্য

নয়—বাংলা সঙ্গীতে তিনি কী দিয়ে গেছেন সেইটেই এখানে বিচার্য—সেহেতু শুধু তাঁর বাংলাগানের কথাই বলব আজ।

সুরেন্দ্রনাথ আশৈশব পশ্চিমে মানুষ—কাজেই হিন্দুস্থানি গানের খাস চাল ও মেজাজ ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি ওস্তাদ ছিলেন না—পুঁজির দিক দিয়ে অঘোর বাবু, হরিনারায়ণ বাবু, বা গোঁসাইজির সঙ্গে তাঁর তুলনাই হ'তে পারে না। কিন্তু তাঁর ছিল অনন্যতন্ত্র কল্পনা ও অসামান্য তানের প্রতিভা। বাংলা গানে কথার স্বরবর্ণে তানকে সহজ ক'রে গাঁথায় তাঁর জুড়ি ছিল না সে সময়ে। "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো", "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই", "আমার মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে", "আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো", "কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল" "বিয়োগা বিধুরা রাজবালা" প্রভৃতি গানে তিনি হিন্দুস্থানি টপ্‌খেয়ালের যে-লীলায়িত আনন্দের ঢেউ তুলতেন তাতে রসজ্ঞমাত্রেরই প্রাণ উঠত দুলে। এই ভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাছ থেকে শেখেন—তাঁরা দুজনে ছিলেন বাল্যবন্ধু। কাজেই বাংলা খেয়ালে সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ দান ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ করার পথ নেই। বাংলা গানে তান যে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত হ'য়ে এত মনোহর শোনাতে পারে—সুরেন্দ্রনাথের আগে ভাবতেও পারা যেত না। কথাকে স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে, অবান্তর ও আ নিয়ে হাহাকার বর্জন ক'রে শব্দের স্বরবর্ণের খোলা হাওয়ায় তানের ফুলঝুরি ঝরানোতে তাঁর জুড়ি ছিল না। বাংলা গানে সুরবোনার এ-ইঙ্গিত তিনিই প্রথম দেন। আর এ তিনি পেরেছিলেন কেন না কথার সঙ্গে সুরবয়নের প্রয়োগশিল্পে তাঁর ছিল যেন সহজাত স্বভাবপটুতা।

কিন্তু তিনি বাংলা গানে তান বিকাশের ও সুরবিহারের এক নতুন আভাষ ও সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলেও তাঁর কণ্ঠে বাংলা গানের সুন্দরতম রূপটি অনেক সময়ে ব্যাহত হ'ত এই জন্যে যে তিনি যতটা সুরের দরদী ছিলেন ততটা কাব্যের দরদী ছিলেন না। (একথা গোঁসাইজি ও অঘোর বাবুর সম্বন্ধেও সমান খাটে) কাজেই তাঁর গানে সুর ও কথার সামঞ্জস্যের আভাষই মিলত, বিকাশ খুব বেশি হয় নি—অর্থাৎ

বাংলা গানের যুগলমিলনসঞ্জাত সর্বাঙ্গসুন্দরতার তৃপ্তি মিলত না—যদিচ অগ্রদৌত্যের স্বর্ণরাগচ্ছটা মিলত পদে পদেই। তাই বাংলা গানের বিকাশপথে তাঁর প্রতিভা যে আলো দিয়ে গেছে তাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করতেই হবে প্রতি বাংলাগান-অনুরাগীর।

অথ, দেখা গেল—বাংলা গানের বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের দিকে ঝোঁকেন প্রধানত গোঁসাইজির অধিনায়কতায়, আর দ্বিজেন্দ্রলাল ঝোঁকেন খেয়ালের দিকে প্রধানত সুরেন্দ্রনাথের অধিনায়কতায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা তিন শ্রেণীর গানই রচনা করেছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল প্রবণতাটি ছিল যে ধ্রুপদের দিকে, দ্বিজেন্দ্রলালের খেয়ালের দিকে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁদের দুজনের (অন্য ভালো বাঙালি গানকারদেরও) শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদাঙ্গ ও খেয়ালাঙ্গ বাংলা গানের একটি চয়নিকা প্রকাশিত হওয়া দরকার, কারণ তাহ'লে বাঙালি সুরার্থীরা বুঝতে পারবেন বাংলা গানে রাগভঙ্গিম রসে ঠিক কি ধরণের অভিনব আনন্দ ও সৌরভ বিকীর্ণ হ'তে পারে—বাংলা গানের এ-বৈশিষ্ট্যের আভাষ কোনো ব্যাখ্যানে দেওয়া অসম্ভব। এথেকে আরো একটা মস্ত লাভ হবে এই যে অবজ্ঞায়-বঙ্কিমগ্রীব ওস্তাদিপন্থী বাঙালির মন থেকে একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে যে বাংলায় ভালো ধ্রুপদাঙ্গ বা খেয়ালাঙ্গ গান রচিত হ'তেই পারে না। অবশ্য একথা ঠিক্ যে এসব গানে হুবহু হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীতের রস মিলতেই পারে না—যেহেতু এ-গান কণ্ঠবাদন নয়—এ হ'ল যথার্থ গান—মানে কাব্যসঙ্গীত। কিন্তু অন্যদিকে এসব গানে হিন্দুস্থানি সুরলীলার অব্যাহত বহুবৈচিত্র্যের অভাব যে সংহত কাব্যসৌন্দর্যে যথেষ্ট পূরণ হবে এ-বিষয়েও সন্দেহ করবার অবকাশ নেই—এবং এ-অভাব যে হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ খেয়ালের একটি শোচনীয় অভাব সেটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। জানি একথায় ওস্তাদিপন্থীরা অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠবেন—কেন না তাঁদের মতে হিন্দুস্থানি কণ্ঠবাদনের কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকতেই পারে না। কিন্তু তবু সত্যকে সত্য ব'লে মানতেই হবে—তাঁরা না মানলেও সত্যের প্রতিষ্ঠা ক্রমে সর্বজনস্বীকৃত হবেই হবে। ধীরে ধীরে হচ্ছেও।

কিন্তু এবার এ-প্রসঙ্গের ইতি ক'রে বাংলা গানের বিকাশ বুঝতে রাগভঙ্গিম বাংলা গানের কয়েকটি মাত্র নমুনা দেব শুধু দেখাতে চেয়ে কোন্ দিকে ও কী ধারায় বাংলা গান ধীরে ধীরে চলেছিল তার আত্মপরীক্ষার পথে। কেবল এখানে আগে থেকেই একটা কথা ব'লে রাখি যে, এক্ষেত্রে তথ্যগত একটু আধটু ভুলভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র নয়—বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের রাগভঙ্গিম গানগুলির মধ্যে কোনো কোনোটির রাগ ও তাল বা শ্রেণী-নির্ণয়ে। কিন্তু গুরুতর কোনো ভুল হবার কথা নয়—কারণ রবীন্দ্রনাথের এ-সব গান আমি শ্রীমতী সাহানা দেবীর কাছে শুনে মিলিয়ে নিয়েছি—যিনি রবীন্দ্রনাথের গানের একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। বলাই বেশি, আমি মাত্র কয়েকটি ক'রে গান নিয়েছি রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের। এঁদের সব গানের সুর তালের নির্ঘণ্ট করতে গেলে বিশ ত্রিশ পাতায়ও কুলোবে না। অগত্যা—

রবীন্দ্রনাথের রাগভঙ্গিম বাংলা গান :

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি—	···	ইমন কল্যাণ—তেওরা	(ধ্রুপদ)
বারি ঝরে ঝরঝর ভরাবাদরে	···	ইমন কল্যাণ—তেওরা	(ধ্রুপদ)
আমার মাথা নত ক'রে দাও	···	ইমন কল্যাণ—তেওরা	(ধ্রুপদ)
তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে	···	ইমন কল্যাণ—তেওরা	(ধ্রুপদ)
সীমার মাঝে অসীম তুমি	···	কেদারাছায়ানট—একতালা	(খেয়াল)
মনোমোহন গহন যামিনীশেষে	···	আশাবরী—ঝাঁপতাল	(ধ্রুপদ)
মহারাজ একি সাজে	···	বেহাগ—ঝাঁপতাল	(ধ্রুপদ)
মন্দিরে মম কে	···	আড়ানা—একতালা	(খেয়াল)
ডাকো মোরে আজি এ-নিশীথে	···	পরজ—ত্রিতালী	(ধ্রুপদ)
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে	···	বাহার—ত্রিতালী	(ধ্রুপদ)
আজি বহিছে বসন্ত পবন	···	বাহার—তেওরা	(ধ্রুপদ)
আজি কমলমুকুলদল খুলিল	···	বাহার—ত্রিতালী	(ধ্রুপদ)
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে	···	ভৈরোঁ—চৌতাল	(ধ্রুপদ)

তিমির দুয়ার খোলো … ভৈরোঁ। রামকেলি—ত্রিতালী (ধ্রুপদ)
আছ অন্তরে তবু কেন কাঁদি … কাফি—চৌতাল (ধ্রুপদ)
রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি … খাম্বাজ—ত্রিতালী (খেয়াল)
তিমিরময় নিবিড় নিশা … মেঘমল্লার—ঝাঁপতাল (ধ্রুপদ)
প্রথম আদি তব শক্তি … সোহিনী—সুরফাঁকতাল (ধ্রুপদ)
দাঁড়াও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে … ভীমপলশ্রী—সুরতফাঁকতাল (ধ্রুপদ)
কে বসিলে আজি হৃদাসনে … সিন্ধু—মধ্যমান (টপ্পা)
পিয়াসা হায় হায় নাহি মিটিল … ভৈরবী—মধ্যমান (টপ্পা)
আমি তোমার প্রেমে হব
সবার কলঙ্কভাগী … ভৈরবী—একতালা (খেয়াল)
অমল ধবল পালে লেগেছে … ভৈরবী—একতালা (খেয়াল)

দ্বিজেন্দ্রলালের কতিপয় রাগভঙ্গিম গান :

আইল ঋতুরাজ সজনি … সিন্ধুড়া—চৌতাল (ধ্রুপদ)
আজি গাও মহাগীত … খাম্বাজ—চৌতাল (ধ্রুপদ)
আজি গো তোমার
চরণে জননি … ইমনকল্যাণ—একতালা (খেয়াল)
আজি তোমারি কাছে
ভাসিয়া যায় … ঝিঁঝিট—মধ্যমান (টপ্‌খেয়াল)
আজি নূতন রতনে … ভৈরবী—ত্রিতালী (খেয়াল)
আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে … ভৈরবী—মধ্যমান (টপ্‌খেয়াল)
আনন্দময়ী বসুন্ধরা … ভৈরবী—ত্রিতালী (খেয়াল)
আমরা এম্‌নিই এসে
ভেসে যাই … ঝিঁঝিট—একতালা (খেয়াল)
আমার আমার ব'লে ডাকি … ভৈরবী—একতালা (খেয়াল)

আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্যগগনে	···	ইমনকল্যাণ—একতালা	(খেয়াল)
আম রব চিরদিন তব পথ চাহি'	··	ঝিঁঝিটখাম্বাজ—যৎ	(টপ্পা)
আমি সারা সকালটি ব'সে ব'সে	···	ভূপকল্যাণ—একতালা	(খেয়াল)
প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে	··	জয়জয়ন্তী—চৌতাল	(ধ্রুপদ)
কী দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি	···	ভৈরবী আশাবরী—চৌতাল	(ধ্রুপদ)
একই ঠাঁই চলেছি ভাই	···	ভৈরবী—ঝাঁপতাল	(খেয়াল)
আর একবার ভালোবাসো	···	যোগিয়া—ত্রিতালী	(খেয়াল)
এ জগতে আমি বড়ই একা	···	ভীমপলশ্রী—যৎ	(খেয়াল)
এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি'	···	ভৈরবী—যৎ	(খেয়াল)
এসো প্রাণসখা এসো প্রাণে	···	বাহার—ত্রিতালী	(খেয়াল)
ঐ প্রণয় উচ্ছ্বাসী মধুর সম্ভাষি'	···	ভৈরেঁা—একতালা	(খেয়াল)
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে	···	ভৈরবী—ত্রিতালী	(ধ্রুপদ)
বরষা আইল ঐ	···	কেদারামল্লার—ত্রিতালী	(খেয়াল)
হৃদয় আমার গোপন ক'রে	···	ছায়ানট—একতালা	(খেয়াল)
যাও হে সুখ পাও	···	ইমনকল্যাণ—তেওরা	(খেয়াল)
সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই	···	বাগেশ্রী—আড়াঠেকা	(খেয়াল)
তোমারেই ভালোবেসেছি আমি	···	দরবারী কানাড়া—আড়াঠেকা	(খেয়াল)
মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে	···	নটমল্লার—যৎ	(টপ্‌খেয়াল)

রাগভঙ্গিম গানের বিকাশে না হ'লেও ঠুংরিকে মার্গসঙ্গীত ব'লেই যখন চিহ্নিত করা হ'ল তখন রাগের অভিব্যক্তিতে অতুলপ্রসাদের ঠুংরি-

ভঙ্গিম বাংলা গান সম্বন্ধে কিছু এখানে ব'লে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাঁর এ-ভঙ্গির কথা। আজকের দিনে তাঁর গান সম্পর্কে সেই জানাকথারি পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক—কেননা একথা আজ সবাই মেনে নিয়েছেন যে বাংলা গানে শ্রেষ্ঠ ঠুংরি চালের প্রবর্তনা প্রথম অতুলপ্রসাদই করেন। আজ অতুলপ্রসাদের গানের তরফে আমি বলতে চাই আর একটি কথা। কেন না সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি যে, অতুলপ্রসাদের গানকে কোনো কোনো বিশুদ্ধ কাব্যরসিক একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন এই যুক্তিতে যে, তাঁর গানের কাব্যসম্পদ প্রথম শ্রেণীর ছিল না। এঁদের মতে, অতুলপ্রসাদের গানের সম্বন্ধে আমাদের প্রশস্তি ভ্রান্ত। ভ্রান্ত নয় কেন, বলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

অতুলপ্রসাদের কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারের সময় এখনো আসে নি—দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণিকা এখনো ফোটে নি ব'লে। তাই এখানে আমি তাঁর কাব্যের বিচার করতে আদৌ উৎসুক নই। আজ আমি শুধু নিবেদন করতে চাই যে যে-সব কাব্যরসিক গানকে নিছক কাব্যের দিক থেকে বিচার করেন তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে—শুধু গানরসিকদের এই মূল উপলব্ধিটি না থাকার দরুণ যে, কোনো দেশেই গান নির্ভেজাল কাব্য নয়। সব দেশেই ভালো গান ভালো সুরে গ্রথিত হ'য়ে দাম্পত্যমিলনে তবে বরণীয় হ'য়ে ওঠে। ব্রাহ্‌ম্‌স্‌, শূবার্ট, শূমান্‌, বীটোভন্‌, শোপ্যাঁ, চাইকভস্কি, স্কার্লাত্তি, হেন্দেল প্রভৃতি সুরকারদের নানা গান আজও ওদেশে ঘরে ঘরে গীত হয়: তাদের শব্দসুষমা কাব্যসৌন্দর্য নেই একথা বলি না—কিন্তু এদের মধ্যেও অনেক বিশ্ববিশ্রুত গানই নিছক কাব্য-হিসেবে যে প্রথম শ্রেণীর কাব্য নয় সেকথা সবাই জানেন। একথা সত্য যে গানের পরমতম বিকাশে তাকে হ'তেই হবে কাব্যেও প্রথম শ্রেণীর—সুরেও। কিন্তু এ-হেন সবদিকদিয়ে-নিখুঁৎ তিলোত্তমা গীতি সব দেশেই খুব কম। তাই বলছিলাম যে অতুলপ্রসাদের গানের গুণমূল্য নির্ধারণ করার সময়ে তার কাব্যকে সুর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে চলবে না। অবশ্য অসুন্দর বা শ্রীহীন শব্দ বা কবিত্বের দৈন্য থাকলে নিশ্চয়ই তা

আক্ষেপজনক—কিন্তু তাঁর অনেক গানে সুর ও কবিত্ব উভয়ে মিলে তবেই সৃষ্টি রমণীয় হয়েছে একথা ভুললেও চলবে না। অতুলপ্রসাদের গানের একটা অবিসংবাদিত সম্পদ এই যে তাতে গানের গানভঙ্গি অত্যন্ত সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্তি—spontaneity—শ্রেষ্ঠ শিল্পের একটি নিত্য আনুষঙ্গিক, মস্ত ঐশ্বর্য। অবশ্য অতুলপ্রসাদের সব গানেই যে এ অকৃত্রিমতা ঝলমল করছে তা বলি না—কিন্তু ওরা বলে: the greatness of a man is the greatness of his greatest moments—কাব্য গান সম্বন্ধেও সেই কথা। অতুলপ্রসাদের গানের বিচারের সময় তাঁর শ্রেষ্ঠ গানগুলি দিয়েই তাঁর গীতিপ্রতিভার বিচার হবে—এ-গানের সংখ্যা কম হ'লেও তাতে ক'রে তাঁর গীতিপ্রতিভা নামঞ্জুর হয় না। কাব্যজগতেও অনেক কবি আছেন যাঁদের রচনা সংখ্যায় অপর্যাপ্ত নয়—তবু তাঁরা বড় কবির মর্যাদা পেয়েছেন সৃষ্ট কাব্যের রসোৎকর্ষে, যেমন কীট্‌স্, টম্‌সন, কোলরিজ, মালার্মে, নোভালিস, এ-ই। অতুলপ্রসাদের গান সম্বন্ধে একথা আরো বেশি খাটে, কেন না, বলেছি, গানের বিচার শুধু কাব্যের বিচার নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ ঠুংরিভঙ্গিম গানে হৃদয়াবেগের সরল সুষমা বাক্‌সংযমে সৌকুমার্যে সুরের বিশিষ্ট মনোহারিত্বে সর্বোপরি এক সহজ আনন্দ ও বেদনার আবেদনে অপরূপ লক্ষ্মীশ্রীতে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে, যে-সুষমা, যে-শ্রীকে বলতেই হয় খাঁটি—authentic. যাঁরা একপেশো ভাবে তাঁর কাব্যকে তাঁর সুরের পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তবে তাঁর গানের মূল্য কষতে চান তাঁদের নিকষই যে আগে-থেকে বাতিল হ'য়ে গেল, যেহেতু গানের বিচার করতে হ'লে গানরসের বিশিষ্ট রসিক হ'তে হবে সব আগে। অতুলপ্রসাদের অনেক গান বাদ দিলেও শ্রেষ্ঠ গান হিসেবে অনেকগুলি যে ভাবীকালে বীণাপাণির প্রসাদ পাবে একথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। এখানে তাঁর মাত্র কয়েকটি গানের তালিকা দিলাম যদিও স্থানাভাববশত এ-নির্বাচনে অসম্পূর্ণতা থাকতে বাধ্য:

কি আর চাহিব বলো ✓ ... ভৈরবী—যৎ (টপ্‌খেয়াল)
আর কতকাল থাকব ব'সে ✓ ... কীর্তনাঙ্গ—জপতাল

আমারে এ আঁধারে	...	বাউল—একতালা
ওগো সাথী	...	কীর্তনাঙ্গ—ঝপতাল
প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি	...	মিশ্র দেশ—একতালা (টপ্ ঠুংরি)
মিছে তুই ভাবিস মন	...	বাউল—দাদরা
ওগো নিঠুর দরদী	...	মিশ্র আশাবরী-দাদরা (টপ্ ঠুংরি)
যাব না যাব না যাব না ঘরে	...	ঠুংরি
মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে	...	ঠুংরি
বঁধু ধরো ধরো মালা	...	ঠুংরি
কত গান তো হ'ল গাওয়া	...	গজল
সে ডাকে আমারে	...	ভৈরবী-ঝাঁপতাল (খেয়াল)
আয় আয় আমার সাথে	...	ঠুংরি
চাঁদিনি রাতে	...	ঠুংরি
পাগ্‌লা মনটারে তুই বাঁধ্	...	ভৈরবী—একতালা (টপ্‌খেয়াল)
জল বলে চল্ মোর সাথে চল্	...	ঠুংরি
আমারে ভেঙে ভেঙে	...	ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা (টপ্পা)
থাকিস নে ব'সে তোরা	...	মিশ্র খাম্বাজ—একতালা (টপ্‌ঠুংরি)
আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়		কীর্তনাঙ্গ—দুঠোকা
এ মধুর রাতে	...	ঠুংরি
সবারে বাসরে ভালো	...	ভৈরবী—দাদরা (টপ্‌ঠুংরি)
কে গো তুমি বিরহিণী	...	মিশ্র আশাবরী—তেওরা (টপ্‌ঠুংরী)
রুমক ঝুমক রুম ঝুম	...	ঠুংরি
বাদল রুম ঝুম বোলে	...	ঠুংরি
তাহারে ভুলিবে বলো কেমনে	...	ভৈরবী—যৎ (টপ্ ঠুংরি)
শ্রাবণ ঝুলাতে		পিলু—দাদরা (টপ্ ঠুংরি)
আমার বাগানে এত ফুল		ঠুংরি
জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী		ঠুংরি
মধুকালে এলো হোলি	...	ঠুংরি

এর পরে কাজি নজরুল ইসলামের সঙ্গীতের উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে লেখার সময় এখনো আসে নি—সাময়িক রুচির চঞ্চলতার জোয়ারভাঁটা এখনো বড় বেশি প্রকট—গোলমাল একটু থিতিয়ে যেতে দেওয়া দরকার। আরো দশ পনের বৎসর বাদে তবে তাঁর গানের গুণমূল্য নির্ধারণ করা যাবে নিরপেক্ষ অনাসক্ত মনে, বিশেষ ক'রে হিন্দুমুসলমান-কলহের শোচনীয় সাম্প্রদায়িক আঁধি একটু স'রে যাওয়ার পরে। কারণ শিল্পীর বিচারে গুণীর বিচারে সব আগে ভোলা চাই তার ধর্মবিশ্বাস। আবদুল করিম মুসলমান ছিলেন না হিন্দু ছিলেন না আফ্রিকার নিগ্রো ছিলেন একথা তাঁর গানের রসভোগের সময় যদি একবারও স্মরণ হয় তো মহতী বিনষ্টিঃ।

কাজি সাহেবের পরে আরো অনেক গানকার দেখা দিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধেও কোনো রায় দেবার সময় এখনো আসে নি। কেবল একটা কথা এ-সম্পর্কে একটু গৌরব ক'রেই বলা যায়: যে, বাংলা গানের গড়ন আগের চেয়ে ঢের বেশি কাব্যময় হ'য়ে এসেছে, অর্থাৎ গড়পড়তা গানেও যাকে বলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড আগের চেয়ে উঁচুতে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে স্বরবিহার কণ্ঠকৃতিত্বেও নানা স্থলেই অভাবনীয় রং বাহারের দীপ্তি ঝিলিক দেয় থেকে থেকে। একথা সবচেয়ে বেশি মনে হয় কুমার শচীন্দ্র দেব বর্মনের কলকণ্ঠে কোনো কোনো বাংলা গান শুনতে শুনতে। সম্প্রতি একদিন সুকবি অজয়কুমারের "সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে" ব'লে একটি সুন্দর গান শচীন্দ্র দেবের মুখে শুনতে শুনতে যখন মুগ্ধ হই তখন আধুনিক বাংলা গানের মধ্যে একটা নব স্পন্দন নব আকুতি যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। বর্ণনা ক'রে এ-স্পন্দনের আভাষ দেওয়া অতি কঠিন কাজ—কারণ এ-আলো ভবিষ্যতের অগ্রদূত, যার শুধু পূর্বচ্ছটাই আমাদের গোচর হয়েছে—অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণে আকাশ রাঙিয়ে ওঠার মতন। তবু এ-অনুভূতি ছিল অম্‌নিই প্রত্যক্ষ, মনে হয়েছিল যে এ উদয় হবেই হবে ও তার সঙ্গে এক নবীন স্বর্ণদ্যুতি—নব সুষমায় বাংলা গানের ধ্যানাকাশে এল ব'লে।

বলেছি এ-উপলব্ধির বর্ণনা করা কঠিন কাজ। কিন্তু তবু বলতে

চেষ্টা করতে হবে আজ কী সে উদয়ের ভরসা আশ্বাস, কী তার বাণী স্বপ্ন, কোথায় তার সার্থকতা পূর্ণতা। কারণ এ-চিত্রণের অন্তত কিছু আভাষ না দিলে এ-ব্যাখ্যান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই সাধ্যমত প্রয়াস পাব গুছিয়ে বলতে বাংলা গান ওরফে দেশীসঙ্গীত রাগভঙ্গিকে শ্রেণীবিভাগকে অস্বীকার ক'রে কোন্ পথে চলেছে—কেমন ক'রে সে অনিবার্য ভাবে "গান" হ'য়ে ফুটতে চাইছে এক নব সুষমার জাতিহীন বর্ণহীন শ্রীক্ষেত্রে—যেখানে অতীতের বাধা আড়াল মেঘ সব স'রে গিয়ে স্থান ছেড়ে দিতে চাইছে এক নব আনন্দসমৃদ্ধির হিরণ্যগর্ভকে।

তবে এ-আভাষ দেবার পথে গানের দু একটি আত্মজিজ্ঞাসার কথা সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে: নইলে ভুলবোঝার ভয় থাকবেই কি না।

২০

গান—নানা পথে

গানের আত্মজিজ্ঞাসা! তাছাড়া কী? সব শিল্পই চায় নিজেকে চিনতে: নানা পথে নানা পরীক্ষার মুকুরে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে চায় নিজের নিত্য নব রূপে পূর্ণতুষ্টি: পায় না—ছোটে ফের নতুন পথে। এই যে অন্বেষণ, অনেক সময়ে খুঁজতে খুঁজতে চোরাগলির দেয়ালে মাথা ঠুকে গিয়ে এই যে ব্যথা পেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা, নানান্ অভিজ্ঞতার দৃশ্যত ব্যর্থতার এই যে মনঃক্ষোভ:—এ সবেরও প্রয়োজন আছেই আছে। "ঠেকে-শেখা" কথাটা শিল্পের ক্ষেত্রেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য: যে-শিক্ষা রক্তের মূল্য দিয়ে কেনা যায় সে-ই তো হয় মজ্জাগত। বাইরে থেকে দেখতে যাকে মনে হয় ব্যর্থ, অনেক সময়ে সে-ই তো আনে পরম সার্থকতার ইঙ্গিত।

গানের বেলায়ও এম্‌নিই ঘটেছে—মার্গসঙ্গীতে, দেশীসঙ্গীতেও। মার্গসঙ্গীতে আমরা দেখেছি, ধ্রুপদ চেয়েছে গম্ভীর স্থাপত্যকারু, খেয়াল

চেয়েছে বিচিত্র স্বরলীলা, টপ্পা চেয়েছে অব্যাহত ঢেউভঙ্গি, ঠুংরি চেয়েছে উচ্ছলিত প্রাণশক্তির নির্দেশপথে নৃত্যলীলা : এ-লীলার সার্থকতার জন্যে শ্রেণীবিভাগের শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের গণ্ডি লঙ্ঘন ক'রে রঙে, সুরে, তালে, নানামুখী আবেগের আলোছায়ায় ভাবীকালকে বরণ করতে গিয়ে অতীতকে বিদায় দিতেও তার বাধে নি।

বিকাশের তাগিদ যখন সত্য হয় তখন পরীক্ষা এম্‌নি বহুমুখীই হয়। আর বহুমুখী হয় ব'লেই অনেক সময়েই তার বাণীর খেই যায় হারিয়ে : এক একটা সাঙ্গীতিক আন্দোলন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ম'তই জনচিত্তকে ঠেলা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফেরে—বাইরে থেকে মনে হয় বুঝি তার প্রাণশক্তির পাথেয় ফুরিয়ে এল ব'লেই ফিরল। কিন্তু পাথেয় তখনো ফুরিয়ে যায় নি তো। কোনো সত্যসুন্দরের দীপ্তিই এভাবে ফুরিয়ে যায় না—নব রূপের ছদ্মবেশে নব বিকাশে আত্মলাভ খোঁজে মাত্র—জন্মান্তরকামী আত্মার ম'তই। তাই প্রতি মহৎ শিল্পের আগুটান পিছু হটতে না হটতে অলক্ষিতে নব রূপরেখায় ধ্বনিতরঙ্গে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে যুগে যুগে দেশে দেশে। তাই ধ্রুপদের শান্তিমিড় এল খেয়ালে, খেয়ালের গতিবেগ এল টপ্পায়, টপ্পার সুখনৃত্য এল ঠুংরিতে। বাইরে থেকে দেখতে মনে হয় বুঝি ধ্রুপদ জন্মাল বাড়ল মরল—এ না হ'য়েই উপায় ছিল না ব'লে। তাই অনেকে বলতেন এযুগে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সুরে সুর মিলিয়ে যে, ধ্রুপদ একেবারে ম'রে যদি না-ও গিয়ে থাকে, তাহ'লেও মরণাপন্ন সন্দেহ নেই।

কিন্তু শিল্পের তাজ্জব ব্যাপার এই যে তার লীলাক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন না থাকলেও পুনর্জন্ম আছেই। যে-ধ্রুপদ অস্ত গেছে সে গেছে চির-দিনের জন্যেই বটে, কিন্তু খেয়ালে তার শান্তিপ্রবাহের ছোঁওয়া রেখে তবে। খেয়ালও এই ভাবে ঠুংরিতে টপ্পায় তার গতিবেগের রস চারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রোজই। ঠুংরি আসছে গজলে নব নব রূপের ভূমিকায় : প্রাণধারা এম্‌নি ক'রেই তো তার জের টেনে চলে।

ধ্রুপদের বেলায় আরো এক অভাবনীয় পুনর্জন্ম ঘটল, কিন্তু এবার মার্গসঙ্গীতে নয়—দেশীসঙ্গীতে : যাকে আমরা মনে করতাম ওস্তাদিকণ্ঠের

জাদুঘরে কেনোমৎপ্রকারে জীইয়ে রাখা হয়েছে, সে-ই জন্ম নিল কি না শেষটায় বাংলা গানে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিতে! কী ক'রে নিল —বলি যতটা পারি বিশদ ক'রে—যদিও সুরের হাওয়াকে কথার টিপ্পনিতে ব্যাখ্যা করা এক কম দায় নয়।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে গানে কম্পোজিশন বলতে য়ুরোপে ওরা যা বোঝে—কিনা রূপের দানাবাঁধা (crystallisation)—সেটা খেয়াল টপ্পা ঠুংরির তেমন নেই, ছিল এক ধ্রুপদেরই। থাকার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। ধ্রুপদের কাঠামোর মধ্যেই ছিল একটা আঁটসাট গড়ন এ আমরা দেখেছি। কাব্যের পরিভাষায় এ-গড়নের মানে কী? না, রূপের অনিবার্যতা—inevitability খেয়াল টপ্পা ঠুংরি এঁকে বেঁকে চলল এই ধ্রুপদী অনিবার্যতাকে পাশ কাটিয়ে, কেন না অনিবার্যতারও যাচাই সে-সময়ে দরকার হ'য়ে পড়েছিল। গেটের একটি কথা খুব সত্য যে, "Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiszt nichts von seiner eigenen: অর্থাৎ, কোনো বিদেশী ভাষাই যে জানে না সে নিজের ভাষারও মর্মজ্ঞ হ'তে শেখে নি। বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়েই সাম্যের ঐক্যের যাচাই। আত্মবিরোধের ঝড়তুফানের মধ্যে দিয়েই ফোটে অচঞ্চল সুষমার চিরঞ্জীবী দীপদিশা। তাই ধ্রুপদী পিতামহের খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরি-বর্গীয় পুত্র পৌত্রীরা মূল সুরের ছবিতে রং রেখার যে-সব ঢেউ তুলেছিল তাদের দামও ছিল—সার্থকতাও। ওদের আত্মপ্রকাশে যে-স্বাধীনতা ওরা চেয়েছিল সে-স্বৈরাচারের এক্তিয়ারও তাই ওদের মঞ্জুর। ধ্রুপদী মসনদের শোভা, সংযম, গাম্ভীর্য, স্থাপত্যকারু, নিটোলতা ওরা খুইয়েছিল বটে, কিন্তু ক্ষতিপূরণে এনেছিল সুরের গতিশক্তি, লাবণ্যলীলা, নানান্ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, সুকুমার রঙ্গরাগ, প্রেমাবেগ, আদর, ঔদার্য, সর্বোপরি—সার্বভৌম মিশ্রণশীলতা।

কিন্তু হ'লে হবে কি, ধ্রুপদের ঐ নিটোল সুসম্বদ্ধতার বাণী তো মিথ্যা ছিল না। কাজেই খেয়াল টপ্পা ঠুংরির আত্মপরীক্ষার জন্যে ওদের বাণীকে মেনে নিয়েও বলা চলে যে ধ্রুপদের দেয় যে-তৃপ্তি সে-তৃপ্তি এদের

মধ্যে মিলছিল না। মিলবার কথাও নয় মানি—কিন্তু তবু একটা সত্য তৃপ্তিকে যেমন আমাদের মন বিদায় দিয়েও দিতে চায় না—তেম্‌নি সে-ও বিদায় নিয়েও নিতে চায় না। তাই তার দিন ফুরিয়ে এলে সে নবজন্ম নেয় নবীন কোনো রূপকল্পের মধ্যে।

ধ্রুপদ এই নবজন্ম চাইল প্রথম কাব্যসঙ্গীতে—বলেছি এইমাত্র। এখানে তার একটা মস্ত লাভ হ'ল : সে আবিষ্কার করল যে মার্গসঙ্গীতের ধ্রুপদী রস কাব্যসঙ্গীতে হুবহু ধরা দিল না বটে—কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ মিলল বাংলা গানের কাব্যসম্পদে। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাবগৌরবেরও ছোঁয়াচ লেগে এ-ধ্রুপদে এক নব দ্যুতি উঠল জেগে, যেমন—দর্শনের ভাষায়—বর্ণহীন স্ফটিকে জাগে রাঙা জবার রক্তিম উপাধি। ফলে হ'ল কি, বাংলা শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদে সঙ্গীতানুরাগীরা পেলেন এক নব স্বাদ যেন নতুন ক'রে, এই কথা উপলব্ধি ক'রে যে, একদিকে কাব্য অসামান্য না হ'লেও যেমন সুর তাকে অপূর্বতার গৌরব দিতে পারে, তেম্‌নি পক্ষান্তরে কাব্য অপরূপ হ'লেও সুরের সামান্যতা কমবেশি ঘুচতে পারে।

এ সত্যিই কথার কথা নয়। ভূমিকায় রোলাঁর উক্তি গভীর : যে, একটা শিল্প নিত্যনিয়তই তার নিজের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে প্রতিবেশী শিল্পের এলাকায় গিয়ে অনেক সময়েই নব সার্থকতা পায় নিজেকে নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রে। তাই নৃত্যের সঙ্গত মিলল সঙ্গীতে, চিত্র-রেখার রাজ্যে এল স্থাপত্যের পরিপ্রেক্ষণিকা, কাব্যে লাগল প্রায় সব শিল্পেরই কিছু না কিছু রক্তরাগ। এম্‌নিই হয় শিল্পের রাজ্যে। বাংলার শ্রেষ্ঠ রাগভঙ্গিম গানের বেলায়ও একথা খাটে, সুতরাং ওরা সার্থক।

কিন্তু তবু একথাও মানতেই হবে যে গান যখন তার গৌরবের চরম শিখরে ওঠে তখন তার দুটো পরম সম্পদ থাকাই চাই : নিটোল কাব্যরস ও নিখুঁৎ সুরদীপ্তি। সুরের রচনার দিক দিয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই শ্রেণীর ধ্রুপদভাঙা খেয়ালভাঙা টপ্পাভাঙা ঠুংরিভাঙা গান আমাদের পরম গৌরবের বিষয় হ'লেও স্বপ্নশিখরের সর্বোচ্চ গৌরব তার প্রাপ্য নয়। ক্রোচের একটি গভীর কথা মনে পড়ে : "শিল্পকলার সমালোচনার ঐতিহাসিক প্রেরণা আসে তার সমগ্র ইতিহাসের পর্যালোচনা থেকে—

আর এই যে সমগ্রতা, একে দেখতে হবে তার মূল অখণ্ড ভাব থেকে—তার খণ্ড দেহাঙ্গবিশেষ থেকে না।" * এখন, সমগ্রভাবে আমাদের বাংলাগানের ক্রমবিকাশকে দেখতে গেলে দেখা যায় কি?—না, রাগভঙ্গিম গান ওর নিত্যনব আত্মলাভ আত্মবোধের পথে একটি সুন্দর ও বিশিষ্ট বিকাশে সত্য হ'য়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তবু সে-বৈশিষ্ট্যে বঙ্গভারতীর পরমতম পূজা হচ্ছিল না—যেহেতু এ-শ্রেণীর গানে সুরকারের স্রষ্টা অন্তরাত্মার নিগূঢ় তৃষ্ণাটি মিটছিল না পুরোপুরি। কিসের এ-তৃষ্ণা? বিশদ ক'রে বলা কম কঠিন নয়—কেন না এখানে যে শিল্পানন্দের মূল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে টানাটানি। তবু যখন এ-প্রশ্ন উঠেছে, তখন চেষ্টা করতেই হবে উত্তর দিতে—যতটা পারি প্রাঞ্জল ক'রে।

শিল্পে আমরা কী চাই? বিশেষ—গানে?—দুটি বস্তু: ভাব ও রূপ। এ-যুগল তৃষ্ণা স্রষ্টা ও গ্রহীতা উভয়েরই মনের আদিম তৃষ্ণা। এ-তৃষ্ণা মেটে কী ক'রে?—কেউ জানে না। প্রেরণা কী ক'রে আসে সে-তত্ত্ব নিহিতং গুহায়াম্—কিনা উপলব্ধিগম্য হ'লেও প্রকাশ ক'রে বলা প্রায় অসম্ভব। এ-উপলব্ধির রহস্যভেদ করতে অবচেতন অতিচেতন প্রভৃতি হাজারো পারিভাষিকের আমরা সৃষ্টি করেছি বটে, কিন্তু এ-সবই হ'ল যেন হাওয়া দিয়ে শূন্যতা ভরানো, কথায় চিঁড়ে ভেজানো: জ্ঞানের গূঢ় ক্ষুধা এতে মেটে না।

কিন্তু তাব'লে উপলব্ধির প্রত্যক্ষ তৃপ্তির মূল্য এক তিলও কমে না: সে আছেই—কেন না সে আছে ব'লেই জ্ঞান আছে: "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"—"তারই আলোয় ভুবন আলো"। বাস্তব জ্ঞানের তথা উপলব্ধির দিক দিয়ে এ-সত্যকে অস্বীকার করার জো নেই যে প্রেরণা যে-পথ দিয়েই আসুক না কেন যখন আসে তখন সব সংশয় ছিন্ন

* "Criticism of art···receives its historical impulse from the complete history, which belongs to the spirit as a whole, never to one form of the spirit torn from others."—*Benedetto Croce* (Essence of Aesthetics—Chap. 4)

হয়—প্রশ্ন স্তব্ধ হয়—অন্তরের অতলে কোন্ পুণ্য মুহূর্তে কি একটা বাতায়ন খুলে যায়—চোখের ঠুলি পড়ে খ'সে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দোলা লাগে স্পন্দন জাগে প্রাণে মনে আত্মায়—যার আলোকিত-আবেশকে ক্রোচে বলেছেন vision—intuition :

"I will say at once, in the simplest manner, that art is vision or intuition. The artist produces an image or a phantasm and he who enjoys art turns his gaze upon the point which the artist has indicated, looks through the chink he has opened and reproduces the image in himself." (Essence of Aesthetics—Chap. 1)

এই ধ্যানদৃষ্টি এই প্রাতিভ অনুভূতি চায় কী ? না, যা দেখল তাকে দেখাতে, প্রেরণার বিদ্যুদ্দামে উদ্ভাসিত হ'য়েই যে নিভে গেল তাকে ফলাতে—ধ'রে রাখতে—গানে হোক্, কাব্যে হোক্, চিত্রে হোক্, ভাস্কর্যে হোক্। কিন্তু এই ফলিয়ে-তোলার ধ'রে রাখবার উপায় কি ?—সেইটেই হ'ল শিল্পীর ভগবদ্দত্ত (বা সাধনালব্ধ) নৈপুণ্য, প্রতিভা, মনীষা বা জাদু—যে নামই দেওয়া হোক্ না কেন—যায় আসে না। এইখানেই শিল্পীর যত কারিগরি, যত খবরদারি, যত আনন্দ। সুতরাং শিল্পের উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রধানত দুটি জিনিষের 'পরে : প্রথম, শিল্পী যা দেখলেন তার রূপমহিমায়, ভাবগৌরবে ; দ্বিতীয়, যাকে দেখালেন তার রসালতায়, প্রকাশসাফল্যে। কিন্তু যেহেতু সব রূপ সমান সুন্দর নয়, সব আনন্দ সমান গভীর নয় সেহেতু শিল্পীর তপস্যা হ'ল উত্তরোত্তর উচ্চতর স্তরের রূপরহস্য সুষমাকান্তি ফুটিয়ে তোলার তপস্যা। শিল্পসাধনার ক্রমবিকাশ—ইভল্যুশন—মানে এই-ই।

গানে এই তপস্যা মন্ত্র নেয় কাকে ফোটাতে ? মার্গসঙ্গীতে আমরা দেখেছি—বিশুদ্ধ রূঢ়িক সুরকে, দেশীসঙ্গীতে—বিশেষ ক'রে কাব্য-সঙ্গীতে কাব্য ও সুরের মিলনজাত যৌগিক রূপকে। কাজেই এ-উদ্ঘাটনের দুটো দিক্ আছে—কাব্যের, সুরের।

বাংলা সঙ্গীতে যথার্থ কাব্যরূপের বিকাশ সুরু হয়েছে ধরতে গেলে

বৈষ্ণব কবিদের সময় থেকে। অদ্যাবধি এ-রূপের বিকাশ ঘটেছে আশ্চর্য দ্রুতভাবে। এত দ্রুত যে গৌরববোধ না ক'রে পারা যায় না। কেন না আজ অকুতোভয়ে বলা চলে যে "গান"সম্পদে বাংলা সাহিত্যের সমান সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে কোথাও নেই—যদিও বিশুদ্ধ কাব্যসাহিত্যে এখনো ইংরাজি সাহিত্য আমাদের চেয়ে ঠিক্ ভাবগরিষ্ঠ না হ'লেও রসগরিষ্ঠ ও ওজস্বী একথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু গানের কথাই বলি। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে, যে কারণেই হোক, কাব্যে সহজ-পটুত্ব বেশি। বিশুদ্ধ স্বরসৃষ্টিতে হিন্দুস্থানিরা বরাবরই আমাদের চেয়ে বড়—যদিও এখন ওরা আর আগেকার মতন এগিয়ে নেই। (ভীষ্মদেব প্রমুখ কয়েকজন তরুণ বাঙালির গান শুনে আমাদের ভাবিয়ে দিয়েছে যে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ স্বরসৃষ্টিতেও আমরা ওদের সমান হ'তে পারব। কেবল, এটা সম্ভব হবে ভীষ্মদেব প্রমুখ প্রতিভাশালী স্বরশিল্পীদের জীবনব্যাপী স্বরতপস্যা থাকলে তবেই : নৈলে এ অসাধ্য সাধিত হবে না—কোনো বড় সৃষ্টিই অক্লান্ত তপস্যা বিনা সর্বাঙ্গসুন্দরতার রসলোকে উত্তীর্ণ হ'তে পারে না।)

কিন্তু আমরা চাই আজ সুরকারকে—কম্পোজারকে। এযুগের তৃষ্ণা —সুরকারের তৃষ্ণা। প্রত্যেক যুগেরই একটা যুগধর্ম আছে। ইতিপূর্বে বলেছি যে, আগের যুগেও একধরণের সুরকার ছিল বৈ কি, মার্গসঙ্গীতে প্রতি গুণীই কমবেশি সুরকার, যেহেতু তাঁদের তানকর্তবে রাগের নব নব রূপ নব নব ব্যঞ্জনা তাঁরা দেখান তো বটেই। কিন্তু তবু তাঁদের ধ্বনিস্থাপত্যে কারুকলার অভাব না থাকলেও—ঠিক অনিবার্যতা যাকে বলে তা নেই, এবং স্বরসৃষ্টিতে স্থাপত্যের অনিবার্যতা না থাকলে যথার্থ সুরকার পদবী দাবি করা চলে না।

অবশ্য বলাই বেশি প্রশ্নটা সুরকার হওয়া-না-হওয়া নিয়ে নয় : প্রশ্নটা হ'ল আসলে সৃষ্টির উৎকর্ষ নিয়ে। সুরকারকে আমরা আজ চাই এই জন্যে যে গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এক তাঁর হাতেই সম্ভব—গায়কের হাতে নয় : কি না সুরকারই হচ্ছেন সুরলোকের সম্রাট্, সুরশিল্পীও (executant) একশ্রেণীর স্রষ্টাজ্যোতিষ্ক বটে, কিন্তু সুরকারের নক্ষত্রলোকে

তাঁর ঠাঁই নেই একথা প্রতি সঙ্গীতানুরাগীই মানেন সব সভ্য দেশে—না মেনেই উপায় নেই। স্বীকার করতে কোথায় দুঃখ বাজে—(হায় পেট্রিয়টিস্‌ম্‌, কিন্তু সত্য দেশভক্তির চেয়েও বড়)—তবু একথা মানতেই হবে যে এবিষয়ে য়ুরোপের মানদণ্ডই ঠিক্‌—তারা বরাবরই স্বরকারকেই করেছে ব্রাহ্মণ, স্বরশিল্পীকে করেছে ক্ষত্রিয়—ব্রাহ্মণের আজ্ঞাবহ। অর্থাৎ স্বরের মুনি যা বলবেন স্বরের গুণীকে তা-ই পালন করতে হবে।

তাহ'লেই দাঁড়াচ্ছে যে, স্বরকারের নির্দেশই পরম ও চরম। কিন্তু কখন?—না, যখন তিনি ধ্যানদৃষ্টিতে যা দেখলেন, ধ্যানশ্রুতিতে যা শুনলেন তাকেই ফুটিয়ে তুলতে চান। আমরা দেখেছি খেয়াল ঠুংরিতে ধ্যানদৃষ্টি বা ধ্যানশ্রুতির এ-অনিবার্যতা নেই—কেননা সেকালে স্বরকার এভাবে দেখতে বা শুনতে শেখেন নি। এ-প্রবণতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন্‌ হয়েছি হাল আমলে—এ-যুগে : কেন না এ-ই হ'ল এ-যুগের ধর্ম—এই স্বরলীলার অতিপ্রত্যক্ষ উপলব্ধি—concreteness of melodic realisation.

মার্গসঙ্গীত-প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বলেছি যে বড় বড় রাগগুলি এক একজনের হাতে গ'ড়ে ওঠে নি—যদিও এক একটা রাগের এক একটা বিশেষ চাল হয়ত কোনো কোনো রচয়িতার ও তাঁর ঘরানা সাকরেদদের কণ্ঠে ফুটে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে থাকবে। কেবল ধ্রুপদে, রাগরচনার না হোক, রাগের মালমশলা সাজসরঞ্জাম দিয়ে রকমারি বিগ্রহ গড়ার রেওয়াজ ছিল—নৈলে ধ্রুপদ-পরিষৎ গ'ড়ে উঠত না। এ-বিগ্রহ গড়া সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে ধ্রুপদী রাগের উপাদানে শক্ত জিনিষ কিছু ছিল—তাই প্রতিমাগুলি মর্মর মূর্তির মতন দীর্ঘজীবী হয়েছিল, মেটে মূর্তির মতন ক্ষণায়ু হয় নি—যেমন হয়েছিল পরবর্তী খেয়াল টপ্পার যুগে এসব রাগের তরল ও বায়বীয় ভঙ্গি।

কিন্তু ধ্রুপদের এই আঁটসাঁট ভাব, কাঠিন্য—concreteness—উত্তরকালে শ্লথ হ'য়ে এলেও ধ্রুপদের বাণী সুপ্ত ছিল মাত্র লুপ্ত হয় নি। এরও পরে অনেকটা বৈজ্ঞানিক 'আটাভিস্‌ম্‌'-এর ভঙ্গিতে তাইতো ধ্রুপদ

নবজন্ম নিল বাংলা গানে—অত্যাধুনিক বাংলা গানে। লাতিনে একটি প্রবচন আছে :

"Omnia praetereunt, redeunt, nihil interit."

"যাহা চ'লে যায় তা-ই আসে ফিরে ফিরে
মরণের ঢেউয়ে নব-জনমের তীরে।"

এই ফিরে-আসা—মৃতকে এই নবজন্মদান এরি তো নাম সৃষ্টি। একেই তো বলব প্রগতি। কারণ এখানে মিলল সৃষ্টিলীলার চরম নৈপুণ্য, পরম আনন্দ—ধ্যানদৃষ্টির ধ্যানশ্রুতির গভীরতম সার্থকতা। এই জন্যেই এখনকার দিনে কোনো রাগ নিখুঁৎ হ'ল কি না এ প্রশ্ন অর্থহীন, অবান্তর : দেখতে হবে ভাবে রূপে রসে একটা নিটোল সৃষ্টি ফুটে উঠল কি না—যেহেতু এরই নাম হ'ল কম্পোজিশন—সুরমুনির ধ্যানমূর্তি। তাই আধুনিকতম বাংলা গানেই সুরকার পরমতম সার্থকতা পেতে চাইছেন : শুধু কাব্যের গুণে নয়—কাব্যের সঙ্গে সুরের নিখুঁৎ অনিবার্য সমন্বয়ে সুষমায় সামঞ্জস্যে। একথা বললে অবশ্য সেটা হসনীয় কথা হবে যে যা-ই কিছু না গড়া হোক না কেন—তাকে মঞ্জুর করতে হবে সৃষ্টি-সার্থক রসোত্তীর্ণ ব'লে মেনে নিয়ে। তা নয়। প্রতি রচনাকে ক'ষে দেখতে হবে বৈ কি সে খাঁটি সোনা, না গিল্টি। দেখতে হবে বৈ কি কোন্ গানের রস কতখানি—আনন্দ কী শ্রেণীর। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, এ-যুগের নবসুরসৃষ্টির এ বিচার করা একটু কঠিন, কেন না কম্পোজিশন কাকে বলে তা-ই আমরা এ যাবৎ ঠিকমতন জানতাম না—সবে আভাষ পেতে সুরু করেছি কাকে বলে "গান" কাকে—"কণ্ঠবাদন"। কিন্তু তবু মোটামুটি একটা আভাস যে পেয়েছি, বুকে নবীন এক স্বপ্ন যে উষার আকাশে সোনার বিন্দুর মতন ফুটে উঠছে ও সে আলো দিকে দিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে—এ-বিষয়ে সংশয়ের বাষ্পও নেই। এই স্বপ্ন কী? না, "গানের স্বপ্ন", আলাপের স্বপ্ন নয়, রাগের স্বপ্ন নয়, বাদীবিবাদীর ধুমধামের স্বপ্ন নয়, বাউলের স্বপ্ন নয়, কীর্তনের স্বপ্ন নয়। এক কথায় গানের কোনো জাতীয়তার স্বপ্নই নয়—যেহেতু এ হ'ল "গান"-এর ব্যক্তিস্বরূপের স্বপ্ন—নিজের স্বভাবে স্বভাবস্থ

হ'তে চাওয়ার স্বপ্ন। এখনকার গানকে বিচার করা হবে না তার বংশগৌরব দিয়ে, তার শ্রেণীকৌলিন্য দিয়ে, তার গোত্র, গোষ্ঠী, বন্ধুবান্ধব, পৃষ্ঠপোষকের আভিজাত্য দিয়ে। তাকে বিচার করা হবে শুধু তার স্বকীয় পরিচয় দিয়ে। এইটিই হ'ল আধুনিকতম গানের নমুনা—যেখানে গান নানা পথে হাতড়ে হাতড়ে শেষটায় পুরোমাত্রায় গান হ'য়ে উঠতে চাইছে তার বাহ্য উপাধি বর্ণ তগমা অভিজ্ঞান ছেড়ে। এ-গানের তীর্থযাত্রা কোন্ পথে তার আভাষ দিতে চেষ্টা করব এবার শেষ অধ্যায়ে।

২১

গান—তীর্থপথে

স্থান—স্বপ্নলোক　　　　কাল—নিদ্রানিশীথ

পাত্র—"গান" পুষ্পকরথে আসীন, মেঘের মধ্যে দিয়ে রথ চলেছে নিঃশব্দে, গান নানান্ মেঘে স্বর্গসীমান্তদেশের নানান্ স্টেশনের রঙচঙের পূর্ব ও পশ্চাৎ ছটা উপভোগ করতে করতে গুনগুনিয়ে তান ধরছেন। তাঁর চেহারা এখানে বাঙালির মতনই বটে কিন্তু তাঁর প্রাণের আকুতিটি সার্বভৌম: কি না, হিন্দি মারাঠি গুজরাতি ইংরাজি জর্মন রুষ যে-ভাষায়ই কাব্যসঙ্গীত ফুটে উঠবে—যেখানেই সুর চাইবে কথার মিলন সেখানেই তাঁর আবির্ভাব হবে এ-ইঙ্গিত তাঁর ভাবে ভঙ্গিতে ফুটছে। সুতরাং স্বপ্নে-দৃষ্ট তাঁর এ-বঙ্গযুবকের মূর্তি—এহ বাহ্য—অ্যাক্সিডেণ্ট। যাহোক এ-হেন "গানে"র পাশেই এসে বসলেন শ্বেতশ্মশ্রু "রাগ" হঠাৎ —'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।'

গান (চমকিয়া): কে?

রাগ: আমি, নবীন!

গান: নমস্তে প্রবীণ!—বসুন।

রাগ : কল্যাণমস্তু।

গান : আহা—ভালো হ'য়ে বসুন না, বাবু হ'য়ে! এ হ'ল পুষ্পক রথ : স্থানাভাব ব'লে কোনো অঘটন এখানে তো ঘটতে পারে না।

রাগ (হাসিয়া) : জানি, নবীন! (বাবু হইয়া উপবেশন)

গান (খানিক চুপ) : যদি কিছু মনে না করেন প্রবীণ—

রাগ : সে কি কথা নবীন?

গান : এমন কিছু না--আম্‌তা—তবে কৌতূহল হচ্ছিল—কোত্থেকে আবির্ভাব—এই আর কি।

রাগ : রথ নন্দনকাননের শ্মশানে থেমেছিল যে লক্ষ্য করেন নি?

গান (সচকিত) : শ্মশান? নন্দনকাননেও শ্মশান!

রাগ : বাঃ সেখানে যে হর হর ব্যোম থাকেন জানেন না?

গান (মাথা নোয়াইয়া) : শিব শিব শিব!—প্রণাম। আরো বাবু হ'য়ে বসলেনই বা—আহা—(আরো স্থান ছাড়িয়া দিলেন)

রাগ (হাসিয়া) : আ-কারের পরে আ দিলে আরো আ-কার হয় না নবীন? সংসার ছাড়লে বাণপ্রস্থে বাড়া যেতে পারে কিন্তু স্থান কাড়লেই যে বাবুয়ানার প্রস্থে বাড়া যায় এমন কথা তো কই লেখে না।

(উভয়ের হাস্য)

গান : আপনি কি—ক্ষমা করবেন—ঐ শ্মশানেরই বাসিন্দা, প্রবীণ?

রাগ (হাসিয়া) : না নবীন! (দাড়িতে হাত বুলাইয়া): যদিও এটা দেখলে বোধ হয় মনে হয় সময়-সংক্ষেপ করতে কাছাকাছিই থাকা ভালো, না?

গান : বালাই, সে কি কথা? আপনার চেহারায় তো খাসা চেকনাই রয়েছে।

রাগ (প্রীতস্বরে) : পাকা আমটি! (দাড়িতে হাত বুলাইলেন আবার)

গান : জিজ্ঞাসা করতে পারি কি প্রবীণ, আপনি—?

রাগ : ব্রাহ্মণই বটে।

গান : পরিচয়?

রাগ : রাগ।

গান : ও—তাহ'লে পিতা নিশ্চয়ই—

রাগ : ধরেছেন—হেঁ হেঁ—স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব।

গান : কাজেই জ্ঞাতি—

রাগ : আজ্ঞে হ্যাঁ—ঐ নারদ ভরত হাহা হুহু তুম্বুরু আরো সব গালভরা নাম আছে—

গান : জানি জানি দাদা—কেবল ধাম জানতে পারি ?

রাগ : আগে ছিল গন্ধর্বলোক—এখন হিল্লি দিল্লি গোয়ালিয়র কলকাতা লক্ষ্ণৌ বিষ্ণুপুর—নয় কোথায় ?

গান : বেশ বেশ। নাম ?

রাগ : একশো পঞ্চাশটি যে—কত বলব পাপমুখে ?

গান (বিনীত) : দুএকটি অন্তত।

রাগ : ধরুন দরবারি কানাড়া।

গান : অর্থাৎ ?

রাগ : এ-ও জানেন না ? জৌনপুরি ঠাটে সা, রে, কোমল গা, মা, পা, কোমল ধা, কোমল নি ও সা-র উপর হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড !

গান : একটু শোনানই না কাণ্ডটা দাদা—সময়টা কাটবে তোফা।

রাগ (তুষ্ট) : আচ্ছা শুনুন। ভাতখণ্ডের সাঁচ্চা লক্ষণগীত এর নাম :

(গাহিলেন)

দরবারীকি স্বরত হরবঙ্গ বখানত।
নটভৈরবীমেল নটনাট শাস্ত্রমত।
বাদী রিখব হোত, পঞ্চম বিলম ত্যজত।
গান্ধার মুরছিত, রসিকজন মন হরত।

গান (মুগ্ধ) : আহা-হা। সত্যিই মনোহর।

রাগ (প্রীত) : তাহ'লে নিশ্চয় আপনি "রসিকজন"।

গান (বিনীত) : আজ্ঞে পাপমুখে নিজের কথা !

রাগ (খুসি) : না না সে কি কথা ! আপনি ?

গান : আজ্ঞে, আমি মানে ?

রাগ : কী জাত ?

গান (নিশ্চুপ)

রাগ : কী ?

গান : আমার কোনো জাত নেই যে দাদা, তাই লজ্জায় মুখে রা নেই।

রাগ : সে কি ! আপনি কে তাহ'লে ?

গান : আজ্ঞে আমি মানুষ—থুড়ি, গান।

রাগ : গান ? গান তো আমিও।

গান : আজ্ঞে না মাফ করবেন আপনি হচ্ছেন—কী বলব—কণ্ঠবাদন।

রাগ (চমকিয়া) : কণ্ঠবাদন ?

গান : আজ্ঞে—যাকে বলে। বীণকার বীণায় যা বাজান দরবারী কানাড়ায় আপনি অবিকল কণ্ঠে তারই অনুসরণ করেন।

রাগ (ভ্রুভঙ্গি করিয়া) : মানে ? বীণকার কি তারে বাজান "দরবারীকি সুরত—রসি—"

গান (বাধা দিয়া) : ও তো অবান্তর। অর্থাৎ রাগ করবেন না দাদা—এহ বাহ্য আমার—থুড়ি—গানের কাছে। ওখানে তোম্ না না না না গাইলেও আপনার মূর্তির তারতম্য হ'ত না একটুও। হ'ত কি ? বুকে হাত দিয়ে বলুন। অন্তত হাল আমলে ?

রাগ (ভাবিয়া) : তা হ'ত না বটে। আমার এক জ্ঞাতিভাই উজীর খাঁ রামপুরে তোম্ তোম্ তা না না না—ক'রেই আমাকে কণ্ঠসাৎ করতেন কবুল করতেই হবে। তবু—

গান : তবু—?

রাগ (মাথা নাড়িয়া) : তাই ব'লে আমি কণ্ঠবাদন ? কক্ষনো না। মহাদেব-কুলপ্রদীপ রাগ কি না (উদ্দীপ্ত) কণ্ঠবাদন ! ধিক্।

গান : ও-কথাটায় আপত্তি থাকে দাদা, বলুন আপনি কণ্ঠসঙ্গীত। কিন্তু গান আপনি নন। গানের পক্ষে অপরিহার্য হ'ল কথার কাব্য-সৌন্দর্য। আপনি—কখনো স্বকর্ণেই শোনেন নি কি কী রকম শোনাচ্ছে:

আপনাকে—কী কীর্তি আপনি করছেন? কণ্ঠকে ঠিক যন্ত্রর মতনই বাজাচ্ছেন না কি?—না না ভুল বুঝবেন না আমাকে। আপনি সুন্দর, মনোহর, চমৎকার, কিন্তু গান আপনি নন। উঁহুঃ আপনি কণ্ঠবাদন—নির্জলা নির্ভেজাল কণ্ঠবাদন। ঐ নামই বাহাল রাখুন, দোহাই।

রাগ (সবিস্ময়ে): বাহাল রাখব? কেন?

গান: কারণ আপনি যে সত্যিই গান নন দাদা। সঙ্গীতশাস্ত্রীরা বৃথাই বলেছেন "বাদ্যং গীতানুগং প্রোক্তম্"—বাদ্য গীতকে অনুসরণ করে—তবে সেকথা খাটত হয়ত এক মামুলি নাদব্রহ্ম সম্বন্ধেই। রাগব্রহ্মকে—কিনা আপনাকে দেখলে, থুড়ি শুনলে, শাস্ত্রীরা বলতেন "গীতং বাদ্যানুগম্ স্পষ্টম্।"

রাগ (চটিয়া): আচ্ছা মানলাম না হয় আমি কণ্ঠবাদন। শুনি গান তাহ'লে কী?

গান (শুধু নিজের বুকে হাত দিয়াই চুপ)

রাগ: মানে?

গান: মানে আমাকে দেখুন—থুড়ি, শুনুন।

রাগ: আচ্ছা শুনি। না আগে জিজ্ঞাসা করি। কী গোত্র আপনার?

গান (কপালে করাঘাত করিয়া): হা হতোঽস্মি।

রাগ: গোত্র নেই? শ্রেণী? বর্ণ? গোষ্ঠী?

গান (দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

রাগ (আশ্চর্য): কী কাণ্ড! কুলশীল ব'লে কিছুই নেই তবু—

গান (মুখ তুলিয়া): আজ্ঞে হ্যাঁ, তবু আমি গানই দাদা।

রাগ: "তবু আমি গান-ই" মানে? কী রকম গান?

গান: যাকে গান বলে: আধুনিকতম গান—চুটিয়ে গান—যেখানে গানের গান না হ'য়ে গতিই ছিল না।

রাগ: পিতা?

গান (চুপ)

রাগ (স্তম্ভিত): সে কি—!!

গান (সলজ্জে) : দোহাই ও-ইঙ্গিত করবেন না। আমি ভদ্রলোকেরই ছেলে। মা আমার স্বয়ং বীণাপাণি।

রাগ (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) : তবু ভালো আমি বলি বুঝি বা—

গান : ছি ছি ওরকম সংশয়তক্ষককে মনের মূলে ঠাঁই দিতে আছে ? দেখছেন না কী সুখাদ্য চেহারা আমার।

রাগ : বাপু হে, সাক্ষাৎ সাহেব-পুরাণে লিখছে—যা-ই চক চক করে তাই সোনা নয়। কিন্তু তোমার পিতা—

গান : স্বয়ং বিষ্ণুদেব, কিন্তু আমার মতন কুলাঙ্গারের হালচাল দেখে শিব কাকার সঙ্গে তিনিও সেই যে শ্মশানে ঢুকলেন বিশবছর আগে—আজও বেরোনোর নামটি নেই। তাই তো আমি মর্ত্তলোকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি অকুতোভয়ে।

রাগ (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) : জয় পিতা, জয় পিতৃব্য ! কিন্তু আপনি যদি আমারই জেঠতুত ভাই হন তাহ'লে আপনাকে এযাবৎ দেখিনি কেন ?

গান : আমি জন্মাবধি ভ্রাম্যমান্—সাগরপারে গিয়েছিলাম—তবে আপনাকে রক্তমাংসের দেহে না দেখলেও আপনার স্বরমগুলেই আমি মানুষ জানবেন।

রাগ : তবে এইমাত্র ঠাট্টা করছিলে যে ?

গান (জিভ কাটিয়া) : ছি ছি ওকথা বলবেন না—আমি একটু মস্করা করছিলাম বৈ তো নয়। আপনার খুদকুঁড়োয়ই তো আমার এ-দিব্যকান্তি দাদা। এমন কি সাগরপারেও আপনার প্রভাব ভুলতে পারি নি। দিন, ক্ষমা ক'রে পায়ের ধূলো দিন। (পায়ে মাথা ঠেকাইলেন)

রাগ (রাগ জল) : আহা—হা—হা করো কি ভাই ? ওঠো ওঠো। বোসো বাবু হ'য়ে। (উভয়ের হাস্য)

রাগ : এবার বচসা রেখে একটু সৌভ্রাত্র্য ভাঁজো তো ভাই।

গান (বিনীত ভাবে) : ফর্মাস করুন।

রাগ (ভাবিয়া) : কথা ভাঁজার চেয়ে বরং সুরেই গৌরচন্দ্রিকা সুরু হোক না কেন। একটি গান গেয়েই না হয় নিজেকে বোঝালে ভায়া ?

গান : কিন্তু এ-ক-টি গানে আমার কী-ই বা বুঝবেন দাদা ?

রাগ : অর্থাৎ ?

গান : আমার মূর্তির কি সংখ্যা আছে ?—কম্‌সে কম্‌ দেড় লাখ।

রাগ (চক্ষু কপালে তুলিয়া) : অ্যাঁ ? বড় ভাইয়ের মূর্তি যেখানে দেড়শো—ছোট ভাইয়ের মূর্তি সেখানে দেড় লা—

গান (বাধা দিয়া) : নিজের 'পরে এ-অবিচার কেন দাদা ? আপনার মূর্তি দেড়শো তো শুধু ব্যাকরণে—আসলে (গুন গুন করিয়া) :

কত রূপে দাও দেখা জানি দাদা, জানি :
তোমারে দেড়শো রাগে কেমনে বাখানি ?
ধ্রুপদে কত না তাল,
খেয়ালে কত না চাল,
টপ্পা ঠুংরি গজলেও তোমারেই মানি :
কোটিরূপে তোমারি যে রাগেরে সন্ধানি।

রাগ (দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধ স্বরে) : কিন্তু তবু—মানে আমার কোটিরূপ বা মিশেলরূপ থাকলেও—এটা তো—

গান : আহা তা আর জানি না দাদা ? আপনার প্রতি মূর্তির প্রতি রূপেরই একটা খোপ আছে—আস্তানা আছে—মুখে মুখে গাইতে গাইতে কণ্ঠে কণ্ঠে আপনার স্বরের একটা রূপকল্প—প্যাটার্ণ—কায়েমি হ'য়ে গেছে। ঐখানেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—কারণ বড়ভাইয়ের সঙ্গে ছোটভাইয়ের এইখানেই মস্ত প্রভেদ যে আমার তুলনা এক আমি : কি না, প্রতি গানেই আমার আলাদা রূপ রস ব্যঞ্জনা। বড়ভাই তাই একহিসেবে সংসারীই বৈ কি—যেখানে ছোটভাই গৃহহারা, চিরবিবাগী। অর্থাৎ, প্রতি গানেই—মানে যথার্থ গানেই—আমি ফুটে উঠেছি যাকে বলে অনিবার্য হ'য়ে। অর্থাৎ অবশ্য আধুনিক গানে যেখানে গান সত্যিকার গান হ'য়ে উঠেছে।

রাগ : গান সত্যিকার গান হ'য়ে উঠেছে মানে ?

গান : বুঝিয়ে বলা মুস্কিল দাদা। হয়েছে কি জানেন ? আপনি ও আমি একই কুলের কুলতিলক হ'লেও ভবঘুরে শিক্ষাদীক্ষায় আমার

ভোল গেছে বদলে। তাই বংশ কুল ধাম সবই আমি প্রায় ছেড়েছি।

রাগ: তবে নিজের পরিচয় দাও কী দিয়ে ভায়া?

গান: আমাকে দিয়ে। আমাকে দেখুন—থুড়ি, শুনুন। আনন্দ যদি পান তবে সেই আমার পরিচয়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে পরিচয়ায় দাদা। অবিশ্যি কুলজির পরিচয় আমারো হয়ত একটু আধটু থাকতে পারে। হয়ত শুনবেন বা আমার অমুক গানে আছে ভৈরবীর খোঁচ, অমুক গানে সিন্ধুর রেশ, অমুক গানে কানাড়ার আমেজ—আরো কত গানে কত কী নাম-না-জানা স্বর কখনো বা হাওয়াঈয়ের মিড়, কখনো বা জার্মানির গমক, কখনো বা মেঠো বাঁশির রেশ, বাউলের ভাটিয়ালির কীর্তনের ঝঙ্কার—আবার কোনো গানে হয়ত আমি বিশুদ্ধ রাগভঙ্গিম—তাতেও আমার গৌরব কমে না—যদি সে-স্বরের একটা অনিবার্য বৈশিষ্ট্য থাকে। এককথায় আমার অঙ্গে হাজারো নামের নামাবলি বললেও ভুল হবে। বলতে হবে একই আলোয় আমার অঙ্গে হাজারো রূপ মূর্তি উঠেছে ফুটে—যেমন একই আলোয় স্ফটিকে ফোটে হাজারো রঙের দ্যুতির ঝিকিমিকি। তাই আমার রূপ আছে কিন্তু না আছে নাম, না ধাম, না জ্ঞাতি, না গোত্র।

রাগ: বুঝলাম না ভাই।

গান: এ যে বুঝবার নয় দাদা—বললাম না এ শুধু শোনবার, রসিয়ে ওঠাব, মজবার—বুঝবার নয়?

রাগ: আহা—তবে শোনাওই না ছাই, তোমার রূপরসে নিজেকে একটু রসিয়ে নিলামই বা।

গান: কিন্তু এইমাত্র যে বললাম আমি বহুরূপী দাদা! একটা গানে নিজের রসরূপের কী পরিচয় দেব বলুন দেখি?

রাগ: আহা—হা—একটার বেশি গাইতে পারবে না এমন কথা ব'লে শাসাচ্ছে কে? না হয় অনেকগুলো গানই গাইলে নিজেকে বোঝাতে।—ভয় নেই ভায়া, আমি অতি ধৈর্যশীল দাদা—একের পর এক গেয়ে চলো—আমি শুনব ভালোবেসেই, অন্তত ভাইয়ের পরিচয়ের জন্যেও তো শোনা চাই।

গান (ভাবিয়া) : একের পর এক ? কিন্তু মনে রাখবেন—এরা সবই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মানে, নিজেরা গান হ'য়েও গানের মহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত না দিতে পারলে এরা খুসি নয়।

রাগ : ভায়া, সাগরপারে গিয়েছিলেই না হয়—তাই ব'লে এতশত চাল কেন বলো দেখি ! এটুকুও কি তোমার দাদা বোঝে না যে কোনো শিল্পই তার বর্তমান রূপে সাঙ্গ নয় ? আমার তহবিলে দেড়শো রাগ গিশগিশ করছে। কিন্তু তাদেরই বা কোন্ ছাঁচটা বলে শুনি যে আমি এখনই যা হয়েছি তা-ই আমার সম্ভাবনার চরম ? এইমাত্র গুনগুনিয়ে তুমিই কি বললে না যে বিকাশের ইতি নেই ? শুধু আমার ছাচের বেলায়ই আছে ? বাঃ !

গান : (খুসি) : মাফ করবেন দাদা। আপনার কাছে চাল দিতে আমি ভনিতা করি নি—

রাগ : না, না, কিন্তু অ্যাপলজি রেখে গাইবে এখন ?

গান : তবে শুনুন দাদা—কিন্তু একটা কথা—আপনার কী মনে হয় খোলাখুলি বলতে হবে।

রাগ : কেন ভায়া ? আমরা সেকেলে মানুষ—

গান : পায়ের ধুলো দিন দাদা—তাই তো জানতে চাই। যারা আমাদের সমানধর্মী তাদের সাড়া থেকে আনন্দ পাই—কিন্তু শিখি বেশি তাদেরই কাছে যারা স্বভাবে আমাদের বিপরীত।

রাগ (হাসিয়া) : বিপরীত-এর টীকা এখানে বেরসিক—এই তো ?

গান : তা না দাদা—

রাগ : তা-ই ভাই, তা-ই। আমরা মুখে যতই কেন উদারতা দেখাই না, মনে মনে বিলক্ষণ জানি যে আমার রুচির সঙ্গে যার মিলল না সে-বেরসিকের অন্তিমে রৌরবনরক-প্রয়াণ ধ্রুব।—(হাসিয়া) না ভায়া না, আর একটিও কথা না—এ খেদ করলাম শুধু দেখাতে যে প্রাচীনদের তোমরা যতটা নীরস ও বেদরদী ভাবো তারা ঠিক ততটা হোপ্‌লেস্ নয়।

গান (হাসিয়া) : ব্যস্ দাদা ব্যস্—তুম্ ভি মিলিটারি, হম্ ভি মিলিটারি। রসিকতা যখন সুরু করেছ তখন আর আপনি নয়—তুমি।

প্রথমে শোনো, রবীন্দ্রনাথের একটি ধ্বনিঘন কাব্যঘন অত্যাধুনিক গান! এ গানটি এত সুন্দর—!

(গাহিলেন হাতে তাল দিয়ে):

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।
কোন্ শূন্য হ'তে এল কার বারতা।
নয়ন কিসের প্রতীক্ষারত
বিদায়-বিষাদে উদাস মতো,
ঘন কুন্তলভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা॥
কেশর-কীর্ণ কদম্ব বনে
মর্মর-মুখরিত মৃদুপবনে
বর্ষণ হর্ষভরা ধরণীর
বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য মানো ওগো ধৈর্য মানো,
বরমাল্য গলে তব হয় নি ম্লান
আজো হয় নি ম্লান,
ফুলগন্ধ-নিবেদন-বেদন সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা।

রাগ: হুঁ (ভাবিত)

গান: কী?

রাগ: উঁহুঃ (আরও ভাবিত)

গান: উঁহুতে শানাবে না দাদা বলতে হবে কী ভাবছ।

রাগ: ভাবছিলাম এতে সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দের সঙ্গে বাংলা মাত্রাবৃত্ত মিশিয়ে তবে টাল সাম্‌লানো হয় নি কি? যেমন ধরো "শূন্য হ'তে"-র "তে"-কে ধরা হ'ল সংস্কৃত ভঙ্গিতে দুমাত্রা, অথচ তার পরেই "এল"-র "এ"-কে ধরা হ'ল বাংলা ভঙ্গিতে একমাত্রা, "কিসের" "সে"-কেও অমনিধারা দ্বিমাত্রিক গুরুভঙ্গি ধ'রে তবে ছন্দ বেঁচেছে, "দা, যা" ধরণের অনেক আকারকেও দ্বিমাত্রিক ধরা হয়েছে অথচ

"প্রতীক্ষা"-র "ক্ষা"-কে ধরা হ'ল টপ্ ক'রে একমাত্রা, "ললাটে"-র "টে"-কেও—ইত্যাদি। এ-ধরণের ছান্দসিক জগাখিচুড়িতে এ-গানটির কাব্য-সুষমা ডুবল না কি?

গান (হাসিয়া): মোটেই না দাদা, ডুবলে তুমিই—কাব্যছন্দের ব্যাকরণ দিয়ে গানের ছন্দরসকে মাপতে গিয়ে। কাব্য ও গান যে সমার্থক নয় একথা না জানলে যে গানের বোধোদয়ই হ'তে পারে না।

রাগ: গানের বোধোদয় মানে?

গান: মানে—গান নিছক কবিতা নয় যে। অনেকে এই শাদা কথাটি জানেন না ব'লেই গানের ছন্দকে কবিতার ছন্দ ভেবে ছন্দের খোঁটা দিতে যান—কিন্তু গান তাতে হাসে, বলে: আমি তো তোমার নিছক কাব্য নই হে ছান্দসিক! তাই দুয়ো, তোমার ব্যঙ্গ আমার বুকে শক্তিশেল হ'য়ে বাজল না—যেহেতু আমি যে গান, নিছক কাব্য তো নই।

রাগ: তার মানে কি বলতে চাও যে গানের এ-আপত্তি মঞ্জুর?

গান: আলবৎ। কমলকে সোনার জহুরি কষতে এলে তার আপত্তি মঞ্জুর নয় তো মঞ্জুর কার আপত্তি শুনি? বাঃ! গানের ছন্দ সুরে বিরাট হয় এ-শাদা কথাটাও যিনি জানেন না তাঁকে কাব্যরসিক ব'লে মানতে পারি, কিন্তু গানরসিক ব'লে মানলে প্রত্যবায় ঘটবে না? ছন্দের বেলা একথার তাৎপর্য এই যে, গানেরও ছন্দ আছে অবশ্যই, কিন্তু সুরে ও কাব্যে মিলে তবে। এই মিলনসুষমার চালটিই হ'ল গানের ছন্দস্বরূপ—যথার্থ দোলা। কিন্তু এ-কচকচি থাক। বলো দেখি গানটি কেমন?

রাগ: গানটি না সুরটি!

গান: ঐ তো দাদা ফের দ-য়ে মজ্‌লে। বললাম না গান বলতে আমরা বুঝি সুর ও কাব্য উভয়ের যুগলমিলন—রাধাশ্যামের (গুন গুন "করিয়া) আধশিরে শোভে চাঁচর চিকুর আধশিরে শোভে বেণী" সখিরে—(তিনি)—অর্থাৎ দুয়ে মিলে তবে ছবি। কাজে কাজেই একেকে বাদ দিয়ে অপরের বিচার চলবে না—যদি গানের রসিক হ'তে চাও;—কেন না ও হ'ল রসবিচার নয়—ব্যবচ্ছেদ। গানের সুবিচারে সব আগে

চাই—সমগ্র ধ্যানদৃষ্টি : সব জড়িয়ে কেমন লাগল—"এই-ই হয় প্রশ্ন" শেক্ষপীয়রের ভাষায়।

রাগ : ভালোই লাগল, তবে কি জানো ভায়া? এটির রাগ যে কী—ঠাহর পাচ্ছি না যে। এখানে ওখানে সেখানে তাই কেবলই ঠোক্কর খাচ্ছি। কত রকমের রাগরেশ যে এসে মিশেছে এতে—কোনো বিশুদ্ধ রাগভঙ্গি—

গান : তাই তো চাই আমরা দাদা! বিশুদ্ধ রাগভঙ্গিম গানকে আমরা এ-ভাবে সৃষ্টি বলি না। অর্থাৎ তাতে রস থাকলেও রূপের এ-হেন অনিবার্যতা নেই। কেন না তার লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে আত্মলাভ নয়—রাগলাভের আকাঙ্ক্ষাও তার বুকে জাগছে।

রাগ : যথা?

গান : ধরো নিধুবাবুর "ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে"—খাম্বাজ, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের "মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে"—ইমনকল্যাণ, কিম্বা দ্বিজেন্দ্রলালের "আর কেন মা ডাকছ আমায়"—সিন্ধু—এসব গান হ'ল বিশুদ্ধ রাগভঙ্গিম। এতে আনন্দ পাই বৈকি—কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সৃষ্টির আনন্দ—সুরকে নব রূপলোকে উত্তীর্ণ দেখার শিহরণ—এককথায় নব সুরযুগের কোনো অচিন রহস্যময়ীর আভাষ পাই না যেমন পাই—ধরো রবীন্দ্রনাথের ঐ "রাঙিয়ে দিয়ে যাও" ধরণের গানে : *

(গাহিলেন)

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে॥

* "হিন্দুস্থান" রেকর্ডে শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু এ-গানটি গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সুরে।

রং যেন মোর মর্মে লাগে
আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥
যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে
রক্তে তোমার চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নির্ঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেম্‌নি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

গান (থামিয়া): বুঝলে কি ?

রাগ: এবার বোধ হয় একটু একটু বুঝবার কিনারায় আসছি ভায়া, অন্তত আঁধার ফিকে হ'য়ে আসছে মনে হয়। কারণ এ-গানটির কথায় ও সুরে এমন আলোর ঝর্ণা উপছে পড়ছে—

গান (খুসি): শোভানাল্লা, দাদা—le mot juste—লাখ কথার এক কথা—কাব্য ও সুর দুয়ে মিলে তবে ঝরে আলোর ঝর্ণা।

রাগ: তা বটে কিন্তু এ সব গানে তালের কী গতি হ'ল "এ-ও হয় প্রশ্ন"।

গান: কেন ?

রাগ: সমে ফিরছে কই ?

গান: সম্ টম্ নেই দাদা। ওসব হ'ল ওস্তাদি অত্যাচার। আমরা ছন্দের নিয়ম মানি—কেন না সে বিশ্বজনীন, চিরন্তন—কিন্তু তালের ঐ সব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "উৎপাৎ" মানতে পারি নে।

রাগ (চমকিয়া): উৎপাৎ! তাল!!

গান: তাল উৎপাৎ নয় দাদা—উৎপাৎ হ'ল তালের ওস্তাদি

স্বৈরাচারী—নিয়মকানুনগুলি। রবীন্দ্রনাথের "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে তিনি চমৎকার ক'রে বলেছেন একথা।

রাগ: যথা?

গান: তিনি লিখছেন—একথাগুলি আমি এতবার পড়েছি যে মুখস্ত হ'য়ে গেছে—তিনি লিখছেন ঠিক এই সম ফাঁকের অত্যাচার সম্বন্ধে—যার দরুণ আমরা সবাই আশৈশব অশেষ যন্ত্রণা পেয়েছি:

"হাল আমলে এ সমস্ত উৎপাৎ চলবে না। আমরা শাসন মানব, তাই ব'লে অত্যাচার মানব না। কেন না যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাইরের জিনিষ নয়, তা বিশ্বের ব'লেই তা আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তা আমার ভিতরে নেই, বাইরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস ক'রে বা ভয় ক'রে বা দায়ে প'ড়ে মানতে হয়। এই রকম মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়।"

—হূ—র্ রে—

রাগ (চমকিয়া): ও কি ভাষা?

গান (লজ্জিত): ক্ষমা দাদা ক্ষমা—ম্লেচ্ছ উচ্ছলতা—তারপর শুনুন—কবি কী চমৎকার কথা বলছেন: "আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা থেকে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভেতর দিয়ে ব্যক্ত করতে থাকবে।"

রাগ: তাই ব'লে তালের নিয়ম মানবে না? ঢাক উৎপাৎ ব'লে ঢাকী শুদ্ধ, বিসর্জন?

গান: বলিনি দাদা, তালের যে নিয়ম সত্য আন্তরিক তাকে মানতেই হবে—কেন না সে নিয়ম হ'ল রূপের দাবি—তাই যেখানে তাল ছন্দের ওঠাপড়া মেনে চলল স্বচ্ছন্দ তরঙ্গভঙ্গিতে সেখানে তার শৃঙ্খলেই বাজল নূপুর। কিন্তু বারবারই দেখ নি কি দাদা—কী কাণ্ড করেন তালিয়াৎরা? উঃ গানের রাজ্যে তালের অট্টনাদে কী কুরুক্ষেত্রটা তাঁরা হামেশা বাধান বলো দেখি? তালিয়ানার ঔদ্ধত্যে তাঁরা ভুলে যান—যেকথা সব সভ্য দেশের সঙ্গীতেই স্বতঃসিদ্ধের মতন স্বীকৃত—যে, তালের অনবদ্য ভঙ্গিটি হবে অন্তঃশীলা—পদে পদে নিজেকে ও জানান দিয়ে যাবে না। দেহ

যখন সুস্থ থাকে তখন সে নিজেকে নিয়ে শোরগোল করে না—তার মধ্যে দিয়ে আত্মার লীলাকে স্বচ্ছন্দে আলোকমূর্তি ধরতে দেয়: যখন সে ব্যাধিগ্রস্ত হয় তখনই না সে চায় ওস্তাদি তালের মতন গোল পাকাতে—নিজেকে জাহির ক'রে খাতির পেতে। তবে ঝাপসা থেকে গেল বুঝি বা—

রাগ: না ভায়া না—এ অতি খাসা কথা। কারণ একথা আমরাও মূলত মানি। অন্তত শ্রেষ্ঠ রাগসঙ্গীতে আমরাও এই কথাই বলি। সেখানে আমরাও তালকে বেশি প্রশ্রয় দিই না—ঠেকার ধম্‌কানিতে রাখি শায়েস্তা ক'রে—যাতে সুরের 'পরে ও চড়াও হ'তে না পায়।

গান: যা বলেছ দাদা। ঝাড়ো আবার ঐ নমস্য পায়ের ধূলো—কে বলে তুমি প্রাচীন?

রাগ (হাসিয়া): পায়ের ধূলোর ধুমধড়াক্কা রেখে ভাই বরং গাও আরো দুএকটা, লাগছে মন্দ না—এসব মিশেল হওয়া সত্ত্বেও।

গান (খুসি): লাগতেই হবে দাদা খোলামন নিয়ে শুনলে। শোনো তবে আর একটা গান তাহ'লে। এটিতে কিন্তু ঠুংরি টপ্পা দু'ভঙ্গির খাম্বাজ গেছে মিশে—সাধু, সাবধান!—(গাহিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের):

একি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ পবন মন্দ মন্থর
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্মর।

একি নিখিল বিশ্বহাসি
একি সুরভি-স্নিগ্ধ শিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি।
একি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব।
একি সরিৎ-রঙ্গ শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।

কভু কোকিল মৃদু গীতে
উঠে জাগি' শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে।
উঠে বেণু গান মধুর তান করি' বিলাপ কম্পিত
ঘন অবিশ্রান্ত বিমলকান্ত নীল শান্ত অম্বর।

একি কোটি মুগ্ধ তারা
একি নিখিল দৃশ্য প্লাবি' বিশ্ব চন্দ্রকিরণ ধারা।
একি স্তিমিত-নয়ন শিথিল-শয়ন অলস বিভল শর্বরা
শশী- বাহুলগ্ন মুগ্ধ মগ্ন সুপ্ত স্বপ্ন সুন্দর !

রাগ : এটি সত্যিই অপূর্ব—ভাবে রসে ছন্দে। কিন্তু কই এতে তালও তো ঠিক বাকায়দাই আছে। হুবহু একতালা।

গান : না দাদা—চোখ বুজে শুনছিলে কি না তাই লক্ষ্য করো নি—অনেকবার ফাঁকের জায়গায় সম এসে গেছে—সমের জায়গায় ফাঁক। কত ছন্দোবদ্ধ তানেই যে এরকম ঘটে আমাদের।

রাগ (আশ্চর্য) : তাই নাকি ! এরকম ভুল তো আমার হয় না। আমি যে প্রচণ্ড তালিয়াৎ ভায়া ! তাল আমার নখদর্পণে।

গান : তাই জন্যেই তো বলছি যে এটা ভুল নয়। এতে ভিতরের নিয়ম, মানে ছন্দের নিয়ম, মসৃণই আছে, নৈলে চোট খেতই তোমার ঐ তালজ্ঞ নখের আয়নাটি। এই দেখ না—ছয়ের কদম বজায় আছে—যতির ভাগ নিখুঁৎ (গুন্ গুন্ করিয়া দেখাইলেন)। কাজেই সমের জায়গায় ফাঁক আসাতে কোনো রসভঙ্গই হয় না হ'তেই পারে না—যেহেতু এ চলেছে বরাবরই নিখুঁৎ ত্রিমাত্রিক ছন্দে। কিন্তু এ সব তালের কচায়ন রেখে আর একটি গান শুনলেই বা। এ-গানটির মনোহারিতার আমি দিশা পাই না দাদা। (গাহিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের)

নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো !
রাখিস নে আর মায়ায় ঘেরে
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই এমন রাত আর পাবো না লো।

পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে
থামা এখন বীণার ধ্বনি—চুপ্ ক'রে শোন্ বাইরে এসে।

বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মতন ভালোবেসে
এখন যদি মরতে না পাই—তবে আমার মরণ ভালো।

সাঙ্গ আমার ধূলাখেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা,
এইছি হিসেব নিকেশ ক'রে যাহার যত পাওনা দেনা।
এখন বড় শ্রান্ত আমি ওমা, কোলে তুলে নে না
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

রাগ : সত্যি—হৃদয়কে কোথায় ছুঁয়ে যায়…স্বপ্ন জাগে আমাদের বুড়ো হাড়েও! আর কী অপরূপ খাম্বাজ ভঙ্গি—অথচ খাম্বাজও না—দেশের ভাব যেন অন্তরায়—অথচ—নাঃ—এ কী রাগ হে?

গান : ফে—র দাদা? বলি নি—

রাগ : হাঁ হাঁ—ভুলে গিয়েছিলাম ভায়া! —তোমারি তুলনা তুমি. চাদ—এই না?

গান : হাঁ দাদা—রাগের দলিলে আমার স্বাক্ষর নেই—আমার অঙ্গীকার—অনুরাগে।

রাগ : বেশ বলেছ ভায়া। এ গানে জাগে বটে অনুরাগ—প্রেম। আর গানটির ছন্দোবন্ধও বড় সুন্দর ও নতুন ধরণের—সঞ্চারীতে ও আভোগে তিনটি তিনটি ক'রে মিলের পর ধুয়োর সঙ্গে মিল এল ফিরে—এ-ধরণের পূর্ণচরণে কখগঘ, চছজঘ ঢঙের মিলবন্ধ কোনো বাংলাগানে আছে কি—যেখানে ঘ-এর মিল হ'ল আস্থায়ীর মিল?

গান (ভাবিয়া): মনে তো পড়ছে না দাদা—কিন্তু ওর আসল আবেদনটি ঐ ছন্দোবন্ধেও না—মিলবন্ধেও না—ওর পরম রসটি নিহিত ওর ভাবে, ওর সুরে, ওর প্রেমে, ওর নিবেদনে, ওর মিড়ে, তানে, দুল্‌কি চালে,—এক কথায় সব জড়িয়ে ওর একটা নিটোল সৃষ্টি হ'য়ে ওঠায়। রবীন্দ্রনাথের "আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো" বা "গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে" গানটিকেও আমি এই ধরণের সৃষ্টি বলি, অতুলপ্রসাদের "আমার বাগানে এত ফুল" বা "চাঁদিনি রাতে কে গো আসিলে" গানটিকেও—

রাগ : "ক্ষমো হে ক্ষমো" গানটি বছর দশেক আগে মর্ত্যে অঙ্গনে নৃত্যসঙ্গতের সঙ্গে শুনে আমার পাকা দাড়িও চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল ভায়া, "গানের সুরের আসনখানি" গানটিও সুন্দর। কিন্তু অতুলপ্রসাদের "চাঁদিনি রাতে" তো কই শুনি নি।

গান : শোনো নি! অতুলপ্রসাদ কয়েকটি মাত্র এমন নিখুঁৎ গান রচনা ক'রে গেছেন! শোনো দাদা মন দিয়ে—ইংরি ভঙ্গিতে দেশ পিলু সবাই হাতধরাধরি ক'রে কী যে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে চাঁদের আলোয়! —(গাহিলেন) :

চাঁদিনি রাতে কে গো আসিলে?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে?
মোহন সুরে
ধীরে মধুরে
পরাণ বীণায় কে গো বাজিলে?
হেম যমুনায়
প্রেমতরী বায়
কে ডাকে আমায়—"আয় গো আয়!"
প্রভাত বেলায়
সোনার ভেলায়
কেমনে চ'লে যাবে হায়!
তব সে কূলে
যাবে কি ভুলে
যে-ভালোবাসা বাসিলে!

রাগ : এ-গানটিও সত্যি অতি মধুর মান্‌ছি—কেবল ঐ "ধীরে মধুরে"-তে এ-স্বরবর্ণটি যে তারসপ্তকের কোমল গান্ধারে আরোহণটি হ'ল—

গান : রাগ যদি না করো দাদা তাহ'লে একটা কথা বলি?

রাগ (হাসিয়া) : বিলক্ষণ! আমি কি দুর্বাসা?

গান : বলছিলাম কি দাদা যে, অন্তত আধুনিক গান—বাংলা গান শোনার সময় এই অতিসজাগ বিশ্লেষণবৃত্তিটি ছাড়ো। এতেই আমরা সবচেয়ে ভড়কাই—এই ওস্তাদি ব্যবচ্ছেদে।

রাগ : "ওস্তাদি ব্যবচ্ছেদ" কথাটির টীকা ?

গান : গানে একটা আলো উপ্‌চে পড়ে বলছিলে না এই মাত্র ? গানের সব চেয়ে বড় দান সত্যিই এই "আলো"। তাই নিজেকে ছেড়ে দাও গানালোকের এই ঝর্ণা ধারায়—বেপরোয়া হ'য়ে চলো উধাও ভেসে—প্রতি পদে গানের চূর্ণ তরঙ্গগুলিকে মনের অণুবীক্ষণে ভেঙে চুরে দেখতে গেলে তার প্রবাহে গা-ভাসিয়ে চলার পরম আনন্দটুকু থেকেই যে হবে বঞ্চিত। কারণ গানের ঢেউ—

রাগ : রোসো রোসো—আগে বুঝি গানের ঢেউয়ে গা-ভাসানোর মানেটা ঠিক কী।

গান : হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর একটি প্রবন্ধে সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন যখন দেখতেন যে অনেকেই অপেরায় গিয়ে শ্রুত সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করতে ব'সে যেত। তাই লিখছেন যে, যা কিছু আমরা শুনি তা থেকে অনেকখানি রস আনন্দই আমাদের ভোগে আসে না এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। সেই জন্যে গানের সময় বিশ্লেষণী বুদ্ধিকে আমল দেবার তিনি বিরোধী ছিলেন।*

রাগ (মাথা নাড়িয়া) : হার্বার্ট স্পেন্সার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন একথা জানি—তাই তাঁর মতের মূল্য যথেষ্ট আছে একথাও মানি। কিন্তু তবু আমার মনে হয় না সঙ্গীতরসগ্রহণে বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তিকে এরকম কটাক্ষ করা

* "I remember once remarking to George Eliot how much the tendency to analyse the effects we were listening to deducted from the enjoyment of them : my remark calling forth full assent. Consciousness having at any moment but a limited capacity, it results that part of its area cannot be occupied in one way without decreasing the area which can be occupied in another way."
—*Herbert Spencer* in "The Purpose of Art"

তাঁর উচিত হয়েছে। আদিম মানুষ সঙ্গীতে সাড়া দেয় শুধু আবেগ থেকে —মানুষ যত সভ্য হয় ততই সে চায় শুধু দূরবীণেরই নয়, অণুবীণেরো বিশ্লেষণ। আমাদের রাগসঙ্গীতের বিচারে তাই তো রাগনির্ণয়ের জহুরিপনার এত আদর। ওস্তাদদের যত দোষই দাও না কেন, ভেবে বলো দেখি—তাদের রাগালাপে যে-রস পাও তাতে ক'রে শুধু আবেগেরই খোরাক মেলে, না বুদ্ধিও যথেষ্ট আনন্দ পায়? আর যেখানেই আনন্দ সত্য সেখানেই তো সে স্বয়ংসিদ্ধ, নয় কি?

গান: দাদা, ভুল বুঝলে আমাকে ফের। অগত্যা একটু খুলেই বলি —কী ঠিক্ আমি বলতে চাইছি। উষ্মাকে জল ক'রে দিয়ে একটু মন দিয়ে শোনো লক্ষ্মী দাদা আমার! (থামিয়া চিন্তাবিষ্ট স্বরে): কি জানো দাদা? স্পেন্সার সাহেবের ওকথার সঙ্গে আমিও একমত নই যে, আমাদের চেতনাকে এক জায়গায় নিয়োগ করেছ, কি আর এক জায়গা থেকে তার বিয়োগ হ'য়ে ব'সে আছে। আমাদের চেতনার রহস্য অত সহজ সরল নয়। শুধু শ্রুতিধরদের দৃষ্টান্ত দিলেই একথার চরম প্রমাণ হবে। জানো তো, একজন শ্রুতিধর একই মুহূর্তে বহু কথা, প্রশ্ন, ধ্বনি, ছবি, রেখাবিন্যাস মনে রাখতে পারে? অনেক রাজযোগী এমন কি হঠযোগীও এই চেতনাকে নিয়ে ভেল্কি দেখাতে পারেন নানারকম, বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যার বিন্দুবিসর্গও জানে না। সাধারণ জীবনেও নানাভাবেই চেতনার ব্যাপ্তি রোজই ঘটে। গানেও। মানে, আমরা যখন গান করি তখন একদিকে যেমন ফোটাই কথার ছবি আর একদিকে তেম্নি ঝরাই স্বরের আলো। এ যে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে ভেবেচিন্তে গোনাগুন্তি ক'রে করি তা নয়—এই-ই গায়কের ধর্ম ব'লেই এটা এত সহজিয়া ঢঙে নির্বাহ হয়। কিন্তু স্পেন্সার সাহেবের যুক্তিটি কাঁচা হ'লেও তাঁর সিদ্ধান্তটি শুধু যে পাকা তাই নয়—একেবারে টশটশ করছে।

রাগ: হেঁয়ালি ছেড়ে আগে কহ আর, ভায়া।

গান: কইতে হ'লে একটু ফ্যাসাদ বাধবে যে দাদা।

রাগ: মানে?

গান : মানে, একথার তাৎপর্যটি ঝর্ঝরে ক'রে বলা মোটেই সহজ নয়।

রাগ : তবু !

গান (ভাবিয়া) : তবু যদি শুনতে চাও—একান্তই—তবে একটু গোড়াকার কথায় যেতে হবে। তুমি ধ্যান কখনো করেছ কি ?

রাগ (হাসিয়া) : রাগ মানেই তো ধ্যান ভায়া! আলাপ মানেই কি রাগের একটা ধ্যানপ্রতিমা স্বরমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা নয় ? ৺আবদুল করিম আধনিমীলিত নেত্রে যখন তাঁর আলাপচারীতে—আহা—

গান : জানি দাদা। কিন্তু (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) আবদুল করিম আলাপের যে-আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তাকে অনুসরণ করা তো দূরের কথা বোঝেন ক'জন ওস্তাদ শুনি ?

রাগ : যদি না-ই বোঝেন তাতে কি প্রমাণ হ'ল যে আদর্শটা ভুল ? বাঃ যুক্তি !

গান : আদর্শটা ভুল একথা আমি বলতে চাই নি। আমি বলতে চাচ্ছিলাম—সাড়ে পনর আনা ওস্তাদ এ আদর্শ মানেন না কী জন্যে ?

রাগ : সাড়ে পনর আনা ওস্তাদই সত্যিকার শিল্পী ন'ন বলে। কিন্তু বাকি যে-এক আধ জন আলাপের এই ধ্যানমূর্তি—

গান : জানি দাদা জানি—তাঁদের সাফল্য দিয়েই আলাপের বিচার হবে। The greatness of an art is the greatness of its greatest moment. রাগের যে-পুণ্যমুহূর্তে গুণীর কণ্ঠে এই উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে সেই মুহূর্তই হ'ল রাগরসের মধ্যাহ্ন-লগ্ন। মানি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্যটা তোমার কানে গেলেও মরমে পশে নি। আমি শুধিয়েছিলাম—কেন সাড়ে পনের আনা ওস্তাদ পারেন না রাগের ধ্যানরূপ প্রকাশ করতে ?

রাগ : তুমিই বলো।

গান : তাঁরা ধ্যানের তত্ত্ব জানেন না ব'লে, চেতনার সংহতি-সাধনা করেন নি ব'লে। তাই প্রশ্ন তুলেছিলাম—ধ্যান সাধনা করতে গেলে কী দেখা যায় ?

রাগ : ভাইরে লক্ষ্মণই ব্যাখ্যানা করুন না !

গান (মৃদুস্বরে) : বলতে বাধে দাদা। এসব তো তর্কের কথা নয়—শ্রদ্ধার কথা যে।

রাগ (সাভিমানে) : আমি কি এম্‌নিই ফিলিস্টাইন—

গান : রামচন্দ্র, দাদা, রামচন্দ্র ! দাও ফের পদরজ—অনন্ত নরক থেকে বাঁচতে হবে তো। তোমার শ্রদ্ধা আছে ব'লেই না পেড়েছি এ প্রসঙ্গ। তবু, কি জানো দাদা ? এ-বৈজ্ঞানিক অশ্রদ্ধার যুগে এসব কথা পাড়তেও সঙ্কোচ কেন যে আসে বুঝতেই তো পারো। এসব সত্য উপলব্ধি তো ল্যাবরেটরির বকযন্ত্রের মধ্যে ধরা-ছোঁওয়া দেবে না—কিন্তু সে যাক্, শোনো বলি যা আমার মনে হয়। (একটু থামিয়া) 'ধ্যানের গভীর রস আসে কখন ? না, যখন মন আসে খানিকটা থিতিয়ে—নিস্তরঙ্গ হ'য়ে। তার কত যে দাপাদাপি, দুরন্তপনা, কান্নাকাটি অর্থহীন আবদার—ধ্যান করতে বসতে না বসতে দেখেশুনে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়তে হয় না কি ? মনে হয় না কি বৃথা চেষ্টা—এ-লক্ষ্মীছাড়াকে সাম্‌লানো অসম্ভব ? কিন্তু…ধীরে ধীরে এ-দুদান্তের অন্তরেও নামে আলো। তখন সে আসে শান্ত হ'য়ে। তখন যেন—কী বলব—একটা ঘন পর্দা পাতলা হ'য়ে আসে, মেঘপুঞ্জ আসে রশ্মিময় হ'য়ে, উঁকি দেয় নীলাভ স্বপ্নের আকাশ, অথচ এত প্রত্যক্ষ সে-ভুবর্লোক যেখান থেকে নামে আলো…সে পড়ে—কিন্তু মনের পটে না। মনকে তখন এত স্থূল লাগে, এত বন্ধুর মনে হয়, যে ঐ অলখ অতিথির নাগাল যে সে পেতে পারে না এ যেন চাক্ষুষ করা যায়। এই জন্যেই ধ্যানের একটা মস্ত আকুতি হ'ল মনকে নিরস্ত করা—ঠিক নিরস্তও না, স্বচ্ছ করা। এ-স্বচ্ছতা যখন ধীরে ধীরে আভাময় হ'য়ে ওঠে তখন চেতনার উর্ধ্বতর স্তরগুলির নানান দ্যুতি ওঠে যেন ঝিক্‌মিকিয়ে… অগুন্তি অজানা অনামা চাঞ্চল্যের যবনিকা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দেয় ঐ নীলাভ পদধ্বনিকে—যার অনুকম্পনে অন্তরের অন্তঃপুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ছেয়ে যায়। মন কি পায় সে-গহনের দিশা ? পেতে পারে কখনো ? (আরো মৃদু স্বরে) অথচ…অথচ…কী ক'রে বোঝাই

এ-আনন্দের অস্ফুট ব্যঞ্জনাকে…অথচ যে-মনকে আমরা এত আদর করি …যখন সে হয় লাঞ্ছিত…লজ্জিত…উপশান্ত—তখনই মেলে আনন্দের আভাস…ফোটে শান্তির কনককান্তি। (থামিয়া) গানের বেলায়ও ঐ কথা। সত্যিকার, মানে গভীরতম গানানন্দ হ'ল ধ্যানানন্দ। কিন্তু এ-ধ্যানানন্দ আমাদের কাছে ধরা দেয় না যতক্ষণ মন বাদ সাধে —যতক্ষণ বুদ্ধি তার হাজারো দাবিদাওয়ার ঘূর্ণায় আমাদের গহন-অন্তর-বাসিনীর দরদী দৃষ্টিকে করে আবিল। তাই গানে পরম আনন্দ পাবার জন্যে মনকে আগে চাই নিরস্ত করা, স্তব্ধ করা। নইলে গানের অবান্তর যত সব স্পন্দন রচে পাকের পরে পাক, বুদ্ধি সেই বিপাকে প'ড়ে বলে শোভানাল্লা, আর আমরা ভাবি এই-ই বুঝি গানের আনন্দ।

রাগ (কি বলিতে গিয়াই আত্মসংবরণ করিলেন)

গান: কিন্তু এ-ভাবনা যে ভুল তা বুঝতে বিলম্ব হয় না যদি বীণাপাণির কৃপায় গানের রসলোকের আভাষ একবার পাওয়া যায়। তখন দেখা যায় যে আমাদের মনের বিশ্লেষণী বৃত্তি দিয়ে গান থেকে যে-আনন্দের খোরাক আমরা সচরাচর সংগ্রহ করি সে-আনন্দ গানের রসাবেশের পরমানন্দের তুলনায় বাহ্য—অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু মুস্কিল এই যে ও বাহ্য এবং অকিঞ্চিৎকর হ'লেও বহুপ্রশ্রয়ের ফলে শেষটায় তুচ্ছই হ'য়ে দাঁড়ায় অতিকায় বাধা—রুখে উঠে গানের আন্তর আনন্দভোগের ঘাঁটি দাঁড়ায় আগ্‌লে। মায়া তো এরই নাম। পথ ভোলায় ও। তার মানে নয় যে ও নেই। ওর নিজের এলাকায় ও আছেই। কিন্তু ওর চৌহদ্দি পেরুলেই দেখা যায় কেন ওর নাম হ'ল মায়া, কী ক'রে ও সত্যকে রেখেছিল আচ্ছন্ন ক'রে। গানের নিভৃতলোকের ধ্রুবলোকের চাবি আছে এই ধ্যানী অন্তরের হাতে। মন যতক্ষণ শান্ত না হয় ততক্ষণ এই চাবির দিশা মেলে না—কাচকে সে কাঞ্চন ব'লে বুঝিয়ে দেয়—কেন না মনের এই-ই হ'ল ধর্ম—উকিলি স্বভাব। তাই বিশ্লেষণী বৃত্তি সভ্য মানুষের একটা সম্পদ একথা মেনে নিলেও বলা চলে যে সবচেয়ে বড় গ্রহণশক্তি—ধৃতিশক্তি—ওর তহবিলে নেই। কারণ সবচেয়ে বড়

অঙ্গীকার যে করে সে হ'ল আমাদের অন্তর—তাকে আত্মাই নাম দাও বা পুরুষই নাম দাও বা যে-নামই দাও।

রাগ : কিন্তু তুমি কি বলতে চাও যে গানে বেশি লোক এ-ধরণের সাড়া দেয় ? এত শত বুঝবে কজন শুনি ?

গান : ঐ তো দাদা। এ যে আদবে বুঝবার ব্যাপারই নয়। বুঝে সুঝে যে-ধন মেলে তার জাতই আলাদা। "যে পারে সে আপনি পারে সে ফুল ফোটাতে।" ভেবেচিন্তে শুধু যে বড় গুণী হওয়া যায় না তা-ই নয়—বড় গ্রহীতা-ও না। গুণী গান করে তার মনে কথার আকাশে সুরের আলোর ঢল নামে ব'লে—তাই না এত সহজে সে ধ্বনির রং ফোটায় কাব্যের চিত্রলোকে। ঠিক্ তেম্নি, যে সত্যিকার গ্রহীতা, সত্যিকার দরদী সেও সমান সহজে গুণীর মূর্ত সৃষ্টিকে দেখে, বলে :

আহা ! কী রূপ হেরিলাম কালিন্দী কূলে
অতি অপরূপ কদম্ব-মূলে !

রাগ : কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলে কই ? আমি শুধিয়েছিলাম এরকম গ্রহীতা মেলে কজন—দিনদুনিয়ায় ?

গান : মুষ্টিমেয় তো বটেই। গুণীই কি মেলে ঝাঁকে ঝাঁক দাদা ? চণ্ডীদাস বড় দুঃখেই বলেন্ নি কি—সত্যিকার রসিক "কোটিতে গোটিক হয়" ? কিন্তু আমি অতটা মনমরা হ'তে চাই না। কারণ কোনো শিল্পেরই গভীর আনন্দের ইতি করা যায় না—যার যে-রকম গ্রহণ ক্ষমতা সে সেই অনুপাতেই তাকে গ্রহণ করে—বোধে বোধ করে। পরমহংস-দেবের সেই গল্প মনে পড়ে ?—কোহিনূর দেখে বেগুনওয়ালা দাম হেঁকেছিল দশটা বেগুন, কাপড়ওয়ালা—দশটা কাপড়, কিন্তু জহুরি হাঁকল দশ লাখ। যার যেমন বোধশক্তি। আমি তোমাকে ব্যথী চেয়েছিলাম আমার এই ব্যথার যে, সমজদার যাদেরকে বলো তারাই দেখবে প্রায় হয় সবচেয়ে বেরসিক, পণ্ডিতমূর্খ। কারণ তাদের দৃষ্টির ফোকাসই বিগড়ে গেছে, তাই তারা বাহ্যকে মনে করে কেন্দ্রীয়, গৌণকে মনে করে মুখ্য, দেহকে মনে করে আত্মা। আমি সত্যি বলছি দাদা, আমি বহুবারই গভীর ভাবে অনুভব করেছি যে একটি গানের গভীরতর রসে অনেক

কিশোর কিশোরী ঢের বেশি সহজে সাড়া দিতে পারে অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ কদরদানের চেয়ে। এ-সব সময়ে সরল অনভিজ্ঞরাই যে জেতে তার কারণ নিজেদেরও অজান্তে তারা গান থেকে চায় এমন আনন্দ-পাথেয় যা ভূয়োদর্শীদের কল্পনারও অতীত। এমন কি বালক বালিকাকেও আমি ভালো গান শুনে এমন তন্ময় হ'তে দেখেছি যে-তন্ময়তা প্রবীণ সমজদারদের অতুরীয়ত্ব। এ অসম্ভব সম্ভব হয় শুধু এই জন্যে যে সরলপন্থীরা গানকে মন দিয়ে বুঝতে চায় না—বরণ ক'রে নেয় প্রশ্নহীন সহজিয়া ঢঙে। জানি এই সহজিয়া হওয়াটা আদৌ সহজ নয়—কিন্তু আদর্শকে এই দিকেই খুঁজতে হবে—এই-ই হ'ল আমার প্রতিপাদ্য।

রাগ: কিন্তু—(বলিয়াই ভাবিতে লাগিলেন)

গান (চিন্তাবিষ্ট স্বরে): তাই—দুঃখের কথা বলব কি দাদা—আমি আজকাল যখনই গাইতে বসি এদিক ওদিক চেয়ে দেখি ভয়ে ভয়ে অমুক অমুক সমজদার আছেন কি না যাঁরা বলবেন বাহবা কী ধৈবতে স্থিতি, কী রেখাব থেকে পঞ্চমের মিড়, কী দানার জৌলুষ! (থামিয়া) সলজ্জে স্বীকার করি যে, এক সময় ছিল যখন গানের আসরে এঁদেরই আশাপথ চেয়ে থাকতাম। কিন্তু তখন গানে প্রায়ই আমার লক্ষ্য হ'য়ে উঠত বাহাদুরি দেখানো। স্পেন্সার সাহেবের ভাষায়: "The mischief originates in the performer's preoccupation with self. The dominant feeling is not love of the music rendered but desire for applause which brilliant rendering will bring." বিশেষ ক'রে গানের আসরে এ-ধরণের প্রশংসা-কণ্ডূতি বা সমজদারিয়ানায় তো মহতী বিনষ্টিঃ।

রাগ: বিশেষ ক'রে গানের আসরে কথাটির নিহিতার্থটি কী, বলবে খুলে?

গান: তোমাদের রাগসঙ্গীতের আসরকে ঠেশ দিয়ে বলি নি ওকথা দাদা, বিশ্বাস কোরো। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের কণ্ঠবাদনে বা যন্ত্রসঙ্গীতে রাগবিশুদ্ধি যখন একটা মস্ত আদর্শ ব'লেই অকুণ্ঠে মেনে নিলে—(যদিও আমি মেনে নিই নি, মনে রেখো—কেন না

আমি মানি না রাগমিশেল হওয়ায় এযুগেও মহত্ত্ব বিনষ্ট হয়)—তখন এ-ধরণের রাগ-সচেতনতার একটা মানে হয়ত তোমাদের কাছে থাকতেও পারে—মানে, তোমাদের প্রবুদ্ধ রসভোগের কাছে সত্য হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু তর্কের খাতিরে রাগের বেলায় একথা যদি মেনেও নিই তাহ'লেও আমার মূল বক্তব্যের যাথার্থ্য এতটুকুও কমে না—অর্থাৎ "গান"-এর বেলায়। কেন না রসালতা ছাড়া অন্য কোনো পরিচয়পত্রই যার নেই, সে কী করবে এ-ধরণের দস্তুরবাজি নিয়ে? রাগের অতি-বিকশিত মণিমাণিক্যদ্যুতির মেলায় ঐ কদরদান জহুরিপনার একটা সার্থকতা হয়ত থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু গানের চিত্রলোকে তাঁদের সার্গম-বৈদগ্ধ্য নিয়ে কি আমরা গায়ে দেব, না পেতে শোবো? তাঁরা আসবেন মস্ত মস্ত রথী—মস্ত মস্ত বুঝদার—সবই মানি, কিন্তু সনাক্ত করবেন কোন্ চেনা খাঁচার অচিন পাখিকে বলো দেখি? সেই বহুবিখ্যাত বাউলের গানে আছে না (সুর করিয়া):

কমল বনে কে পশিল সোনার জহুরি?
নিকষে ঘষয়ে কমল—আ মরি মরি!

রাগ: এতটা সঙিন অবস্থা না কি সমজদার জহুরিদের?

গান: না তো কি? অনুকম্পা ক'রে আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো দাদা—কারণ এ দরদের কথা, তর্কের নয়। তোমার এই ভারিক্কি কদরদানদের কী দেখাব আমি—কী দেখাতে পারি? রূপ ও প্রেমই যার সম্বল—আমীর ওমরাওকে নিয়ে সে বসাবে কোন্ চুলোয়? যে চায় আন্তর আনন্দের আরাধনা সে জরিকে নিয়ে টাল সামলাবে কী ক'রে?—কী পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে করবে এ-হেন মনস্বী অতিথির পরিচর্যা? তাঁর কাছে সে মরমের কথা কইবেই বা কোন্ সাহসে? "কইতে যে মানা"—বাউল কবি বলেন নি কি—"দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না"?

রাগ: বলেছেন বুঝলাম ভায়া, কিন্তু কোন্ দরদী কষ্টিপাথরে তাহ'লে তোমার কমলকে ঘষা হবে সেটা বলতে পারো?

গান: তা জানি না দাদা। আমি জানি না কষ্টিপাথরই বা কোথায়, চরম বিচারকই বা কে। তাই বলব কী ক'রে কোথায় তাঁকে

মিলবে ?—এমন কি বিপুলা পৃথ্বীতে কোনো না কোনো সময়ে সমানধর্মী মিলবেই এ-অভিমানও আমার নেই। আমি চাই ··

রাগ : কী ?

গান : কী চাই তা-ই কি জানি দাদা ? শুধু জানি যে, একটা ঢেউ আমাকে উতলা করে, আমি গান গাই গান রচি। একটা স্বর আমাকে বলে : নিজের কাছে খাঁটি থেকো, ফলাফলের চিন্তা ছেড়ে চলো যেখানে এই সৃষ্টির তাগিদ প্রকাশের প্রেরণা তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাবে : "To thine own self be true"—এই খাঁটি থাকতে গিয়েই আমি দেখেছি—একবার নয়, বাররার—যে, তথাকথিত সাড়ে পনর আনা সমজদাররাই আমার পর—সরল দরদিয়ারা, মরমী সহজিয়ারাই আমার আপন জন। সমজদারদের কাছে গাইবার সময়ে তাই তো আমি নিজেকে ভুলতে পারি না খুলতে পারি না আজকাল—নিজের হৃদয়ের ঢেউয়ের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারি না ! এইসব কারণে একলা গাইতেই আজকাল সত্যি ভালো লাগে। এ শুধু আমার আত্মজীবনী নয় দাদা—আমি বলতে চাইছি, এই-ই হ'ল প্রেমসম্বল রূপসম্বল গানের আকুতি। তবে শ্রোতার কাছে গাইতেও লাগে ভালো, কিন্তু ঐ যে বললাম, এইসব ডাকসাহিটে জহুরিদের কাছে না, তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্যেনদৃষ্টি আমীরী সমজদারদের কাছে না—তবে হয়ত বোঝাতে পারছি না ঠিক—

রাগ : বেশ পারছ ভায়া—মা ভৈঃ। তোমাকে আর যা-ই মানাক না কেন বৈষ্ণব দীনতা যে মানায় না একথাটি দয়া ক'রে মনে রেখো। কেবল এ সম্পর্কে আমার একটা খটকা লাগছে—

গান : যথা ?

রাগ : ঐ আমীরী সমজদারদের অপরাধটি ঠিক্ কোন্ খানে।

গান (করুণ হাসিয়া) : এ যে অপরাধের কথাই নয় দাদা—এ শুধু—কী বলব—দেওয়া নেওয়ার কথা। সব কথা কি সবার কাছে বলা যায় ? না, সব সুর সবার কানে পৌছয় ? এ-ও কি তুমি জানো না ? না, মানো না ?

রাগ (চিন্তিত) : জানি তো বটেই—খানিকটা মানি-ও, তবে—

রোসো রোসো—আমার বক্তব্যটাই বুঝি গুছিয়ে বলা সোজা? মানে, আমি বলতে চাইছিলাম যে, প্রশ্নটা তো আর বাহু আমীরী বাদ্‌শাহী তক্‌মা নিয়ে নয়। প্রশ্নটা হ'ল—সমজদার বলব কাকে? যার কাছে মনের কথাটি ফোটে তাকে—না, তাকে যে অনুক্ষণ ওৎ পেতে রইল—তোমার পান থেকে চুনটি খসেছে কি ধরেছে তোমার টুঁটি চেপে?

গান (করুণ হাসির সঙ্গে এবার ঈষৎ ব্যঙ্গের আমেজ): তুমিই বলো না দাদা বুকে হাত দিয়ে—সমজদার ব'লে সভায় আসরে যাদের জয়জয়কার তারা সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে এই শেষের কোঠায়ই পড়ে কি না? শতকরা নিরানব্বইটা না হোক—অন্তত নব্বইটা সমজদারের মধ্যে কী দেখতে পাও তুমি—না হয় একবার আমার কানে কানেই বললে—আহা, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙব না গো ভাঙব না কথা দিচ্ছি।

রাগ (হাসিয়া): ভাঙলেও ক্ষতি নেই, কারণ সমজদারিয়ানার ট্রাজিডি যে কেবল তোমার জীবনেই ঘটেছে তা নয় ভায়া—আমার এই সনাতন পাঁজরাও তারাই ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে—কবুল করছি। তবে আমাদের নাকি বুড়ো হাড়েও ভেল্কি খেলে তাই এখনো আছি টিঁকে।

গান: তাহ'লে বলি শোনো ব্যথার ব্যথী দাদা আমার—এতক্ষণ ভরসা পাই নি—ভেবেছিলাম কেন মিছে অরণ্যে রোদন? কিন্তু তুমিও যখন "চিরসুখীজন" নও তখন "ব্যথিত-বেদন" বুঝবে ব'লে ভরসা হচ্ছে। শোনো তবে। (একটু থামিয়া) কিছুদিন আগে সুরসাগর শ্রীহিমাংশু দত্তের একটি অপরূপ সুরে আমি একখানি ছোট্ট গান বেঁধেছিলাম—রাগটির "ভয়ালগুঞ্জ" না "কৃপালগুঞ্জ" জাতীয় একটা দারুণ নাম—ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু নাম যা-ই হোক এর গন্ধ শেক্স-পীয়রের ভাষায় "গোলাপ-বিনিন্দিত"। গানটি এই (গাহিলেন):

তব চিরচরণে
দাও শরণাগতি।
এসো ফুল সারথি,
আলো ধরিতে বনে।

আমি চাহি গভীরে
তব অকূল স্বনে,
বরি' তুফান-তীরে
ধ্রুব- তারা-স্বপনে

তুমি	জানো তো প্রিয়,	এসো	ছায়া-পাথারে
মোর	প্রাণ-তুরাশা :	দলি'	মায়া-আঁধারে
যাচি	শুধু অমিয়	লহ	তুরভিসারে—
তাই	বহি পিপাসা।	তব	দুখ-বরণে।

I seek at thy feet's everlasting refuge, Friend,
My final self-surrender. Shower thy grace
Of fadeless rose-flush on the wilderness
Of my heart-lost life : with guiding gleams descend.

My deep of hush still calls thy vibrant deep
And fills with echoes of thy shoreless song.
Storm-islanded, I dream thy starry throng,
In wavering hours their haloed pledge to keep.

Sweet, know thou must that in my soul I ache
For naught else but thy bounteous clouds' serene
Boon of ambrosial rain, soft, nectarine :
With lesser loves my thirst I may not slake.

Cleave, Light, the waste of shadow-sea, awake!
Slay the illusive glooms, dispel their blights!
Exalt me to thy viewless dizzy heights
Undaunted by the pains borne for thy sake.

জানি না কোন্ এক অরুণলগ্নে হিমাংশুকুমারের অন্তরে এ-অপূর্ব সুরটি ফুলের মতনই উঠেছিল ফুটে। এ-গানটি শ্রীমতী হাসির কাছে রোজই শুনতাম। কী ভালোই যে লাগত! মনে পড়ত বহুবৎসর আগে লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে বালক চন্দ্রশেখরের মুখে অপূর্ব তুলসীদাস ভজন গান শোনার সেই শিহরণ—সেই "ভজমন রামচরণ দিনরাতি"—আল্লা বন্দে

থাঁর সেই দুঃসহ গমক-কণ্টকিত হুহুঙ্কারী যন্ত্রণার পরে। আহা, মনের সব কাঁটা যেন গোলাপ হ'য়ে ফুটত তার অনিন্দ্য শিশুকণ্ঠের অবর্ণনীয় সুরে ভাবে তালে তানে! ঠিক তেম্নি আনন্দ পেতাম শ্রীমতী হাসির মুখে এই গানটি শুনতে শুনতে। তার ছোট্ট কণ্ঠস্বরের দরদী মিড়ে দোলায় ভাবে আলো উঠত ফুটে—দুরভিসারের ব্যথার আরতি যেন তার মূর্ছনায় সত্যিই উঠত বেজে। এ-হেন গান একদা একজন মস্ত সমজদার শুনলেন। আর যাবে কোথায়? আমার পানে এম্নি নজর হানলেন যে আমি সীতাদেবী হ'লে পাতালে প্রবেশ না ক'রে আর মুখ দেখাবার পথ থাকত না। কিন্তু কী ক'রে তাঁকে বোঝাব বলো কেন এ-সুরে আমার হৃদয়ের তন্ত্রী উঠল বেজে—যখন তাঁর হৃদয়তন্ত্রী রইল পাথরের মতন ঠাণ্ডা—স্থাণু? অনুভব কি চালাচালি করা যায় দাদা—না, যার হৃদয় দুলল আর যার হৃদয় দুলল না এ-উভয়ের মধ্যে ভাবপ্রকাশের কোনো সেতু থাকতে পারে রসের জগতে? যাক তবু কোনোমতে স'য়ে ছিলাম গাঢাকা হ'য়ে—এম্নি সময়ে আর একজন আরো মস্ত সমজদার হঠাৎ এ-গানটি শুনলেন। শুনতে শুনতে, কেন জানি না, তাঁর মুখের ঘনঘটা গেল কেটে, তিনি ভুরু নাচিয়ে একমুখ কুণ্ডলীকৃত ধূম্রোদ্গারণ ক'রে হল্লা ক'রে উঠলেন: "বাহবা! মধ্যমে কেয়া খরজ-বদল! সাবাস!"

রাগ (হাসিয়া): তারপর?

গান: তারপর আর কি? একেবারে—"শেষ খড়"—শাকের আটিতে পপাত চ মমার চ। কারণ সত্যি বলছি দাদা, বিশ্বাস কোরো এ-বাহবা না দিয়ে তিনি যদি আমাকে বলতেন 'নিকালো'—তাহ'লে হয়ত শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে টাল সামলাতে পারতাম। কিন্তু এ-সুরটির মধ্যে সুরকার যে গভীর প্রেমের আলো ফুটিয়েছেন ঐ মধ্যমে খরজ-বদলের মুখর স্বীকৃতির চেয়ে বড় অপমান তার আর হ'তে পারত কি? তুমিই বলো দেখি?

রাগ: কিন্তু তাঁর তো দোষ ছিল না—সত্যিই তো খরজ-বদল হয়েছে এ মালগুঞ্জ মিয়ামল্লারে—

গান : জানি দাদা জানি। আর তাই তো আমার দুঃখ। তিনি ধূম্রলোচন হ'য়েও বাহবা দিয়েছিলেন যে ভালো ভেবেই এ-ও মানি। কিন্তু এ কেমন জানো? বলি নি গান হ'ল গুণীর বড় ব্যথার জায়গা? রাগালাপে স্বরকৃতিত্ব তালকৃতিত্বের একটা বনেদি স্বাজাত্য হয়ত থাকলেও থাকতে পারে, তাই তার স্বীকারে যদি শুনি—"বাঃ এ-দরবারিতে কোমল ধৈবতের দুল্‌কি চাল কী খাসা লজ্জৎ আনল!" তখন তত বাজে না। কিন্তু বাংলা গান দরবারি কানাড়ায় রচিত হ'লেও দরবারি কানাড়া তার পক্ষে বাহ্য। সুরে ও কাব্যে প্রেম হ'য়ে ফুটে ওঠাই হ'ল তার আসল কথা—অন্তরের আকুতি—এ-আকুতিটি ফুলের গহন মনের মখমলের মতন পেলব সুকুমার—ধরা-ছোঁয়া-যায় না। এর সত্যি সমজদার—এক প্রেমিক—আর কেউ না এ বিপুলা পৃথ্বীতে। আর—

রাগ : আর—?

গান (আবিষ্ট সুরে) : একটা স্মৃতির আকাশে হঠাৎ মনটা যেন পাখা মেলেছিল—ক্ষণিক।

রাগ : আহা বলোই না ভাই।

গান (চিন্তাবিষ্ট) : বলা বড় সোজা নয় দাদা—ঠিক যে-রঙটিতে মন আমার সেদিন রঙিয়ে উঠেছিল তার ঠিক বর্ণনা করতে পারা—

রাগ : আহা পারবে রংরাজ, পারবে। অপ্রকাশলোকের ছায়া-মন্দিরে কথা লুকিয়ে থাকে বটে মন্ত্র হ'য়ে, কিন্তু নামে সে—আরাধনায়।

গান (আরো আবিষ্ট সুরে) : সেদিন ··· কি জানি কেন ··· মনটা দুলে উঠেছে কি এক নাম-না-জানা ভাবের ঢেউয়ে। ··· বেলা ব'য়ে যায় ··· পুরবীর-সঙ্গে-মেশানো একটা হাওয়াঈ গিটারের কান্না-ছোঁওয়া মিড়ে কি যে একটা পথহারা আবেশের ঘনিমা জেগে ওঠে মনের ছায়াকুঞ্জে—বেরুলাম এম্‌নি লক্ষ্যহারা ভাবে।

একটা ফুলগাছের ঝাড় ··· করবী ফুল ফুটেছে স্তবকে স্তবকে রাঙা হ'য়ে। ভিজে ঘাসের বিছানায়ই সটান শুয়ে পড়লাম ··· কত কী ভাব যে ভিড় ক'রে আসে ··· কত আধহারানো ফিরেপাওয়া আবার তখনি-মিলিয়ে-যাওয়া স্মৃতির সুরভি ··· কিন্তু সব জড়িয়ে হৃদয়ের কোথায় একটা

গাঢ় অথচ স্বচ্ছ বেদনা। ঐ ··· সেই গিটারের মিড় ·· কবে শুনে-ছিলাম একটি ভুলে-যাওয়া গানের সঙ্গে ··· গায়িকার কোমল স্নেহস্নিগ্ধ মুখখানিও মনে প'ড়ে যায়। থেকে থেকে সেই পূরবীর কোমল রেখাবের রেশ ভেসে আসে কানে ··· এত স্পষ্ট! ··· আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকি স্থিরনেত্রে: তৃতীয়া ··· একটুক্‌রো বাঁকা চাঁদের আঁকা তরী। নিচেই কয়েকটা হাল্কা মেঘের ঢেউ চলেছে পাল তুলে ··· তারাটি এক একবার চায় তাদের পানে, এক একবার চাঁদের পানে। চাঁদ স'রে স'রে যায়। কোথা থেকে ভেসে আসে—হাস্নাহানার এক ঝলক গন্ধ। ··· অম্‌নি রক্তের মধ্যে সেই বেদনাটা যেন ফের উদ্বেল হ'য়ে ওঠে—দম্‌কা-হাওয়ায়-শিউরে-ওঠা সান্ধ্য হ্রদবক্ষের মতন।

সহসা ··· কী ক'রে ঠিক আঁকব ছবিটা ··· বেদনাটা যেন মোড় ফিরল তাপ থেকে শান্তির পথে ··· স্নিগ্ধ হ'তে হ'তে যেন সূক্ষ্ম হ'য়ে রূপান্তরিত হ'য়ে যায় ··· ঠিক জল যেমন বাষ্প হ'য়ে পাখা পায় না?—আমার বোবা বেদনাও যেন তেম্‌নি পায় আবেগের লঘুপর্ণ: ভাসতে ভাসতে পৌঁছয় ঐ তারাটির পরিমণ্ডলে যেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ঢলে কী বলব ··· উত্তর ··· না ··· সাড়া ··· না—তার চেয়েও বেশি একটা স্নেহঘন স্বপ্ন-আনত ঝঙ্কার ··· একটা রেশ! ··· অম্‌নি বেদনার মধ্যে বেজে ওঠে একটা মৃদুগুঞ্জনধ্বনি—কথায়-সুরে-মিশেল। উথ্‌লে ওঠে একটি গান এক শান্তির নির্ঝরের মতনই—ঊর্ধ্ব-উৎসারে। সুরও গুনগুনিয়ে আসে সেই সাথে ··· কোত্থেকে জানি না — তবে তার চারদিকে ঐ হাওয়াঈ গিটারের আবহ ঘিরে রয়েছে দুটি নীল চোখের আলোভরা—এ স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু সুরটার ভঙ্গি যে কোত্থেকে মূর্ত হ'য়ে ওঠে পাই নে তো তার দিশা। তবু এত নতুন লাগে ··· পরে ঐ একই ঢঙের সুর ও ছন্দের তটে ইংরেজি ভাবটির ঢেউও এসে লাগে ·· আর মনে হয় যেন সাগরপারের সেই অর্ধবিস্মৃতা সুরে ভাবে প্রেমে আমার ভোলা মনেও নিরন্তর জাগরূকই ছিল, আছে ··· তবু তাকে ভুলি ··· অথচ কেমন ক'রে—কোন্ নিষ্ক্রমণের পথ দিয়ে যে সে ফিরে ফিরে আসে ··· কী বলব এ-অনুভূতিকে?

রাগ : অনামী।

গান : সত্যিই তাই। কারণ ভেবে দেখ সেদিনকার পটভূমিকাটি : উপরে আকাশের কৃষ্ণাম্বরীতে নানারঙা তারার চুম্‌কি ঝলমলিয়ে উঠেছে ...নিচে একটি হৃদয় নয়নের অধরে সেই উজাড়-করা সুষমা পান করতে চাইছে অথচ সে উর্দ্ধাকাশের স্বচ্ছ ভৃঙ্গারটি ছুঁতে গেলেই যাচ্ছে মিলিয়ে ..ফলে অতৃপ্ত পিপাসায় আকণ্ঠ উঠছে শুকিয়ে...জাগছে অচিন প্রার্থনা অনামা আশাপূর্ণার কাছে...এমন সময়ে সাড়া দিল কে—কী সুরে? এ-সুরকে এ-দেশী বলা যায় না পুরোপুরি...অথচ কত রাগের ছায়াপরিমল যে এর পাপড়িতে পাপড়িতে ছড়ানো, মাখানো, জড়ানো ...শুধু কথায় নয়—ভাবে রসে ব্যঞ্জনায়...এ-কে গানের কোন্ শ্রেণীতে ফেলব বলো?

রাগ (মৃদু হাসিয়া) : না গাইলে এ-প্রশ্নের উত্তর দিই কী ক'রে' বলো দেখি?

গান : ওহো—গানটি যে আদৌ গাওয়াই হয় নি—দেখ, ভুলেই গেছি। আচ্ছা শোনো—(সহসা থামিয়া)—কিন্তু এ বৈদেশিক ঢঙে কি তুমি ঠিকমত সাড়া দিতে পারবে দাদা?

রাগ (সব্যঙ্গে) : গীতার কথা ভাই মিছেই আওড়াও তুমি— "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—আমার সাড়া দেওয়া-না-দেওয়ার কথাই এখনো সব আগে মনে হয়—পরমহংসদেবের কথা মনে পড়ে—টিয়া দাঁড়ে ব'সে খাসা রাধাকৃষ্ণ বুলি কপ্‌চায়—কিন্তু অন্তর্টিপুনি দিলেই করে ক্যাঁ ক্যাঁ। তোমার অতুলপ্রসাদেরই একটি গান—বিশুদ্ধ ভৈরবী রাগিণীতে সেকেলে আমিও গাই শ্রোতাবিচার না ক'রে :

"আছে তোর যাহা ভালো ফুলের মতন দে সবারে।"

গান (কুণ্ঠিত) : আমি দাদা—

রাগ : রাগ কোরো না ভাই একটু হয়ত ঝাঁঝ এসে গেছে আমার। আমি যে তোমার কুণ্ঠা বুঝি না তা-ও নয়। তবে কি জানো? বুড়ো হয়েছি তো—আমি বার বার দেখেছি যে আমাদের মধ্যে সত্য যা কিছু থাকে কোনো না কোনো উপায়ে আপনাকে বিলিয়ে অমর হয়ই

হয়। হয়ত প্রত্যাশিত পথে হয় না—যেভাবে আমরা চাই সেভাবেও ঘটে না, তবু অঘটনই নিত্য ঘটে এ-অনিত্য জগতে। তাই বলছিলাম যে তোমার যা ভালো আছে ঐ নির্ভাবনা ফুলের মতনই দাও সবাইকে—কে সু-গ্রহীতা কে কু-গ্রহীতা এসব কূটতর্কে পড়া কেনই বা? মনে আছে দিলীপকে রোমাঁ রোলাঁ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—সে আমাকে দেখিয়েছিল—যে, শিল্পীর সৃষ্টি হ'ল বপন—জন্মদান: জন্মদাতা কি জানেন তাঁর সন্তান ঠিক্ কী রকমটি হবে? দিলীপকে তিরস্কার ক'রে তিনি লিখেছিলেন আরো: তোমার যদি ভালো জিনিষ দেবার থাকে দুহাতে বিলিয়ে যাও—জেনো এ-ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই লুপ্ত হয় না—তোমার অঙ্কুরের মর্মকোষে যদি শুভশক্তি থাকে তবে তার কিছু না কিছু ফলবেই, যদি আলো থাকে কোনো না কোনো স্ফুলিঙ্গ জ্বলবেই। তাই—তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উজ্জ্বল প্রতীতির ভাষায় লিখেছিলেন যে, সুন্দর গানের আলোয় মন্ত্রের মতন ফসল ফলেই, কিন্তু ভগবান্ যেখানে চান সেখানে: আমরা যেভাবে চাই সেভাবে না—তাই আমাদের কাজ নয় অধিকারী নির্বাচন করা: আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু গেয়ে যাওয়া।*

গান (লজ্জিত): ধমকটা লাগসৈ হয়েছে দাদা, মানছি। তবে হয়েছে কি জানো? ঐ তথাকথিত সমজদারদের বেসুরো বাহবাতেই আমাকে এত অভিমানী করেছে—বেদরদীর সুরেলা তিরস্কারেও এত বাজত না, কিন্তু আমার এ-ব্যথাটাকেও হয়ত তুমি—

---

* "On n'écrit pas une oeuvre d'art, on ne crée pas, pour *imposer* sa pensée : on crée, pour la *semer*. Toute création est une *génération* : celui qui engendre ne peut savoir le fils qui sortira de lui. Il repand la vie . . . . . Si donc vous avez en vous de belles, de puissantes pensées, versez-les à pleines mains. . . . Rein ne se perd dans la nature. De ce que vous avez semé—si c'est de bonne sémence—quelques grains lèveront toujours : quelques étincelles s'allumeront. . . . L'illumination du beau chant, comme du mot inspiré, tombe où il pleut à Dieu, et non pas à nous. Notre rôle n'est pas de choisir les élus : notre rôle est de chanter." (১৯২২ সালের লেখা চিঠি)

রাগ (স্নিগ্ধকণ্ঠে) : না ভাই না—এ আমিও বুঝি, বিশ্বাস কোরো। সত্যিই দরদের গভীর জায়গায় মুখরতার এতটুকুতেও মন ঘা খায়। মনে পড়ে সেই রাজা ও জড়ভরতের গল্প ?

গান : না—কী ?

রাগ : মহাপণ্ডিত সমাধিসিদ্ধ জড়ভরতকে রাজা তো না জেনে বাহাল করলেন পাল্কিওয়ালার পদে। হঠাৎ দেখেন একটি পাল্কিবেহারা কাঁধ বদলাচ্ছে। রাজা মিষ্টকণ্ঠে বললেন : "অপি কিং স্কন্ধে বাধতি ?" "কাঁধে কি বাধছে ?" জড়ভরত ব'লে উঠলেন : "ন বাধতি তথা স্কন্ধে যথা বাধতি বাধতে।" অর্থাৎ "কাঁধেও তত বাধছে না যত বাধছে আত্মনেপদী 'বাধতে'-ক্রিয়াপদকে তোমার এই দারুণ পরস্মৈপদী 'বাধতি'-ক্রিয়াপদে ব্যবহার দেখে।" রাজা তো থ—নেমে প্রণাম ক'রে ক্ষমা চাইলেন পণ্ডিতের কাছে।

গান (প্রীত) : বড় সুন্দর গল্প দাদা···আর সত্যিই এইখানেই না যত ভুলবোঝাবুঝি মনকষাকষি শেষটায় প্রাণ-নিয়ে-টানাটানিও। ভাষার অপব্যবহারে কবির ব্যথাকে বৈজ্ঞানিক বুঝবে কী ক'রে ? শুনেছিলাম চীনদেশে একজন বিখ্যাত ফুলদরদী ফুল চয়ন করলে এম্নি সত্যিকার ব্যথা পেতেন—বলতেন ফুলের গায়ে হাত দেওয়া ম্লান-মলিন মানুষের সাজে না। অথচ সাধারণের কাছে একথা তো শুধু কথার কথা —হয়ত এ-কে তারা অহঙ্কারের অভিযোগেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

রাগ : তা করুক ভাই—তবু ব্যথার বিকাশেই সুকুমার বোধেই অনুভবের সত্যিকার বিকাশ···তাই তো গান আমরা চাই—কথার প্রেমে সুরের আলোয় যে-শিহরণ তুমি এইমাত্র ঝরঝরিয়ে দিলে এতে প্রাণ কেঁপে ওঠে তো ঐজন্যেই—যদিও এ-আবেদন যার কাছে পৌঁছল না তাকে আর কী বলা যাবে ?—

গান : শুধু এই যে "ভাই আমার ব্যথার ব্যথী তুমি নও—তাই আমার গান তোমার জন্যে নয়—আমার গান কেবল তারই জন্যে যার হৃদয় এ-রসের রসিক।" বীটোভ্নের কথা মনে পড়ে : "Vom Her-

zen···zu Herzen"—হৃদয় হ'তে উথলি' গান হৃদয়ে করে মাল্যদান।

রাগ: এই-ই হ'ল ঠিক কথা—সব বড় প্রেমই চায় প্রেমীর অন্তরেই নীড় বাঁধতে—তার জন্যেই যে সে ফুটে ওঠে। তাই তুমি গাও ঐ তারার গান—আমি শুনি। হোক না সে-ডালায় সাগরপারের সুরের ফুল-মেশানো···আমার প্রাণে ওর গন্ধ ওর ছোঁয়াচ যখন লাগল তখন পরোয়া কিসের? রুমির একটি পাসি গজল মনে পড়ছে (গুন গুন করিয়া):

> রচল যে-জন আগল হৃদে—নয় সে নিঠুর ওরে!
> প্রেমের চাবি সেই দিল—দ্বার খুলতে হবে তোরে।

গান (স্নিগ্ধস্বরে): বড় সুন্দর কথা দাদা! আর এই ধরণের সাড়াতেই তো দ্বার খোলে। শোনো তবে—লাগুক সাগরপারের সুর-দোলা আমার কণ্ঠে (গাহিলেন):

> O wistful Star above!
> For what high herald's love
>   Longst thou in the wakeful hour?
> For whom in the way-lost night
> Is adrift thy bark of light
>   When swoons the day's gold-flower?
> Whose joy upholds thee, Star,
> In thy pilgrimage afar?
>
> Eternal pilgrim, thou!
> For what arch-angel now
>   Dost thy blue vigil keep?
> Scattering around thee warm
> Shy fragrance of a form
>   Of shadow-rose in sleep?
> Whose quest has made thee, Star,
> Thus voyage ever far?

Thou wouldst on cloud-waves float
In tremulous gloaming's boat ;
    But whither ? dost thou know ?
Wingest thou Him to inarm
Who fills thee with His charm
    Taking our hopes in tow
In thy dream-rapt pinnace, Star,
Trothed to the haven afar ?

How far··and yet...how near
Thy anklet-sounds career !
    In my heart they join and gyre !
Hark·· there · the throbbing strain...
So nectarous ..they rain
    Paeans from the azure's lyre !
Drunk with their cadence, Star,
Waftst thou their echoes far ?

My heart of vesper, Sweet,
Outsoars gloom-bars to meet
    Thy limpid guiding glance.
My earth-enmeshed desire
Yearns for thy fane of fire
    With its spell of aureoled trance ;
For that bournless music, Star,
Do we seek thy deep afar ?

রাগ (খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে) : কিন্তু এতে তো যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে ভাই আমাদের মার্গসঙ্গীতের।

গান : অস্বীকার করছে কে? বাংলা গানটিতে আরো আছে রাগ-সঙ্গীতের হেলাদোলা ঠাটঠমক : বড় ভাইয়ের প্রভাব ছোট ভাই কবে

এড়াতে পারে দাদা?—তাছাড়া প্রভাব এড়াবার দরকারই বা কী? কোনো শিল্পই তো ভুঁইফোঁড় একটা কিছু নয়—তার মধ্যে যুগযুগান্তের বিকাশের ইতিহাস তো থাকবেই গাঁথা "সূত্রে মণিগণা ইব"—যাক শোনো এর বাংলাটি, তাহ'লে বুঝবে আমি কী বলতে চাইছি। (গাহিলেন):

ওগো বিধুরা তারা!
তুমি তন্দ্রাহারা
কার ধ্রুব শরণে?
কার পথ চাহিয়া
দীপ- খেয়া বাহিয়া
এলে দিন-মরণে?
কার বরণে তারা,
তুমি শ্রান্তি-হারা?

তুমি চির-বিবাগী
জাগো কাহার লাগি'
ঐ নীল শয়নে?
চারি ধারে করো কার
কায়া- গন্ধবিথার
ছায়া- ফুলচয়নে?
কার ধেয়ানে তারা,
তুমি আপনা-হারা?

মেঘ- ঢেউয়ে গগনে
তৃষা- অনুসরণে
তুমি কোথা ভেসে যাও?
যার বরে উজালা
তব রূপসী ডালা
তারি তরে কি উধাও
তব তরণী তারা,
প্রেম- স্বপনে হারা?

তুমি কত যে দূরে…
তবু কাছের সুরে
তব যে-কিঙ্কিণি
বাজে অন্তরে মোর—
গাও তারি কি অঝোর
সুর- সুধারাগিণী
নভো- বীণায় তারা,
চির- ভ্রান্তিহারা?

তাই গোধূলি-হিয়া
ওঠে উচ্ছলিয়া
বুঝি তোমারে বরি'?
কুল- মুগ্ধা আশা
লভে অকূল-ভাষা
তব আরতি করি'?
মোরা তাই কি তারা,
তব সুদূর-হারা?

রাগ (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতেছিলেন—চক্ষু মেলিয়া): কিন্তু-

গান : বলো—আমি কিচ্ছু মনে করব না। ভালো লাগল না—এই তো ?

রাগ : না ভাই ভালো লেগেছে খুবই—কিন্তু—

গান : কিন্তু ?—

রাগ : রাগ করবে না আগে বলো ?

গান (হাসিয়া) : সে কি কথা দাদা ?

রাগ : কি জানো ভায়া, আমাদের মনে খানিকটা সেকেলে ছোঁয়াচ তো লাগবেই।

গান : যথা ?

রাগ : ভয় হয় একটু—এই আর কি।

গান : কিসের ?

রাগ : বর্ণসঙ্করের। এভাবে ক্রমাগত যদি মিশেল হ'তে থাকে তবে আমাদের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যটির হানি হবে কি না—একটা জগা-খিচুড়ি হ'য়ে যায় যদি।

গান : দাদা, এ-ভয় তোমার নতুন নয়—যুগে যুগে দেশে দেশে সনাতনীরা সবাই এই আপত্তিই তুলে এসেছেন অভিনবের বিরুদ্ধে যাকে লরেন্স বলেছেন তাঁর তীব্র ভাষায় : "the constant war between new expression and the habituated, mechanical transmitters and receivers of the human constitution."

রাগ (উষ্ণ কণ্ঠে) : লরেন্স বললেও বৈশিষ্ট্যহানির ভয়টা তো আর তাই ব'লে অমূলক নয় ? বৈশিষ্ট্য—জাতিগত বিশেষত্ব—তো আছেই।

গান : রাগ কোরো না দাদা, কিন্তু ভেবে দেখো দেখি একটু—সমস্যাটা কি আসলে জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে, না নিজের কাছে খাঁটি থাকা নিয়ে ?

রাগ : মানে ?

গান : বৈশিষ্ট্য কি কেউ চেষ্টা ক'রে ফোটায়, না আপনি ফোটে ? জীবনের পরম সাধনা কি স্বভাবস্থ হওয়ার সাধনা না হ'য়ে কোনো জাতিগত সাধনা হ'তে পারে মনে করো তুমি ?

রাগ : তুমি যে ফের হেঁয়ালি ধরলে।

গান : সহজ চোখে দেখলে সহজ কানে শুনলে এর মধ্যে হেঁয়ালির বাষ্পও নেই। কিন্তু যখন তর্কটা তুললেই—তখন বলি শোনো। (থামিয়া) তুমি যাকে বলছ জাতিগত বৈশিষ্ট্য এক সময়ে হয়ত তার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যতই মানুষ মানুষের কাছে আসছে ততই যাকে বলছ বর্ণসঙ্কর সে উড়ে এসে জুড়ে বসছে—শোনো—আমার কথা শেষ হয় নি—আমি বলছি না যে নতুনের পদার্পণে—অচেনার মিশ্রণে কখনোই কোনো ক্ষতি হয় না। প্রথমটায় হয় বৈ কি অনেক সময়ে। তবু এ-মিশেল হবেই হবে —কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ মানুষের আত্মপরীক্ষার তৃষ্ণার নেই আদি, না অন্ত। তবু এক সময়ে হয়ত মানুষ সত্যিই আত্মপরতাকেই একান্ত ক'রে চাইত—কিন্তু এ-যুগের যুগধর্ম নয় এই বৈশিষ্ট্যকে কাচের আলমারির মতন সযত্নে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কায়েমি ক'রে রাখা। যতই দিন যাবে দেখতে পাবে সর্বব্যাপ্তির এই প্রবণতার ক্রমবিকাশ হচ্ছে, কেন না যতই দিন যাচ্ছে ততই আমরা ঘা খেয়ে খেয়ে শিখছি যে এ-দিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে এগুবার পথ আর খোলা নেই। মানে, যতই বিপদ থাক্ না কেন, মিশেল হওয়ার প্রথম দিকে যতই বিষফল ফলুক না কেন—অমৃতফলের ইঙ্গিতও কেবল ঐ দিকেই। যতই দিন যাবে ততই মানুষ চাইবে সমস্ত মানুষের সম্পত্তির শরিক হ'তে—হাজার জাতিগত বৈশিষ্ট্যের বা আপদ্ধর্মের দোহাই দাও না কেন, জাত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বেঁচে বর্তে থাকার তে হি নো দিবসা গতাঃ—কি চিন্তায়, কি রাষ্ট্রে, কি প্রেমে, কি শিল্পে, কি কাব্যে, কি সঙ্গীতে। একথা মানি যে মানুষের চেতনার ক্রমবিকাশের পথে এক একটা পরীক্ষার জন্যে তাকে থেকে থেকে খুবই দাম দিতে হয়েছে, এখনো হ'তে পারে কখনো কখনো। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে নিজেকে অপরের কাছছাড়া ক'রে তবে একটা প্রেরণাকে রূপ দিতে হ'তে পারে—কোনো বিশেষ অসভ্যতার সঙ্কট উত্তীর্ণ হ'তে। কিন্তু এ-প্রয়োজন ব্যাপক হ'তে পারে না—এ সাময়িক। কারণ মানুষ বিচ্ছিন্নও হ'তে চায় শুধু বেশি ক'রে মিলবার জন্যেই। 'বিশ্বকর্মা মহাত্মা' যে জনগণের 'হৃদয়েই সন্নিবিষ্ট'। তাই তো ধনুকের

ছিলে পিছন দিকে টানি—শুধু তাঁরকে সমুখবাগেই ঠেলতে। এম্‌নি ক'রেই জীবন বহুবিচিত্র হ'য়ে ওঠে: প্রভাবকে ঠেকিয়ে এড়িয়ে চ'লে যে-বৈশিষ্ট্যকে জীইয়ে রাখতে হয় তার দিন ঘনিয়ে এসেছে জানবে।

রাগ: বাঃ! বৈশিষ্ট্য তাহ'লে দাঁড়াল একটা কথার কথা, এই তো?

গান: এমন হসনীয় কথা বলছে কে? কিন্তু বৈশিষ্ট্য কথাটার এত বেশি অপব্যবহার হয়েছে যে ওর তাৎপর্যটি নিয়ে একটু ভেবে দেখার সময় এসেছে। বৈশিষ্ট্য বস্তুটি কী বলো দেখি? এক-একটা প্রেরণার এক-একটা স্বভাব আছে। বৈশিষ্ট্যকে যদি বলো এই স্বভাবে স্থিতি কে না মানবে? কিন্তু যদি বলো এ-স্বভাব আর কাউকে প্রভাবিত করবে না তাহ'লেই গোল বাধে। কেন না প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কেবলই এই মহাসত্যের পর্যাবর্তন দেখে আসছি যে এক সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে শুধু প্রভাবিত করে নি—তার মধ্যে নবজন্ম লাভ করেছে—এর দৃষ্টান্ত এত বেশি যে উদ্ধৃত করতে যাওয়াও পণ্ডশ্রম। কিন্তু গানের কথায়ই ফিরে আসা যাক। আমি এ-সম্পর্কে বিতণ্ডা রেখে দুএকটা উপলব্ধি তোমাকে বলি দাদা—তাহ'লে হয়ত যুক্তির চেয়ে বেশি কাজ হবে। তবে মিনতি রইল, এসব এম্‌নি ছোটভাইয়ের অভিজ্ঞতা হিসেবেই নিও—এর বেশি কোনো প্রতিষ্ঠাই চাই না।

(একটু থামিয়া): একথা তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানো যে ধ্রুপদের অঙ্গজ শুধু খেয়ালই নয়—ঠুংরি টপ্পাতেও ধ্রুপদী রাগ-চিহ্ন অতি-পরিস্ফুট। তবু ঐ বৈশিষ্ট্য-বজায়-রাখার অজুহাতেই বরাবর ধ্রুপদীরা খেয়ালীদের অবজ্ঞা করেছে, খেয়ালীরা টপ্পা ঠুংরিওয়ালাদের, এরা আবার গজল গায়কদের। কিন্তু ক্রমে সবাই কী দেখছেন? বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখা যাচ্ছে কি? ধ্রুপদে খেয়াল ঢুকছে, খেয়ালে ঠুংরি, ঠুংরিতে টপ্পা—ইত্যাদি। শেষে একেবারে শ্রীক্ষেত্র: সবাই এসে মিলল গানে। তাই উপস্থিত গানের দৃষ্টান্তই দেই—যেহেতু সেইটেই হ'ল বিশেষ ক'রে আমার এলাকা—জুরিস্‌ডিকশন্। শুনছ তো?

রাগ: শুনছি না? বিলক্ষণ!

গান: বেশ। গানের বেলায় শুনেছ নিশ্চয়ই যে কীর্তন এক

জিনিষ, বাউল আর। অথচ তবু এরা যে দুষ্ট ছেলেমেয়েদের মতন পরস্পরের গায়ে ক্রমাগতই ঢ'লে পড়েছে একথা জানে সবাই। কিন্তু কীর্তন বাউলকেও হয়ত বলা যেতে পারে সগোত্র—কাজেই এ-মিলন ওদের ক্ষেত্রে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করে না। বেশ। কিন্তু আজকের দিনে এমন কি বিশুদ্ধ রাগভঙ্গিম সুরেও যে কীর্তনের খোঁচ লাগছে তার কি ?

রাগ : যথা ?

গান : কত গান আছে। একটা মনে পড়ছে সব আগে : অতুলপ্রসাদের "জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী" গানটিই নেও। গ্রামোফোনে এটি নিশ্চয় শুনেছ। এর দেশ তিলক কামোদ ভঙ্গির সঙ্গে (গুন গুন করিয়া) "বলো গো অয়ি চঞ্চলে, এনেছ ও কী অঞ্চলে ? দিবে কি মোরে ভরিয়া দুটি পাণি ?" এই সঞ্চারীতে কীর্তন কী সুন্দর মিশ খেয়েছে ! "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি" ভৈরবীতেও কীর্তনের শুধু প্রভাব না আবহ উঠেছে ঘন হ'য়ে—ভঙ্গিতে, আবেগে, এমন কি আঁখরেও। এরকম আঁখর আমিও ঢের লাগাই আজকাল রাগ-ভঙ্গিম গানে।

রাগ : দুএকটা দৃষ্টান্ত দিলেই বা।

গান : কত আছে—আচ্ছা শোনো একটা। এর মূল সুরটি আগে ইংরাজিতে একটু গেয়ে শোনাই—অল্প বদলে অবশ্য—কেন না তাহ'লে আমার বক্তব্যটা ফুটবে (গাহিলেন) :

Descend in limpid loveliness.
O Prince of Melody, caress
The avid heart with thy Flute's reviving rain.
Deliver from yoke of Night
With the sun's crusading light :
In black typhoons make flash thy starry train.

The soul has yearned in the gloom
With musk and bell and bloom
To adore thee in her vibrant house of psalms :

Let visioned dream abide
In wakeful wastes, preside
In drouth of heart with nectar's answering alms.

Come, O Immaculate:
The dust and ail of fate
Stifle and blind, thy azure's grace now shower.
The illusive dusk misleads,
Descend with a million steeds
Of dawn, proclaim the end of Sleep's dark power.

এটি হুবহু এই ভাবেই গাওয়া যাক আঁখর সমেত (গাহিলেন) :

সুন্দর এসো আজ
অন্তরে সুররাজ
মুরলী-আসারে প্রাণে ঝরিয়া—
আলোধনু-টঙ্কারে
নাশি' কালো শঙ্কারে
তুফানে তারকা-দীপ ধরিয়া।

স্বপনে তোমার যত
বরণ-আরতি-ব্রত
যাপিতে চেয়েছে হিয়া-তিয়াষা
জাগরণে প্রিয়, তার
বিছাও গন্ধধার
ক্ষুধায় বহায়ে সুধা-বিপাশা।

(কীর্তন)

পথ চেয়ে কাটে দিন
এসো ওগো অমলিন,
ধূলায় নীলিমা-লীলা স্মরিয়া :

সন্ধ্যার ছলনায়
এসো ঊষা-ঝুলনায়
যুগান্তরের ঘুম তরিয়া।

(আঁখর)

পথ চেয়ে কাটে—
চেয়ে পথ তব
চির অভিনব
নীল বাঁশিরব
সুর- বৈভব
করি' পথের পাথেয় প্রাণ ভরিয়া
তব স্বপন-মিলন নিতি
অমলিন সুখ-স্মৃতি
ধুলার জীবনে প্রিয় বরিয়া।

রাগ (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : কিন্তু—কিছু মনে কোরো না ভায়া, অতুলপ্রসাদের "জানি জানি" বা তোমার "সুন্দর এসো আজ" এ দুটির কোনোটিই বিশুদ্ধ রাগভঙ্গিম গান নয়—তাই এখানে রেনেটি মন্দারিনি বর্গীয় কীর্তনের খোঁচ এলে বেমানান হয় না—

গান (বাধা দিয়া) : জানি দাদা—তবে রাগভঙ্গিম গানেও শুধু রেনেটি মন্দারিনিরই নয়—গরানহাটি মনোহরশাহি কীর্তনেরও খোঁচ আমি অনেক লাগিয়েছি।

রাগ : আঁখরও?

গান : আঁখরও।

রাগ (সকৌতূহলে) : শোনাও তো দেখি। তাহ'লে অনেকটা বুঝব আমার বর্ণসঙ্করের ভয়টা কতটা—

গান : আচ্ছা। কিন্তু শোনো এর ভাবটি আগে ইংরাজিতে। ইংরাজি অনুবাদ শোনানোর মানে আর কিছুই না—এতে ক'রে মূল

কাব্যটির স্বাদ যেন আরও গভীরভাবে পাওয়া যায়—গেটে বলতেন—জানো তো ?

রাগ : যে, বিদেশীভাষা যিনি না জানেন নিজের ভাষাও তার অজানিত ?

গান : হ্যা—আর তাছাড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে তর্কের বেলায়ও এটা ভেবে দেখবার যে একই ভাব দুটি আলাদা ভাষায় এ-দুই ভাষার বৈশিষ্ট্য মেনেও কেমন সহজ শোনাতে পারে। যাক্ শোনো :

Come in the heave of vision's rapture-sheen,
O Swan of Spring, with lilts of fadeless green.
Wizard, when thy charms shower
Miracles of flower on flower,—
Life's widowed heart is pierced with thorns no more.
O marvel-minstrel, lead
Us to thy haven, freed
Of shadows by thy paradisal lore.

A cadence of thy passion
Lures laggard clouds to fashion
Rainbow-girdles with thrills of coloured flight.
Thy beauteous dawn-outburst
Quenches our agelong thirst :
Relentless darkness yields to virgin light.

Blizzards hurtle and lash :
Love sighing sets—make flash
In the ail of life thy song-inebriate sun.
Call the hearts that, travel-worn,
Would be through thy dream reborn
From dew to deep in thy dominion.

এবার বাংলা গানটি শোনো—এটি হ'ল বিশুদ্ধ ইমন ঠাটের গান রাগভঙ্গিম—হাম্বির কেদারা এই সব নিয়ে (গাহিলেন):

এসো নয়নানন্দে ওগো নন্দদুলাল !
নেচে শ্যামলছন্দে হে বসন্তমরাল ! (১)

শুনি: ঐন্দ্রজালিক তুমি পলকে তোলো কুসুমি'
বিরহের বনভূমি—মিলন-রসাল।
তাই ডাকি: "হে সুরসারথি, শিখাও শরণাগতি,
রণিয়া অরুণারতি ঘুচাও আড়াল—
এসো নয়নের মণি হ'য়ে নয়নদুলাল !" (২)

প্রিয় তোমারি আবেগ-অণু জপি' মন্ত্রতনু
মেঘ হয় জলধনু—মেখলা-অরাল।
তব দীপালি-রূপের দিশা মিটায় যুগের তৃষা.
পোহায় নিরাশা-নিশা—অন্ধ, করাল—
নমি' তোমারি নয়ন-উষা নয়ন-দুলাল !

খর তুফান বেদনা হানে, প্রেম পরাজয় মানে,
ঝলকি' বাজাও প্রাণে বরাভয়-তাল।
আজি তব অভিসার-আলো যে চায় বাসিতে ভালো
তার অন্তরে জ্বালো দুরাশা বিশাল—
ফলি' নয়নে নীলস্বপন—নয়ন-দুলাল ! (৩)

(আঁখর)

১

এসো আঁখিমন্দিরে রূপরাজ !
পরি' ভুবনমোহন সুখসাজ—
নেচে শ্যামল মধুনূপুরে
উছল মুরলীসুরে
মরালছন্দে বঁধু, আজ।

(২)

এই জীবনের বনে কাঁটা ছায়,
যত কাঁটারা আড়াল আনে ফুলের মেলায়—
তুমি অরুণ-আরতিরাগে
মিলন-ফুলসোহাগে
করো লয় বিরহ-কাঁটায়।

(৩)

দেখা দাও—
তব ভালোবাসা-পিপাসা মিটাও—
তব অভিসারী তরীখানি বাহিতে শিখাও—
করো দুরাশার দীপতরী আঁধারে উধাও।

(একটু থামিয়া) যখন কীর্তনের কথা উঠলই, তখন যেমন রাগ-সঙ্গীতে আঁখর আনার দৃষ্টান্ত দিলাম তেম্‌নি উলটো দৃষ্টান্তটিও শোনো—অর্থাৎ কীর্তনে রাগসঙ্গীত তথা য়ুরোপীয় নানা সুরের মশলা। (গাহিতে গিয়া পুনরায় থামিয়া) কিন্তু আমি এসব ক'রে একদিক দিয়ে সব বন্ধুই হারিয়ে ব'সে আছি জানো দাদা? আমি বড় একলা।

রাগ : কেন ভাই?

গান : মার্গসাঙ্গীতিকরা আমার ওপর চটেন রাগে আমি উচ্ছ্বাসী কীর্তন আনি ব'লে, কীর্তনীরা চটেন—কীর্তনে ম্লেচ্ছ রাগ আনি ব'লে। এঁরা চান আমি মামুলিপন্থী হব—কীর্তন গাইতে বসলে গাইব শুধুই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গরানহাটি মনোহরশাহি, রাগ গাইতে বসলে—তানসেন সদারঙ্গের ধ্রুপদ খেয়াল। (হাসিয়া) অদৃষ্ট যখন বাদ সাধে দাদা, তখন সোনামুঠোও হয় ধূলামুঠো, নইলে মার্গসঙ্গীতের ও কীর্তনের 'পরে যার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাকেই কি না ওঁরা রুখে উঠে বলেন কালাপাহাড়—দুই দলেই? একলা বলে আর কাকে?

রাগ (হাসিয়া) : নতুনকে যে চায় ভাই, একলা হ'তে তাকে শিখতেই হবে, তাই অনুযোগ রেখে গাও বরং।

গান (গম্ভীর হইয়া) : যা বলেছ দাদা। তাছাড়া মানুষ আজন্ম একলা তো বটেই—যদিও এটা না বুঝে মিথ্যে সে দোসর খুঁজে বেড়ায়। যাক শোনো (গাহিলেন) :

এসো বিধুর সাঝে ঊষা-হাসি-হিরণে :
তোলো কুসুমি' কাঁটা সুরমলয়বনে। (১)
ব্রত- বিজনে
রূপ দীপনে
যত ব্যথা হোক মায়া তব কায়াকিরণে। (২)

দেখ পরাণ কাঁপে পথে ছায়াতরাসে :
নিভে দেউলে দুখে দীপ দীরঘ-শ্বাসে।
ফুল ঝরে হায়,
মেঘ গরজায়,
এসো এ-তুফানে তারাগানে ধ্রুববিভাসে। (৩)

এসো তন্দ্রানাশা—মরি আলোচেতনা !
জাগো সুধা-দুরাশা ! দলি' কালোবেদনা। (৪)
তব প্রণয়ে
এসো বিজয়ে
যুগ- বিরহে দুলায়ে মিলনের ঝুলনা।

রহি জড়িমা-পাশে মোরা নিয়ত বাঁধা
তাই নীল-রাগিণী আজো হয় না সাধা। (৫)
ছায়া- বাসনা
মায়া- আসনা (৬)
হোক সূর্য-মুকুটময়ী গগনগাথা। (৭)

(ঝাঁপতাল)

(১) দিক উজলি' এসো মা সুরকাননে
তব আশা-ঝলমল রথে জীবনে।

(২) রূপ- ভাতি জ্বালো রাতিহারা লগনে
এসো ছবি-রাণি, রবি-বাণী-বিছনে।

(৩) এসো কান্তি উছলি' প্রাণ-মন্দিরে মা,
এসো বরাভয়-মঞ্জীরে মা,
এসো বিরহী ধূলায় ধীরে কমল-স্বপনে ফিরে
যমুনা-উজান তীরে মা,
তব বন্দনা চায় হিয়া বসন্ত মুরলিয়া
ঊষরে শ্যামল মিড়ে মা,
হাসি- ধনু রাঙি' আঁখিনীরে মা,
এসো অস্তে উদয়ে ফিরে মা !

(৪) এসো আলো-চেতনা
টুটি' যুগঘুমঘোর কাটি' মায়াডোর
দূরে থেকো না
চির- আশা-কেতনা
ফুল- বাস-মেলনা।

(৫) দাও মুক্তি
নীল মুক্তি
দাও কামনার কূল হ'তে মুক্তি
দাও আকাশ-আকুল-সাধে মুক্তি।

(৬) তোমার গগনে চাহে অভিসার-উদ্দীপনা
ওগো প্রেম-মণি-সিংহাসনা !
বাসনা কালো বাসুক ভালো তোমার গানের অলোক আলো

(৭) ছোট সুখের কামনা অমৃত-সাধনা-
মন্ত্রে মিলাও তব চরণে
সুখ জোনাকি-বিভব অসি-উৎসব
বাসুক লাজ মা, তব বরণে।

রাগ : হুঁ (কি বলিতে গিয়া থামিয়া শুধু মাথা নাড়িতে লাগিলেন)

গান : মনে রেখো দাদা এর শুধু সুরেই নয়—ভাবের মধ্যেও খানিকটা পরদেশী ছোঁয়াচ আছে—উপমা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারেও—যথা আলো-চেতনা, জোনাকি-বিভব—এমন কি এ-কথাগুলিকে ইংরাজির তর্জমা বললেও হয়ত ভুল হবে না। এতে আমার স্বাদেশিক কবিরা চটেন বিষম—বলেন বাঙালির বাঙালিত্ব ডুবল ডুবল ডুবল! হা হতোঽস্মি!

রাগ (হাসিয়া) : কিন্তু সত্যিই কি ডুবেবে? কানে তো কই তেমন অচেনা শোনায় না এ-ধরণের বৈদেশিকতা?

গান : সে আমরা হাল আমলে বৈদেশিকতায় অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি ব'লে। যেমন ধরো না "প্রাস্তিকে" রবীন্দ্রনাথের "পুষ্প-মুকুটিত" কথাটি। ভালো লাগে বৈ কি, কিন্তু এটা শুনতে না শুনতে "Crowned with flowers" মনে পড়ে না কি? কিন্তু সে যাক্, যে-কবিতাটির ভাব থেকে এসব ছবি বর্ণনা অলঙ্কার উপমা এসেছে সে-কবিতাটি শুনলেই এ-কথাটি বুঝবে—শোনোই না—(গাহিতে গিয়া থামিয়া) জানো এ-কবিতাটি লিখি যখন জাপানীরা চীনদের নানকিং নেয় ১৯৩৭এর শেষে। মন বড়ই খারাপ হয়েছিল—কাজেই (হাসিয়া) বিদেশীর দুঃখে একটু বৈদেশিক ভঙ্গি যদি এসেই থাকে তবে আশা করি সুধীবৃন্দ নিজগুণে মার্জনা করবেন (গাথা ভঙ্গিতে গাহিলেন):

Dawn into eve's repining gray, O Gleam of golden smile!
Change stings of thorn to rose-caress, the frost with spring beguile.
Irradiate the frozen spaces, shame our mastering fears:
Come in thy regal chariot, stab gloom's heart with lightning-spears.

In worship's virgin hush
Rise Beauty, in dawn-flush:

Pale shadowing pain to phantom in thy aura of delight :
O Picturesque, earth longs for the rumour of thy
flawless flight.

The pilgrim soul still gropes in the dark, circled by
her ruthless foes :
Her altar weeps bereft of candles and a black wind
blows.
The flowers droop, clouds thunder : beacon in storms
with starry love.
Petal in lonely dust below thy lotus-dream above.
With lilts of chequered dance
Life's monotone entrance.
Hope wanders way-lost : lead with thy authentic Flute
of youth.
Irising dews of eld with new morn—shower thy grace
on drouth.

Hail, Light of consciousness, crusade against our
coilèd sleep.
Relume thy gold in ashes, make each droplet mirror
a deep.
Flourish thy oriflamme of fire, truce to fond lullabies. :
Confer thy wings on fettered songs, on labyrinths thy
skies.
Slay bubble joys and feuds,
World's fire-fly interludes,
Staged by Desire's siren charm : her whirling revelries
Rebuke, Love, with thy sun-crowned azure's tranquil
harmonies.

রাগ (ভাবিয়া) : কিন্তু একটা খটকা থাকছেই তবু—
গান : কী ?

রাগ : বাস্তবিক পক্ষে কীর্তন ও রাগসঙ্গীতের মধ্যে সত্যিকার অহিনকুল-সম্পর্ক তো নেই—তাই এ-ধরণের মিশেলেও অসাধ্যসাধন হয়েছে বলা চলে কি ?

গান (হাসিয়া) : দাদা, once an acrobat always an acrobat—ভুলছ কেন পালোয়ানির অসাধ্যসাধনের বাহবা পেতে আমি এসব দৃষ্টান্ত দিই নি। আমি শুধু আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত দেখাতে চাই যে সুরের প্রেরণা যদি আসে তবে অহি ও নকুল বেশ গলাগলি ক'রেই খেলা করতে পারে এবং তাতে ক'রে উভয়ের কারুরই 'জাতিগত' বৈশিষ্ট্যের এতটুকু হানি হয় না।

রাগ (ভাবিয়া) : কিন্তু একথার সত্যিকার প্রমাণ হ'তে পারে যে বিলিতি গানের সঙ্গে আমাদের গান গলাগলি হ'লে তবে।

গান : বেশ। Abide with me গানটি শুনেছ কি ?

রাগ : না।

গান : শোনো তবে—আমি ঐ গানটির অনুবাদে ঐ চার্চ-সঙ্গীতের ভঙ্গিমাটি রাখতে চেষ্টা করেছি—পেশ করি। (প্রথমে Abide with me গানটি গাহিলেন পরে বাংলা গানটিও *)

রাগ (ভাবিত) : হুঁ।

গান : কী ? এ-ও মঞ্জুর নয় ?

রাগ : নামঞ্জুর এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু এখানে Abide with me-র ছোট্ট গ্রামে ইমন বেলাবলের আমেজ এত স্পষ্ট যে এতে ঠিক প্রমাণ হচ্ছে না তোমার কথা, তবে এটা হয়ত একটু বেশি খুঁৎখুতেপনা শোনাচ্ছে—

গান : যদি ধৈর্য ধরো দাদা, তবে আরও দুএকটি দৃষ্টান্ত দেই, কেবল মনে রেখো, শুধু আমার কথা বোঝাতে—অসাধ্যসাধনের সার্টিফিকেট পেতে নয়—আমার সুর সম্বন্ধে কয়েকটি উপলব্ধি তোমার কাছে দাখিল করতে চাই—এম্নি, সৌভ্রাত্রের তাগিদে।

---

* ১৩৯, ১৪০ পৃষ্ঠা।

রাগ : সাধু সাধু।—বিশেষ যখন দৃষ্টান্তই আমি চাচ্ছি। কারণ, ভায়া হে, এসব ব্যাপারে এক আউন্স দৃষ্টান্ত এক এক টন্ থিওরির সমান —শিল্পে হাজার দৃষ্টান্তহীন যুক্তি দাও না কেন—উঁহুঁ:—যে-তিমিরে সে-তিমিরে। কেবলমাত্র সৃষ্টির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

গান : শোভানাল্লা দাদা! তুমিই রসিক par excellence—আচ্ছা জাজ্জ্বল্যমান গান শোনো তাহ'লে—(একটু থামিয়া) এটি হ'ল একটি জর্মন গান থেকে নেওয়া * যে-বিদ্যেয় হাতে খড়ি আমার বার্লিনে— এ-গানটি হ'ল C minor scaleএ :

Nachtigall, o Nachtigall,
Süsse holde Nachtigall!
Warum eilest du davon,
Wärst mein Glück und meine Wonn
Nachtigall, o Nachtigall,
Süss ist deiner Stimme Schall.

জ্জ্ঁা -া র্রা -া | র্সা -া জ্জ্ঁর্রা -া | পা দপক্ষপা দা না | র্সা -া া া |
না খ্ তি - গা ল্ ও - না - খ্ তি গা ল্ ০ ০
বু ল্ বু ল্ ম ন্ ফু ল্ স্থ রে ভে - সে - ০ ০

ণা -া র্সা ণা | পা -া র্সা ণা | মা পদা পা মা | জ্ঞা -া া া |
সূ - সে - হো ল্ দে - না - খ্ তি গা ল্ ০ ০
চ ল্ নী ল্ ম ন্ জি ল্ উ দ্ দে - শে -

পা -া ধা না | র্সা -া র্রা জ্জ্ঁা | পা জ্ঞা র্রা র্সা | র্সণা -া া া |
হ্বা - রু ম্ আ ই লে স্তু দ্ - দা - ফ ন্ ০ ০

* 100 Lieder—Th. Hauptner সঙ্কলিত—৯০ পৃষ্ঠার স্বরলিপিটি এখানে আকার মাত্রিকে তর্জমা ক'রে দেওয়া হ'ল মাত্র।

ধা ণর্সা ণা দা | পা -া -া পা | পা ধপক্ষপা ধা না | র্সা -া -া -া |
হ্বা র্স্ত্ মা ইন গ্র্ - ক্ উন্দ্ মা - ই নে ফ ন ০ ০

র্রা -া জ্ঞা র্রা | র্সা -া পা -া | র্রা জ্ঞর্রর্সর্রা জ্ঞা র্রা | র্সা -া -া -া |
না থ্ তি - গা ল্ ও - না - থ্ তি - গা ল ০ ০

র্সা -া ণা দা | পা -া ণদা -া | পা দপক্ষপা জ্ঞা র্রা | র্সা -া -া -া |
সূ স্ ই স্ত্ দা ই নে - শ্ তি - ম্ মে - শা ন্ ০ ০

রাগ : এ তো হ'ল—কিন্তু এর মানে ?

গান : খুবই সাদা। কবি বলছেন : "ভাই বুলবুল তুমি বড় সুকণ্ঠ—কেন উড়ে পালাচ্ছ ? কাছে থাকো, হে আমার হৃদয়ানন্দ !" এটি হ'ল একটি লোকসঙ্গীত—Volkslied. এখন শোনো এ-সুরটি ইংরাজিতে কেমন শোনায় (গাহিলেন) :

My soul of Nightingale ! on dreams of rose
Wing to the wonderland of blue, where flows
The melody of star-flute's invitation :
"Forget the cage for a domeless destination."

Hark, Light sings there in wistful love : "Home, home !
Come to thy nest in day-tide's ebb, oh, come !"
Haste to the Friend so far, yet near and tender,
Pledged to thy song-heart's cry of self-surrender.

(থামিয়া ঈষৎ কাশিয়া) : এ-সুরটিকে একটু বদলেছি অবশ্য—ভৈরবী এসে গেছে শেষ লাইনে। মূল গানটিতে—লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই—ভৈরবীর আমেজ ছিল না। তাই বাংলা গানটিতে আরও খাপ খেয়েছে এ-সুরটি ভৈরোঁ ভঙ্গির সঙ্গে ভৈরবী ভঙ্গি মিশে—শোনো (গাহিলেন) :

বুলবুল মন! ফুল-সুরে ভেসে।
চল্ নীল-মঞ্জিল-উদ্দেশে।
অম্বর বাঁশরী
ঐ ডাকে—"আয়—
পিঞ্জর পাসরি'
চল্ অ-ধরায়।"
(এ-ধরায়—দে বিদায়—অ-ধরায়—প্রাণ চায়
ম্লানিমায় দে বিদায়, নীলিমায় প্রাণ চায়)

ঐ শোন্ আলো গায় ভালোবেসে:
'ফিরে আয়, নীড়ে আয়, দিনশেষে।"
চল্ দূর বন্ধুর উদ্দেশে
চিরচরণের শরণের রেশে।
(চরণে—শরণে—জীবনে—মরণে
বিরহে মিলনে শয়নে স্বপনে)

রাগ (ভাবিয়া): এটা আমাকে একটু অবাক্ করেছে বৈ কি ভাই মান্‌ছি। কেবল—

গান: কী?

রাগ: এতেও তোমার কথা পুরো প্রমাণ হ'ল না।

গান: কেন?

রাগ: কারণ এ-গানটিতেও মূল সুরকে তুমি একটু আধটু বদলেছ—বিশেষ ঐ ভৈরবীর খোঁচ লাগিয়ে। কাজেই আমাদের গানে ওদের সুর খাপ খায় তোমার এ-প্রতিপাদ্যটি এখনো প্রতিপন্ন হয় নি—আর তা না হ'লে "বৈশিষ্ট্যে"র থিওরি নামঞ্জুর হবে কী ক'রে বলো?

গান (হাসিয়া): তুমি দাদা কম নও। আচ্ছা শোনো তো এই গানটি—এটি একটি রুষ নৃত্যসঙ্গীত থেকে নেওয়া—রুষ ভাষা আমি জানি না তাই উচ্চারণের দোষ হ'লে—

রাগ (হাসিয়া): ধরছে কে ভায়া?

গান (হাসিয়া): তা বটে। তবে শোনো। এ-গানটি হ'ল যাকে ওরা বলে বেদে-দের গান—gipsy music—Cigane musik রুষ ভাষায় এর মানে নাকি "আমি হ'লাম একজন বেদে যুবক,—কৃষাণও নই, রাজাও নই, বণিকও নই, সবো, তোমরা টুপি খুলে আমাকে সম্মান দেখাও।" এর যে-সুরটি আমি হুবহু বজায় রেখেছি সেটি হ'ল এই (গাহিলেন):

\+ ০ + ০
সা রা গা মা | পা -া সা সা | ধা -া মা ধা | পা । পঃ পা |
য়া ত্ সি - গা ন্ উ দা ল্যাং স মা লা জ্যাং স নিয়ে নিয়েস্
অ কু লে স দা ই চ লো ভা ই চ্ছ টে যা হ ভা লো

\+ ০ +
পধপপা মা গা মা | মপমমা গা রা গা | গপমগা রা ধা ন্া |
ত্যা নিন্ য়া নিয়ে বা বিন্ য়া নিয়ে বা রিন্ নিয়ে কু
বে সে বাঁ শি রে শে ডা কে যে সে ভ য়

০ + ০ +
সা -া পা -া | প্া -া ন্া ন্া | সা -া গা পা | র্সা নর্সা না ধা |
প্যাং স্ এ থ্ মা - প দি প্রো চ্ প দি প্রো চ্ বি রি
না ই ধা ও প্রা ণ গা ও গা ন ব ব দা ন এ ই

০ + ০
পা -া পঙ্কা পা | পধপপা মা গা মা | মপমমা গা রা গা |
গি স্ শ্নিন্ কা শা প্ কু শ্নিন্ কা শা প্ কু দা পা
চা ই কূ ল ছা ড়ি' দে ন তা বি অ ভি

\+ ০
গপমগা রা ধ্া ন্া | সা -া -া -া |
নী জে পা ক্লা নী - - স
সা রী ত রী বা - - ই

এবার এখানে তান টান গুলো শোনো পূরো গানটির সঙ্গে সঙ্গে : (গাহিলেন)

অকূলে সদাই চলো ভাই,
ছুটে যাই।
ভালোবেসে বাঁশিরেশে
ডাকে যে সে : "ভয় নাই।"
ধাও প্রাণ !— গাও গান :
"বরদান এই চাই—
কূল ছাড়ি' যেন তারি
অভিসারী তরী বাই।"

রঙিন মেলায় বাসনায়
উছলি'
শুনি হায় আলেয়ায়
ধ্রুবতারা-মুরলী
ধাও প্রাণ !— গাও গান : (ইত্যাদি)

অপার-বিজয় বরাভয়
স্বনিল :
হৃদিতারে ঝঙ্কারে
সে-রাগিণী রণিল
ধাও প্রাণ !— গাও গান : (ইত্যাদি)

রাগ (গালে হাত দিয়া) : হুঁ।

গান : কী ? এবার ?

রাগ : হঁ্যা—কিন্তু—কি জানো ভায়া ?—এ-সুরটির মধ্যে নূতনত্ব বেশি এসেছে এর বেপরোয়া গতিভঙ্গিতে—সুর লাফাঝাঁপি ক'রে বেড়াচ্ছে এই কারণে, নয় কি ?

গান (প্রীত) : ধরেছ দাদা—যাকে ওরা বলে movement—আমাদের গানে এখন খুব বেশি দরকার এই গতিসম্পদ—কারণ প্রাণশক্তিরই খুব বেশি দরকার হ'য়ে পড়েছে আমাদের সব কিছুতে—আর গানে প্রাণশক্তির অনেকখানি প্রেরণা দেয় এই সুরের গতিমাহাত্ম্য। একথাটা যেন আমি আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম শ্রীমতী কেসর বাইয়ের গান শুনে। তিনি যে নানা রাগের মিশ্রণ করতেন, তাঁর অনন্যতন্ত্র প্রতিভার প্রসাদে যে আশ্চর্য সুরের ইন্দ্রজাল গ'ড়ে তুলতেন—ধরো তাঁর একটি গানে হিন্দোল-বসন্ত-বাহার রাগে—তার আবেশ ও বিদ্যুৎ দুইয়েরই মূলে এই গতিশক্তি। আমাদের রাগসঙ্গীত অনেক সময়েই সুন্দর হ'য়েও যে একঘেয়ে শোনায় সে এই গতিশক্তির দৈন্যের দরুণ। কেশর বাই যে অতুলনীয়া গায়িকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন সে তাঁর কোনো (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) "pedantic display of technical subtleties" এর জন্যে নয়—যদিও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ কেসর বাইয়ের প্রতিভাকে শিরোপা দিয়েছেন এই ভুল কারণে—কেশর বাই অদ্বিতীয়া গীতকলাবিৎ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁর প্রাণশক্তির গুণে, গতির বিদ্যুৎশক্তির প্রবাহে। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে তাঁর গানকে বলেছেন "revelation of the miracle of music ?" কিন্তু সে যাক্। এ-গানটির ভাবানুবাদ শোনো—ঐ ধরণেরই সুরে। তাহ'লে বুঝবে আরো—আমি ঠিক কী বলতে চাইছি সুরের গতিশক্তি বলতে। আর একটা কারণে আমি ক্রমাগত এসব ইংরাজি তর্জমা গেয়ে শোনাচ্ছি : এতে ক'রে বুঝতে পারা যায় এ-ধরণের গানের ভাবধারায়ও বৈদেশিক spirit of adventure-এর ছোঁয়াচ কত বেশি। যাক শোনো (গাহিলেন) :

Friends, let us sail
Beyond the vale
Of shadows, for the shoreless deep
Whence wing love's melodies that never sleep

Calling the soul
To the far goal.
Hark to their pledge : "Who breaks his gyves,
Arrives."

Refrain :

O Pilgrim heart !
Wake up and start
For the unhorizoned Vast, to woo
Boons of the blue,
Discarding siren gleams :
Away from moorings plunge to the dream of dreams !

In the hurtling rapids of desire
The masque of foam and dance of fire
Dazzle : mind floats
Alas, on phantom-boats,
Hailing the songs of brittle waves as His
Starry symphonies.

Refrain :

O Pilgrim heart ! *etc.*

There surge the diapasons of the Far
Which earthly tumults cannot mar :
Slumbering chords of life
Thrilling respond, still rapture-rife :
Hush ! there sings
The King of kings !

Refrain :

O Pilgrim heart ! *etc.*

রাগ: এ ইংরাজি গানটি থেকে সত্যি অনেকটা বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ। সত্যিই সাগরপারের শক্তিমত্তা ও প্রাণচাঞ্চল্যের ঢেউ লেগেছে বৈ কি এসব সুরে। অবশ্য জানি না দেশের লোক এসব নেবে কি না। তবে এটা বোধ হয় বুঝবার কিনারায় এসেছি যে এ-ধরণের গানে ও সুরে আমাদের গানের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হ'তে পারে না।

গান (হাসিয়া): কিন্তু এবার আমিই যদি তোমাকে প্রশ্ন করি দাদা, কেন পারে না? তাহ'লে?

রাগ (চিন্তিত): তাহ'লে আমি বলব যে গানে কথার ছবি যদি তার সুরের রঙে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে তবে সে সার্থক তো বটেই—বিশেষত যখন গান বলতে আমরা বুঝছি সুরে ও কাব্যে মিলে এক ছবিরই নিটোল রস।

গান (খুসি): ফের পায়ের ধুলো দাও দাদা। ইংরাজিতে বলে "রক্ত জলের চেয়ে গাঢ়": দাদা নৈলে ভাইকে বোঝে কেবা? কিন্তু শুধু ছবির রূপমূর্তির গৌরবেই যে এ-শ্রেণীর সুরবৈচিত্র্য মঞ্জুর তা নয়—একে মঞ্জুর করবার আর একটা মস্ত কারণ—এর পিছনে আছে শক্তির অনুভূতি। ভগবানের বিভূতির একটা মস্ত বিকাশ যে শক্তির বাঞ্ছা এ তো অপ্রতিবাদ্য। তাই জাতীয় পুনরাবৃত্তিবর্গীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার চেয়ে বৈশিষ্ট্য হারিয়ে জাগাও ভালো। কি না, তামসিক জাতীয়তার চেয়ে রাজসিক বৈজাতিকতাও লক্ষগুণে শ্রেয়।

রাগ (চিন্তিত): তা বটে—কিন্তু এ-ধরণের কথার পিছনে একটা রোখের দাপাদাপি নেই কি?

গান: একথা মানি দাদা। কিন্তু যখন একটা জাত ক্রমাগতই কুম্ভকর্ণ হ'তে চায় তখন ভূমিকম্পও যে বাঞ্ছনীয় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সে কথা যাক। আমার যুক্তি অবশ্য এ নয় যে যেখানেই শক্তির বিকাশ সেখানেই সে শিরোধার্য। আমি শুধু বলি যে, সমস্যাটা আসলে জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয়—সমস্যাটা হ'ল নিজের প্রেরণার কাছে খাঁটি থাকা নিয়ে—সত্যাশ্রয়ী হওয়া নিয়ে। অর্থাৎ অন্তরে যদি আলো আসে তবে

তাকে আলো হ'য়েই ফুটতে দেওয়ার সাধনাই হ'ল জীবন-সাধনা—আলোর নামধামকুলশীলের তদন্ত করার মতন বিড়ম্বনা জগতে কমই আছে। তাছাড়া ভেবে দেখ আর একটা কথা: আমি বিশেষ একটা ছাপমার্কা হ'য়ে গ'ড়ে উঠব বললেই তো আর রাতারাতি বৈশিষ্ট্য গজিয়ে ওঠে না—যে পায় সে দিতে দিতেই ফুটে ওঠে পরম হ'য়ে, চরম হ'য়ে, একমেবাদ্বিতীয়ম্ হ'য়ে।

রাগ (প্রীত): এটা বেশ বলেছ ভাই। কাজ কি অত বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য ক'রে মাথা বকিয়ে?—আনন্দের মূল্যেই কয়া হোক না প্রতি সৃষ্টিকে। তাছাড়া যদি কোনো কিছু আনন্দ দেয় তবে তাকে মঞ্জুর না করার মানেই বা কী!—বিশেষ যখন স্পষ্ট দেখছি যে এ সব বৈদেশিক সুর কানে খাপছাড়া লাগছে না—এমন কি সময়ে সময়ে মনটা বেশ উৎফুল্লই হ'য়ে উঠছে চিনতে না পারা সত্ত্বেও।

গান: তাতো বটেই দাদা, কারণ চেনা মানে কী বলো দেখি? যাকে আজ চিনেছ তাকে তো এমন একদিন ছিল যে একদম চিনতে না। তাছাড়া জীবনে অচিনকে নইলে কি আমাদের এক পা-ও চলে?

রাগ: কিন্তু পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে ব'লে যে একটা কথা আছে ভায়া—আর্টে চেনার যে-রস তাকে একেবারে নাকচ করা যায় কি?

গান: তা বলছি না। কারণ পথচলায় চেনার আনন্দও একটা সত্য তৃপ্তি দেয় বৈ কি। একেবারে অনভ্যস্ত জিনিষে অনেক সময়েই তো দেখি অভ্যস্ত হ'তে বেগ পেতে হয়। সবই মানি, কিন্তু তবু বলব: জীবনের বাঁকে বাঁকে অচিনের দেখা না মিললে, ডাক না শুনলে পথচলা হ'য়ে ওঠে দিনগত পাপক্ষয়।—

রাগ: কিন্তু একটা কথা ভাই! তোমার শেষ গানটা ছিল যাকে ওরা বলে folk-song—লোকসঙ্গীত। কিন্তু ওদের art-song একটি এভাবে তর্জমা ক'রে দেখাতে পারো আমাদের গানে? একথা বলছি এই জন্যে যে নিচের সুরে বৈশিষ্ট্য খোলে না জানো তো? কাজেই তর্ক উঠতে পারে—

গান (হাসিয়া): জানি দাদা। কিন্তু ওদের art-song-এরও সুর আমাদের গানে খাপ খেতে পারে। শোনো ওদের বিখ্যাত সুরকার Chopin-এর একটি প্রসিদ্ধ গানের তর্জমা—হুবহু ছন্দ মিল সুর রেখে তর্জমা। শোনো তো অচিন সুর হওয়া সত্ত্বেও খারাপ লাগছে কি? প্রথমে মূল জর্মনেই গানটি গাই শোনো (গাহিলেন):

In mir klingt ein Lied...
Ein kleines Lied···
In dem ein Traum von stiller Liebe blüht
Für dich allein !
Eine heisse ungestillte Sehensucht schrieb die Melodie.
In mir klingt ein Lied··
Ein kleines Lied...
In dem ein Wunsch von tausend Stunden glüht
Bei dir zu sein !
Du sollst mit mir im Himmel leben...
Träumend über Sterne schweben...
Ewig scheint die Sonne für uns zwei...
Sehn dich herbei:..
Und mit dir mein Glück.
Hörst du die Musik ..
Zärtliche Musik ?

এ-গানটি শিখেছিলাম আমার এক অষ্ট্রিয়ান বান্ধবীর কাছে—তিনি ছিলেন অপেরা-গায়িকা—কী সুন্দর যে গাইতেন!—আর কী গলা! তারা সপ্তকের পঞ্চমে যখন ট্রেমোলোয় তাঁর সুর কাঁপত, মনে হ'ত ঘরটা কাঁপছে! জর্মন গান আমি ভালোবাসতে শিখি তাঁর কাছে—এসব গান শেখার সময়। (হাসিয়া) পুষ্পকরথ যদি মর্তে নামত তবে সারথিকে বলতাম—চলো ভিয়েনায় তাঁকে শুনিয়ে আসি এ-গানটা।

রাগ: সত্যি শোনাবার মতনই গান, মানছি।

গান : কিন্তু দেশী সুর এ নয় মানো তো ?

রাগ : না মেনে উপায় কি বলো ?

গান : আচ্ছা, এবার তাহ'লে শোনো এর বাংলাটা হুবহু এই সুরেই গাইছি—কোথাও বদ্‌লাই নি (গাহিলেন) :

অন্তরে মোর গুঞ্জরে কী গান—
একটি ছোট গান !
তোমার মৌন প্রেমের স্বপন হয় সেথা উছল—
শুধু তোমার আশে ।
মোর অশান্ত পিয়াস রচে রাগমালা তার (ঝঙ্কার-বিতান !)
অন্তরে মোর গুঞ্জরে কী গান—
একটি ছোট গান !
লক্ষ নিশার একটি তৃষা হয় সেথা বিভল—
রইতে তোমার পাশে ।
ভাসব দোঁহে দূর গগনে
তারায় তারায় সুর-স্বপনে
মোদের তরেই জ্বলবে চিররবি—
ধ্যান কোরো এই ছবি :
এনো সুধার দান ।
শুনতে কি পাও গান—
একটি ছোট গান ?

রাগ : হুঁ ।

গান : কী দাদা ?

রাগ : রোসো (আরও চিন্তাকুল)

গান (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : ভাবা হ'ল ?

রাগ : একটা কথা ভাই মনে হচ্ছে । তোমার মুখে চারটি বিদেশী গানের বাংলা রূপান্তর শুনলাম : Abide with me ইংরাজি থেকে, রুষ নৃত্যসঙ্গীত থেকে, আরো একটি লোকসঙ্গীত জর্মন ভাষায়—

অন্তিমে একেবারে খাস শোপ্যার যাকে তোমরা বলো বনেদি আর্ট-সং? এই ধরণের গানই তো ওদেশের শ্রেষ্ঠ গান ব'লে খ্যাত?

গান: হাঁ।

রাগ: কিন্তু, কি জানো ভায়া, শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন রুষ জর্মন ও ইংরাজি গান কয়টির মধ্যে ওদের প্রত্যেকের কী একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

গান: উঠবে না কেন?

রাগ: তবে বৈশিষ্ট্য কথাটাকে উড়িয়ে দিচ্ছিলে কেন?

গান: উড়িয়ে দিই নি মোটেই। বৈশিষ্ট্য কথাটা কি তর্কের ঝড়ে ওড়ে দাদা? জগতে প্রতি কাঁকরটিও অদ্বিতীয় আর শিল্পজগতে মানুষের স্রষ্টা মনের বৈশিষ্ট্য ফুটবে না?

রাগ: তবে তুমি বলতে চাইছ কী? দেখ, ফের সব ঘুলিয়ে গেল—বুড়োমানুষ—

গান: শোনো দাদা আর একটু বলি তাহ'লে—বিশেষ যখন দেখছি আমার কথাটাকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। (থামিয়া)

কি জানো দাদা? সভ্যতার বিকাশ মানেই তো বৈশিষ্ট্যের বিকাশ। হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় নির্বিশেষ থেকে বিশেষে পরিণতি from homogeneous to heteregeneous, আমাদের ভাষায় ভাব থেকে বিভাবে (aspect), বিজ্ঞানের ভাষায় ইভল্যুশন। যে-নামই দাও না কেন যায় আসে না যদি মূল সত্যটি মনে রাখো: "একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাম্ একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" অর্থাৎ যিনি নিষ্ক্রিয়তার নিয়ন্তা তিনিই এক অনামী অরূপ বীজকে বহু ফলফুলের নামরূপে বিচিত্রায়িত করেন। একথা যে সত্য সেটা বুঝতে দার্শনিকও হ'তে হয় না, একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখা যায় রূপের অফুরন্ত প্রবাহ। আর, এ-ও নিশ্চিত যে, এক বহু হ'তে চাওয়ার মানেই হ'ল এই যে তিনি নিজের অগণ্য রূপবিন্দুর মাধ্যমেই নিজের অরূপসিন্ধুকে উপলব্ধি করেন। এভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় মানুষ আপনাকে

যতই ছড়িয়ে দিয়েছে—পরিবারে, গোষ্ঠীতে, জাতিতে শেষে সার্ব-ভৌমিকতায়—ততই নিজের মূল ঐক্য-স্বরূপটিকেই উপলব্ধি করেছে এ অনৈক্যের রূপলীলায়। বটেই তো! মানে, নিরর্থক আত্মনাশের জন্যেই মূল প্রাণশক্তির বীজ "বহুধা" হয় নি এ মানো তো?

রাগ: মানব না? বিলক্ষণ!—বিকাশ মানেই তো আত্মলাভ—আপনাকে হারানো তো কারুরই লক্ষ্য হ'তে পারে না।

গান: কিন্তু মনে রেখো যে বিজ্ঞান বলছে—পারে। বলছে—মানুষের চেতনা হ'ল একটা আকস্মিক প্রবাহ বা স্পন্দন বৈ অন্য কিছুই নয়। আর একথা বলছে শুধু এই জন্যে যে, সে আন্তর সত্যের স্বীকৃতি খুঁজছে বাহ্য কাঠামোর এজাহারে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের কথা রেখে বলি যা বলতে যাচ্ছিলাম—যখন আমাদের মূল অনুভূতির ক্ষেত্রে মিল রয়েছে—কারণ এ-মিল না থাকলে মনের কথা বলাই মানা। (থামিয়া) আমার মূল বক্তব্যটি হ'ল এই যে, বৈশিষ্ট্যের একটা মস্ত তাড়না হ'ল অহং-এর। এ অহং মিথ্যা নয়। কেন না অহং-ই হ'ল সেই কাঠামো—আধার—যার মধ্যে নিরাধার নিরহং স্বয়ম্প্রকাশ। তাই প্রতি অহং-ই হ'ল অদ্বিতীয়। (থামিয়া) কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। এই অহং নিজের অদ্বিতীয়তাকে উপলব্ধি করে নিরহং-কে পেয়ে তবেই—নইলে তার বিকাশ ডিমের খোলার-মধ্যে-গা-ঢাকা পক্ষি-শাবকের মতনই সীমাবদ্ধ থাকে। কাঠামোর বৈশিষ্ট্য তো চাই-ই, নৈলে রূপ দানা বাঁধবে কাকে আশ্রয় ক'রে? কিন্তু এম্নি লীলার বৈচিত্র্য দাদা, যে প্রতি বিন্দুটি নিজের সিন্ধুতাকে পেতে পারে বিন্দুপুটে থেকেও যদি সিন্ধুর কাছে সে নিজেকে খুলে ধরতে পারে। তাই দেখা যায় যে, মানুষ নিজের সসীমতাকে যতই লাঞ্ছিত করে ততই অসীম-তাকে গৌরব দিয়ে সে ক্ষতির পূরণ করে, ধন্য করে। শিল্পের বেলায়ও এই কথা। প্রতি শিল্পরূপ শিল্পী আত্মার সৃজনী প্রতিভার একটা বিশিষ্ট দ্যোতনা তো-বটেই—নৈলে অনিবার্যতার—inevitabilityর—বিকাশই হ'তে পারত না: কিন্তু তার বৈশিষ্ট্যেরও মুক্তিলাভ হয় কেবল তখনই যখন অন্য সব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই তার আদানপ্রদান চলে

প্রেমের প্রণালী দিয়ে। এই জন্যেই আমার কথা ছিল যে, প্রতি জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যও সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি, তাই একের সত্য বৈশিষ্ট্য অপরের সত্য বৈশিষ্ট্যের ঋণ স্বীকার ক'রে নিঃস্ব হয় না—হয় ঈশ্বর। একথা সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করি কী ভাবে জানো? সে অভাবনীয়।

রাগ: ধ্যানে?

গান: না—গানে।

রাগ (শুধু প্রশ্নোৎসুক নেত্রে চাহিলেন)

গান: সংসারে বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ সব চেয়ে উগ্র ও অসহিষ্ণু হয় কোন্‌খানে বলো আগে?

রাগ (ভাবিয়া): ধর্মে—বলতে চাইছ তো?

গান: তাই। মানবচেতনার প্রগতিকে জগতের ইতিহাসের আলোয় দেখলে দেখা যায় বার বারই যে, আমরা পরস্পরকে ভাই ভাই বলতে চেয়েছি সব চেয়ে বেশি এই ধর্মের ধর্মক্ষেত্রে—অথচ এমনিই অদৃষ্টের পরিহাস যে ধর্মের কুরুক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি হয়েছি ঠাঁই ঠাঁই। এর কারণও কাকস্বচ্ছ: আমরা ধর্মের উপলব্ধির নামে ভগবান্‌কেও পরিয়েছি আত্মাভিমানের পৈতে, ভেদবুদ্ধিবরণের আংটি, নিজের বৈশিষ্ট্যের উল্কি দেগে দিতে চেয়েছি তাঁকে—যিনি "অকায়, অব্রণ, অস্নাবির, অপাপবিদ্ধ।"

রাগ: কিন্তু—

গান: বলছি শোনো। এ নিয়ে বহুদিন দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু কেন জানি না থেকে থেকে মনে হ'ত নিষ্টারও কি দরকার নেই? ধরা যাক্—বৈষ্ণবদের কথা যাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম। মনে হ'ত কেবলই যে বৈষ্ণবসাধনায় ধরো অহৈতুকী ভক্তির যে অবর্ণনীয় মধুর উপলব্ধি—এ-উপলব্ধি, এ-রস কি অবৈষ্ণব সত্যি পেতে পারে অন্য কোনো সাধনায় ঠিক্ এমনি নিবিড় ভাবে? ভাবতে ভাবতে একদিন মুগ্ধ হ'য়ে গাইছিলাম বৈষ্ণবদের বিখ্যাত রাধার অঙ্গীকার (গাহিলেন গাথা-সুরে):

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

(ঈষৎ পল্লবিত স্বরে)

হৃদয়রাণী করি' যদি সে নিরবধি
আমারে রাখে বাঁধি' আলিঙ্গনে :
অথবা চরণের আশ্রিতারে যদি
সে-বহুবল্লভ হানে চরণে :
কিম্বা আড়ালে সে লুকায়ে দিনরাত
কাঁদায় বিরহের চিরবেদনে :
সে তার অভিরুচি—আমার প্রাণনাথ
শুধু সে—আর কেহ নহে ভুবনে।

রাগ : কী সুন্দর !

গান : কিন্তু সুন্দর যখন আত্মাভিমানের ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করে তখন সে হয় সবচেয়ে সর্বনাশা—একথা ভুললেও চলবে না। আমার বেশ মনে আছে এ স্তবটি গাইতে গাইতে এক ধরণের ধার্মিক জাতীয়তার গর্বে মনটা উঠল কাঁটা দিয়ে—অম্নি শান্তির জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসল কি একটা উচ্ছ্বাসী ক্ষুদ্রতার ভাব। মন বলল : বলো তো দেখি, এ-হেন অপূর্ব বিনতি আত্মহারা সর্ব-সমর্পণের ভাব অহৈতুকী ভক্তিকামনা অন্য কোনো ধর্মসাধনায় ফুটতে পারত কি? উত্তরে আমার মধ্যে সেই ছোট ধার্মিক মানুষটা বিজ্ঞতায় বিস্ফারিত হ'য়ে বলল : কখনই না।

এম্নি সময়ে হঠাৎ সুফীদের ধর্মসাধনার নানান্ অপূর্ব ইতিহাস পড়তে পড়তে হঠাৎ ভক্তিমতী মুসলমান-যুবতী রাবেয়ার ইতিহাস প'ড়ে মুগ্ধ হ'লাম। জানো হয়ত রাবেয়া ছিল আরব-বালা, ক্রীতদাসী। আবাল্য ভক্তি তার হৃদয়ে উৎসারিত হ'য়ে উঠেছিল স্বাভাবিক উষ্ণ প্রস্রবণের

ম'তই। একবার তার একটি উরু জখম হওয়ায় কেটে বাদ দিতে হয়। পঙ্গু রাবেয়া যন্ত্রণার মাঝেও গাইল তার প্রার্থনায়:

গাঢ় স্নেহনীড়ে করুণায় ঘিরে
রেখেছিলে মোরে কত না আঘাত হ'তে যে বাঁচায়ে জীবনে—
বুঝাতে কি আজ ওগো প্রেমরাজ,
একটি অঙ্গ হরিলে—তাই কি সুধা ঝরে রাঙা বেদনে?

কেমন চম্‌কে গেলাম। এ-ও তো কম কথা নয়—আত্মসমর্পণের এ কী মন্ত্র! তার পরেই পড়লাম রাবেয়া গাইছে তার প্রার্থনায় (গাহিলেন):

নরকের ভয়ে যদি প্রভু চাই তোমারে—
নরক-জ্বালায় দহিয়ো আমারে চিরকাল:
স্বরগের লোভে যদি চাই তব কৃপারে—
স্বর্গচ্যুত কোরো চিরতরে হে দয়াল!
শুধু, যদি প্রাণ তব তরে চায়
তব করুণার পরশন—
রেখো না আমারে তুষার নিশায়
দিও তব উষা-দরশন।

মন কোথায় যা খেল বিষম—প্রথমটায়। নানা ভাবে বলতে চাইলাম—এতে অমন সুর বাজে নি। কিন্তু গাইতে গিয়ে আর দ্বিধা রইল না। ঐ রাধারই অহৈতুকী প্রেমের—একই সর্তহীন আত্মসমর্পণের আকুতি ফুটেছে মুসলমান-কন্যা রাবেয়ার কণ্ঠে: শুধু তুমি—তোমার কোনো বিভূতি নয়—কোনো সুখের বর নয়—সম্পদের আদরের পুরস্কারের কামনা নয়—শুধু তুমি—আর কেউ নয়—আর তোমার জন্যেই তুমি—তোমার অন্য কোনো ধনের জন্যেই এ-অন্তর তোমায় চায় না—চায় শুধু তোমার করুণার জন্যেই তোমার উষাকে বরণ করতে—তুমি দুঃখ দাও সুখ দাও, হাসি দাও অশ্রু দাও, স্বর্গ দাও নরক দাও, অমৃত দাও গরল দাও—আমার কিছুই বলবার নেই—সে তোমার ইচ্ছা

—কেবল আমি তোমাকে নিলাম বরণ ক'রে কারণ তুমি ছাড়া আমার গতি কোথায়? অবশ্য রাধা ও রাবেয়ার কণ্ঠে একই মন্ত্র যে-দুই ভাবে ফুটেছে তাদের ছন্দ আলাদা, ভঙ্গি আলাদা, ভাষা শিক্ষা দীক্ষা আবহ মাটি সবই আলাদা: কিন্তু তবু একই আলো একই চিরন্তন আত্মসমর্পণের উচ্ছল বাণী বেজে উঠেছে হিন্দুর ভজনে মুসলমানের নমাজে। বৈষ্ণবেরা একথা বললে হয়ত কানে আঙুল দেবেন, কিন্তু তবু একথা সত্য যে ঐ নিরক্ষর মুসলমান-বালার কণ্ঠে ফুটেছে অবতারকল্প মহাপুরুষের শ্রীচৈতন্যদেবের অহৈতুকী ভক্তিরই আকুতি (স্তব গাথায় গাহিলেন):

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্ম জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

(ঈষৎ পল্লবিত সুরে)

> নহে ধন-জন-যশোগান,
> বল্লভ-মালাদান,
> কল্পনা কবিতার বরণারতি:
> শুধু জনমে জনমে প্রাণ
> প্রার্থে নিরভিমান
> ভকতি অহৈতুকী শরণাগতি।

এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা তুললাম কেন না তিনি ছিলেন এ-যুগে রাধাভাবেরই মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু যা বলছিলাম। বিশ্বাস করবে না দাদা, পাশাপাশি দুই ছবি উঠল ভেসে···আর কী আনন্দ, উচ্ছ্বাস! এক মুহূর্তে সব গেল ওলট পালট হ'য়ে। মনে হ'ল, শ্রীরাধার বৈষ্ণব সাধনার বা রাবেয়ার সুফী সাধনার নিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য ও বিধিবিধানের ধারাভেদ হয়ত ছিল, কিন্তু নিষ্ঠা নিবিড় হ'তে হ'তে হঠাৎ পৌছয় গিয়ে উদারতার

দিগন্তহীন শিখর-প্রেমে। তাই ধর্মসাধনায় স্বতন্ত্র পথের স্বতন্ত্র নিষ্ঠাও একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়—প্রতি সাধনার সঙ্কীর্ণ সংহতির মধ্যেও একই উপলব্ধির বিপুল মন্ত্র ওঠে ঝঙ্কৃত হ'য়ে। মনের অনেকদিনকার একটা কালো যেন হঠাৎ আলোয় উঠল হেসে: বুঝলাম যে নিষ্ঠার একমুখিতা স্বচ্ছন্দ হ'লে পৌঁছয় বিশ্বমুখিতায়, তাই আধ্যাত্মিক রাজ্যে উচ্চতা—height—ও গভীরতা—depth সমার্থক। তাই বিশ্বে যাকে চাই অন্তরেও তাঁকেই পাই। অমনি, আত্মার বিন্দুর মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে যে বিশ্বসাম্রাজ্য হাতে পাওয়া যায় তারও পেলাম আভাস।—কিন্তু গানের কথায়ই ফিরে আসি।

তুমি জানো দাদা, আমি সাগরপারের গান বড় ভালোবাসি। ওদের দেশে গিয়ে বার বার অনুভব করেছি যে ওদের শ্রুতি ওদের মিড় ওদের স্বরসঙ্গতি সংধ্বনিসঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের রাগসঙ্গীতের গরমিল যথেষ্ট হ'লেও একটু কান পাতলেই শোনা যায় দুই সঙ্গীতের প্রবাহের তলে একই সুরধুনীর গভীর ওঙ্কার নিরন্তরই বাজছে।

ওদের hymnology—স্তবগানের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি উপলব্ধি করি—কারণ সব দেশেই মানুষের আত্মার ঊর্ধ্বতম উৎসাহ এই অনন্তেরই পানে—তাকে যে-নামই দাও না কেন। ওদের বিখ্যাত Ave Maria গানটির গম্ভীর ঝঙ্কারে প্রাণের তার উঠত বেজে। এ-গানটি হয়ত জানো—লাতিন গান: কিন্তু প্রায় সব ভাষায়ই এর অনুবাদ হয়েছে। আমি এটি ফরাসী ভাষায় গাইতাম। সেদিনও গাইছিলাম (গাহিলেন):

Ave Maria,
Toi qui fus mère
Sur cette terre.
Tu souffris comme nous,
Tu partageas nos chaines,
Allège nos peines,
Vois: nous sommes tous nous sommes tous à tes genoux.
Sainte Maria, sainte Marie!

Viens sécher nos larmes,
Dans nos alarmes implore, implore ton fils pour nous.
Amen

এর ভাবটা হ'ল এই যে হে জননী মেরি! তুমি এ-জগতে আমাদের সুখ দুঃখ ব্যথারই বন্ধনসঙ্গিনী হ'য়ে ছিলে আমাদের পাশে তাই তোমার কাছে নতজানু হ'য়ে ডাকছি তুমি আমাদের অশ্রু মুছিয়ে দাও—আমাদের শঙ্কায় তোমার তনয় খৃষ্টদেবকে জানাও আমাদের কাতর মিনতি—থেকো কাছে তোমরা। গানটি শেষ করতে না করতে কেন জানি না সর্ব অঙ্গে শিহরণ উঠল জেগে। ভাবো—যীশু-জননী মেরির গান গাইতে বৈষ্ণব বাঙালি গায়কের বুকে জাগল আনন্দের প্রেমের ঢেউ! কিন্তু আরও আশ্চর্য এই যে তখনি ঐ সুরে শ্রীরাধার গান রচনা ক'রে ফেললাম চক্ষের নিমেষে—ঐ বিদেশী গির্জাসঙ্গীতের সুরে। এর ছন্দ লঘুগুরু সংস্কৃত ভঙ্গি—শোনো (গাহিলেন):

রাধা!
সুধাসুন্দর গাথা
গাহিলে প্রেমসুরে···
তারকা-নূপুরে
ক্বণিলে শরণ-উচ্ছলিত তাল!

প্রিয় অকূল-মন্ত্রণ-দানে
তনুমন-অর্পণ-গানে
অম্বর-সুর-পূজারিণি
চির-অভিসারিণি!
টুটিলে শঙ্কাজাল।

রাধা!
অরুণ-নাথা!
রাধা!

নিশীথজয়ী
বাধাবরণে
স্বপ্নবিসর্জনে
চিরমহিমময়ী!
ধূলিতলে তুমি এলে
তব অশ্রুল অঞ্চল মেলে··
বিরহী বরষা ঢেলে ··
পঙ্কজ হ'ল প্রতি কণ্টক-পথবাধা···
বেদন হ'ল মণিচেতন-জয়গাথা—
শুনি' অন্তরমাঝে
বাঁশরি বাজে
সে-সুর হ'ল সাধা।

আলোমালা গাঁথিলে,
ভালোবাসা সাধিলে:
মধু- নন্দন মূর্ছন জাগে
তব রাগে—
চিরশ্যামলনাথা!
রাধা!

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে যেন আত্মহারা হ'য়ে গেলাম—একটা উচ্ছল স্বর্ণপ্রবাহ যেন আমার অন্ধকার অন্তর প্রতি অণুকে ক'রে তুলল উদ্ভাসিত। পাশাপাশি তিনজনের ধ্যানমূর্তি ভেসে উঠল—মেরি শ্রীরাধা রাবেয়া। বিস্ময়েরও অবধি রইল না: কোথায় খৃষ্টান-জননী মেরি, কোথায় বৈষ্ণব-প্রণয়িণী রাধা, আর কোথায় আরব-দুহিতা রাবেয়া! মনে হ'ল, ধর্মের উপলব্ধিতেও যদি এই অপূর্ব ঐক্যের অনুভূতি হয়, সঙ্গীতে না হবে কেন? একথা অবশ্য মনে হয় নি যে মেরি রাধা ও রাবেয়া একই মানুষ। তাঁদের রূপে গুণে শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্রে স্বভাবে পার্থক্য নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু সব পার্থক্যকে ছাপিয়ে এঁদের ভজনের মধ্যে দিয়ে

ফুটে উঠল এক বিশ্বভৌম অখণ্ডতার দীপ্ত অনুভূতি—কী বলব দাদা, এসব অনুভূতিকে কথায় সাজালে নিজের উপর রাগ হয়—যা অনুভব করেছি তার সঙ্গে যা প্রকাশ করলাম তা মিলিয়ে যখন দেখি—মনে হয় কেনই বা এ প্রকাশের বিড়ম্বনা! একজন ইংরাজ যোগী লিখেছেন: "No one can describe the contact with Reality, which is rapture, yet everyone, I suppose, experiences it at some moment of his life. The most we can do is to put down a few inadequate words that report not the thing itself, but a memory of light and of more light." (একটু থামিয়া)

তাই সে উচ্ছ্বাসের ঢেউকে কী ক'রে ভাষায় তর্জমা করব? সে যে অসম্ভব। তবু—ঢেউয়ে ঢেউ জাগে—গানে গান রাঙে—আবেগে আবেগ হয় উৎসারিত। রাধার সম্বন্ধে বাংলায় কীর্তনটি গেয়ে গাইলাম ওকে ইংরাজিতেও, শোনো—বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা এত চেঁচামেচি করি দাদা, কিন্তু আমাকে বলতে পারো বাঙালির কণ্ঠে ইংরাজি ছন্দে আবেগ এমন স্বত-উৎসারিত এমন সহজ হ'য়ে ফোটে কী ক'রে—যদি আমাদের বৈশিষ্ট্যের একটা ধরাবাঁধা রূপই থাকবে? আমাদের প্রতি জীবনধারারই অবশ্য একটা গতিভঙ্গি একটা বৈশিষ্ট্য থাকতে বাধ্য, কিন্তু কেউ কি আগে থাকতে ব'লে দিতে পারে—কবে কোন্ অকূল অভিজ্ঞতার সিন্ধুটানে সে-ধারা কোন্‌দিকে বেঁক নেবে? জীবনের পথে নানান্ অচিন্ অভিজ্ঞতার জলহাওয়ায় নানান্ অচিন ফুলই তো ফোটে আমাদের স্বপনী প্রাণের সুর-জাগানিয়া শাখায় শাখায়। কী ক'রে বলবে শুনি যে, আজকের এ ফুল গতকালকার ফুলের কাছে বিদেশী মনে হচ্ছে ব'লেই এ-ফুলে ফুলত্ব নেই? কিন্তু এবার যাক্ যুক্তি, আসুক ভক্তি (গাহিলেন ধীরভঙ্গি স্তবের সুরে):

Radha, beauteous!
Thou sangst of Krishna in thy nectarous
Authentic accent of the quenchless star!
Thy self-oblivious vision of the Far

Bloomed in the orbit of our ash-gray life's distress
To redress
Our mortal drouth with bounties of thy deep of love
Beaconing above
Our desert-dome.

Thy vibrant offering
Of all thou hadst to the king
Made of thy heart a flute, His magic Flute
Wherewith in every heart he claimed his home
Blessing our barren earth with the serene
Flower and fruit
Of thy triumphant garden of adoration,
O lonely Lotus, fadeless flame-oblation
To the regal Evergreen,—
Radha, Queen!

Radha, darling of the Dawn!
Here below thy aura shone
Through night's keen livelong anguish,
When faith was born doubt-hordes to vanquish
Dripping the glory of thy sacrifice
Of earthly paradise
For viewless blue companionships
Which eclipse
The summit-ecstasies of the earth : our tangled fears
With simple courage-thrill answered thy tears,
And drooping heart-beats quivered with dauntless
aspiration :
Thy pearless pain's self-dedication

Dowered with blossoms the dark,
Striking spark on spark
Of jewelled consciousness,
To impress
On the dolorous dusk a golden certitude
Of union myriad-hued
With the elusive Evergreen,
Radha, Queen !

When the disloyal shadows darken,
We hearken
Back to the rumour of thy diamond-glory's resurrection,
Forget our dream's defection,
And the agelong glaciers melt away
As thy deathless springtide-lay
Exiles the frost-denials of our wintering world.

The murmurous memory of thy soul star-love-empearled
Makes the cold clod sing
Of thy effulgent King,
The ancient Evergreen,—
Radha, Queen !

(রাগ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতেছিলেন, গান শেষ হওয়ার পরেও তেম্‌নিই রহিলেন—অনেকক্ষণ—পরে চোখ খুলিলেন—চোখে জল)

গান (হাসিয়া) : রায় ?

রাগ : ভাই বিচারকের আসন দিয়ে আর পাপ বাড়িয়ো না। না—আর তোমাকে জেরা করব না।

গান : কেন দাদা ?

রাগ : এ-গানটির কোন্ একটা ঝঙ্কার আমাকে স্পর্শ করেছে। না ভায়া—বুড়ো মানুষকে আর সেন্টিমেন্টাল ক'রে লোক হাসিও না। আমার আর বলবার কিছুই নেই। বলো তোমারই কথা বরং।

গান : কী বলব দাদা ?

রাগ : তোমার গানের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন—যার মধ্যে দিয়ে তোমার এতবড় উপলব্ধি হয়েছে। ঢেকো আর না।

গান (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : শুনবে সত্যি ?

রাগ : শুনব ভাই।

গান : আমি ডাক শুনেছি দাদা।

রাগ (ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে) : কিসের ?

গান : সব ভাবনা ছেড়ে—নিরুদ্দেশ-যাত্রার।

রাগ : কিসের লক্ষ্যে ?

গান : তা জানি না ! শুধু এইটুকু জানি যে আমাকে আমি হ'তে সব সমজদারিয়ানার পরোয়া ছেড়ে—কেননা (গাহিলেন) :

গান তো আমার নয় মা সুরের গরব-উষা রূপ-উজ্জালা :
নয় নয় সে মুখর-কারু স্ফটিক-ভৃঙ্গার রঙিন ঢালা।
ঝলমলিয়ে চায় না মা সে
রাঙতে নেশা প্রাণ-আকাশে :
করতালির সভায় গাঁথা যায় কি মা তোর বরণমালা ?
গান যে আমার নয় মা ফেনিল ঝিকিমিকির গন্ধঢালা।

মৌন লগন নিবিড় যখন হয় মা তোর ঐ নীল করুণায়,
আশা আমার মন্ত্র হ'য়ে ফোটে গানের ফুলের ভাষায়
জ্বালবে যারা দীপালিকা
মন-ভোলানো শিখর-শিখা,—
তাদের মাঝে কেমন ক'রে সাজাব প্রণামের থালা ?
গান যে আমার তোর শরণের চায় মা শরণ প্রেম-নিরালা।

রাগ (অনেকক্ষণ পরে) : কিন্তু কোন্ পরিণতির অভিমুখে ?

গান : তা-ও জানি না। জীবন-সমুদ্রের কতটুকু চিনি বলো যে আগে থাকতে ব'লে দেব কোন্ ঢেউ কোথায় গিয়ে লাগে ? তাই তো বলছিলাম যেতে হবে আমাকে নিরুদ্দেশযাত্রায়। শুধু একটি কম্পাস আমি চিনি—নিজের কাছে খাঁটি থাকা—প্রতি পদে নিজের আত্মপরিচয় চাওয়া, নিজের সত্য স্বরূপের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে চাওয়া। এছাড়া আর যা চিন্তা সে আমার নয়—সে-ভাবনা চিন্তামণির। তাই বিচারক যে হোক্ সে হোক—কী যায় আসে—যদি আমার এ-আমিত্বের জন্যে যা আমার চাই সরল স্বীকারে বরণ করতে পারি, যা আমার কাছে অগ্রাহ্য সব সুবিধা অসুবিধা ভুলে বর্জন করতে পারি ? আমার আঁখি-তারার তৃষ্ণার না আছে আদি, না অন্ত : কখনো সে তাকায় আধফোটা তারার মণিলোকে ; কখনো দুকূলভাঙা নদীর জলে ; কখনো মেঘের-ছায়ায়-ঘুমন্ত হ্রদের বুকে ; কখনো বা মলয়-হাওয়ায়-জাগন্ত পুষ্পবীথির হিল্লোলে। প্রতি আভা, প্রতি রূপ, প্রতি রঙ, প্রতি গন্ধই তার রেশে আমাকে উদ্বেল ক'রে তোলে···আর আমি গান বাঁধি···তান সাধি ·· সুর গড়ি···তালে তালে, ছন্দে ছন্দে, বোলে বোলে। এই-ই আমার আরাধনা। এ-সৃজন নয় আমার রাজসভার নজর, এ যে আমার অন্তর-আলোর নৈবেদ্য। সবাইকে চম্‌কে দেব এ নয় আমার গানের দুরাশা : আমার আরাধ্য যে, তার তর্পণের জন্যে গান আমার সুন্দর হবে ; আমার দীপদেবতা যে, তার আরতির জন্যে প্রাণের ধূপাধার আমার গন্ধমেদুর হবে ; আমার পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের পরমানন্দের জন্যে সুরপ্রতিমা আমার নিখুঁৎ হবে—এই-ই আমার ধ্যান। সে-প্রতিমার জাত নেই : আছে রূপ, আছে করুণা, আছে প্রেম। আর তার ব্যঞ্জনাও অফুরন্ত : কখনো সে শান্তিরসে পরিপূর হ'য়ে নিটোল হ'য়ে স্নিগ্ধ হাসে ··কখনো ছায়া-পথের আয়না হ'য়ে নিচের মায়াকে চায় উপরে প্রতিফলিয়ে তুলতে · কখনো আপনাকে ধ'রে রাখতে না পেরে হাত বাড়ায় নীহারিকাকে রাখী পরাতে···কখনো বা ধুলার সঙ্গীদের পানে চেয়ে চায় তাদের বুকে ধরতে। তাইতো শীতের অবসানে বাসন্তী কিশলয়ের উদ্ভিন্ন সুখহাস্যে

আমার অন্তর-অতলে জেগে ওঠে শৈশবের সেই আধ-হারানো বিশ্ব-দোলের জয়ধ্বনি। তাই তো গোলাপ ফুলের আঁধারভাঙা লালিমায় আমার প্রাণ হয় উদাসী। তাই তো সূর্য যখন উঁকি দেয়—আমার পঞ্জরের পিঞ্জরে পাখির পর পাখি ওঠে ডেকে, আর আমি প্রভাতী গান বাঁধি; চাঁদ যখন একলা আকাশে শুভ্র রূপের প্লাবন বইয়ে নিষ্কলঙ্কের স্বপ্ন দেখে তখন তার সে-স্বপ্ন ধার ক'রে আমি গাঁথি রত্নমালা; নিশুত নিশীথে যখন কালো মেঘের মন্দিরে বিদ্যুতের ডঙ্কা বেজে ওঠে, আমি দুরু দুরু শঙ্কায় ডমরু দিয়েও রচি অভিসার মৃদঙ্গের তাল। তাই না সাগর আমাকে হাতছানি দেয় ঝাঁপ দিতে অকূলে, পাথর আমাকে দেয় ধ্যানের দীক্ষা, ঝরণা আমার কানে জপে গতির বীজমন্ত্র, বনমর্মর ডাকে আমায় তার নাচদুয়ারে—আর এ-হোলিখেলার প্রতি রংদোলায় আমি উঠি দুলে গানের সুরে নাচের নূপুরে। ওদের প্রতি সুরদীপ্তিকেই যে আমি দেখি আমার রক্তের মুকুরে, ছন্দহিল্লোলকে শুনি আমার নিশ্বাসের বীণায়,--সব সময়ে না—শুধু আমার পরম ক্ষণে—ধ্যানলগ্নে। অনেক সময়েই পথ আসে ঝাপসা হ'য়ে, পাথেয় মনে হয় দূরে · কত দূরে সে···! তখন ডাকি সেই খেয়ার মাঝিকে যার হাতে জীবনের পারাণি, দীপের দিশা, আশার আশ্রয়—যে "একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি": যে-দিশারি সব অকৃতার্থতার নিহিত-অর্থ হ'য়ে আসে আমাদের কাণ্ডারী-রূপে, যে-আনন্দ-উৎস অবর্ণ অরূপ হ'য়েও তার রূপরসগন্ধবর্ণের বহুধাশক্তির সহস্রধারা ঝরায় এ-ভুবনের তৃষ্ণাবুকে। বলি তাঁকে: "হে চিরনিভৃত, তোমার গোচর হবার সময় হ'ল আমার গানের স্বপ্নক্ষুধায়; হে সর্বাধার, তুমি রঙ ধরো, রূপ জাগাও, ঢেউ তোলো আমার গানের সিন্ধুমেলায়; হে এক, তুমি বহু হও আমার গানের কুসুমারণ্যে; হে বহু, তুমি ভেদের মধ্যে এককে ঝলকে তোলো আমার গানের স্তব্ধতায়; তোমার অসাঙ্গ ইঙ্গিত আমার গানে আজ ফুটে উঠুক সুরের ভঙ্গিতে, কথার সঙ্গীতে, নৃত্যের রূপরঙ্গে, শান্তির নিস্তরঙ্গে। আমাকে মানতে শেখাও শুধু তোমাকে—তাহ'লেই নিঃস্ব পাবে বিশ্বকে। তাই তোমায় ডাকি: এসো আজ, আমার সুরের, আমার গানের ধরো

হাত—যাতে তাদের মধ্যে আমি ফুটি তুমি হ'য়ে পরম স্বপ্ন-উৎসর্জনে, আত্ম-বিসর্জনে। তাহ'লে আমার প্রতি আমির মধ্যে ফুটবে আমার অভিমান না—তোমার স্বরমান; আমার টঙ্কার না—তোমার ওঙ্কার; আমার মুখরতা না—তোমার নিথরতা। আর সেই সৌম্য নির্মেঘ ঊষায়ই তো ফুটবে রূপকারের রূপরচনা—যুগযুগান্তের অতন্দ্র নিশীথ-সাধনায় যার ছায়া ধরেছে কায়া—ধ্বনির অপরূপ জাগরণে, মঞ্জরিত হয়েছে—স্বরের নীহারিকা থেকে গানের অব্যর্থ নক্ষত্রমালায়—সার্বভৌম মানবের স্বরসাধনা কাব্যসাধনা ভাবসাধনা প্রেমসাধনার মিলনসুষমায়।"